Chaprash by Buddhadeb Guha

[Part.1]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

চাপা রাগ

বুদ্ধদেব গুহ

www.Murchona.com

চাপরাস/বুদ্ধদেব গুহ

চাপরাশ যে বহন করে সে-ই চাপরাশি। পেতলের তকমা বুকে লাগানো অনেক চাপরাশিকে আমাদের চারপাশে দেখতে পাই। রাজ্যপালের, জজসাহেবের অথবা মালিকের চাপরাশি। কিন্তু এই উপন্যাসে বুদ্ধদেব গুহ এযাবৎ অচেনা এমন অনেক চাপরাশির প্রসঙ্গ এনেছেন যাঁরা শুধুমাত্র ঈশ্বরেরই চাপরাশ বহন করছে। কী সে চাপরাশ ? এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় তারই আলেখ্য।

এই উপন্যাস যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল তখন বহু বুদ্ধিজীবী ও মৌলবাদী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কোপ মারার হুমকি দিতেও ছাড়েননি। অথচ এই উপন্যাসে 'ধর্ম', 'ঈশ্বর' ও অন্যান্য অনেক বিষয় নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। অন্যতর আলোর দিশারী। 'চাপরাশ'-এর বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর, কোথাও কোথাও স্পর্শকাতর এবং তর্কে-বিতর্কে বিপজ্জনক। তবু এক মর্মস্পর্শী, বেগবান গল্পের মাধ্যমে লেখক এই আখ্যানকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। আখ্যানের কল্পিত জগৎ থেকে উঠে এসে চারণ নামের মানুষটি আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে সে। ঈশ্বরবিশ্বাস যে মূর্খামি নয়, ধর্মবিশ্বাস যে গর্হিত অপরাধ নয় তা সে নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

চারণের গভীর উপলব্ধি এই রকম : 'জিষ্ণু মহারাজ একদিন 'চাপরাশ'-এর কথা বলেছিলেন। মনে আছে চারণের। একজন চাপরাশিই শুধু জানে চাপরাশ বইবার আনন্দ। সেই চাপরাশ ঈশ্বরেরই হোক কি কোনও নারীর। অথবা কোনও গভীর বিশ্বাসের।'

যাঁরা ধর্ম মানেন না, ঈশ্বর মানেন না কিংবা যাঁরা মানেন অত্যন্ত অন্ধভাবে—এই দুপক্ষের সামনেই স্পষ্টবাক্, সাহসী এবং সত্যসন্ধ লেখক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধদেব গুহকে যাঁরা শুধুই 'প্রেম' ও 'জঙ্গল'-এর চাপরাশি বলে জানেন তাঁদের কাছে 'চাপরাশ' এক পরম বিস্ময়ের বাহক হয়ে থাকবে।

এই বিশাল ও গভীর উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট সংযোজন।

নবী চৌধুরী,
অনুজপ্রতিমেষু

চাপরাশ প্রসঙ্গে কটি কথা

ইন্ডানা গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান হরিশংকর জালান এবং এস. জি. এস. ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল চিফ এগজিকিউটিভ ড. নরেশ বেদি একাধিকবার আমাকে গাড়োয়াল ও কুমায়ুঁ হিমালয়ের দেবভূমিতে যাবার সুযোগ না করে দিলে 'চাপরাশ' কখনওই লেখা হত না। তাই তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশুশেখর দে আমাকে অগণ্য বইয়ের জোগান না দিলেও এই বই লেখা যেত না। অ্যাডভোকেট নবী চৌধুরী আমাকে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও একটা ইংরেজি বই দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, তার নাম "In Quest of Infinity", কবিরাজ এ. সি. রায়-এর লেখা। আমার জাপানি বন্ধু হাজিমিসো, তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্মের ওপরে Robert A. Thuruman-এর লেখা Essential Tibetan Buddhism বইটি উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। সুধাংশু দে বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা, কোরাণ এবং নানা সাধকসাধিকার সম্বন্ধে অসংখ্য বইয়ের জোগান দিয়েছিলেন বিন্দুমাত্র বিরক্তি না প্রকাশ করে। তাঁর কার্তিকবাবু সেইসব বই সাইকেলে করে রাতের বেলা পৌঁছে দিয়েছেন দিনের পর দিন। সে কারণে তাঁদের কাছেও অশেষ কৃতজ্ঞ আমি। আমার অফিসের হরেন সুর প্রায় প্রতিদিনই 'প্রতিদিন' অফিসে কমল চৌধুরীর কাছে 'চাপরাশ'-এর কপি ও সংশোধিত পুল দেওয়া-নেওয়া করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

'প্রতিদিন' এবং 'Asian Age'-এর অকালে চলে-যাওয়া সার্কুলেশান ম্যানেজার মদন মিত্র এবং কমল চৌধুরীর নাছোড়-বান্দা পীড়াপীড়ি না থাকলে এই উপন্যাস আরম্ভই করতে পারতাম না। আমি compulsive লেখক নই impulsive লেখক। লেখার মতন কোনও কিছু না জমে উঠলে লিখতে পারি না। বেশি তো লিখিই না। এ কথা আমার পাঠক-পাঠিকারা জানেন।

এই দীর্ঘ আঠারো মাস ধরে এই উপন্যাস সংবাদ 'প্রতিদিন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল যখন তখন প্রতিটি কিস্তি পড়ে তাদের মতামত প্রতি সপ্তাহে আমাকে জানিয়ে এই কঠিন এবং কখনও কখনও ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজে আমাকে নিয়োজিত রাখার জন্যে, প্রতিনিয়ত দীপিত করার জন্যে, বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লিপিলেখা মুখোপাধ্যায়, মুক্তি ও হীরক মুখোপাধ্যায়, মধুমিতা সেন, সুশান্ত ভট্টাচার্য, ড. কৌশিক লাহিড়ী এবং সুজাতা লাহিড়ীর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বড় ধারাবাহিক লেখা লিখতে লিখতে মাঝে মাঝেই সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতন অবস্থা হয় সব লেখকেরই। সেই সময়ে এমন একনিষ্ঠ এবং সৎ পাঠকেরাই, যাঁরা চাটুকার নন, ধ্রুবতারা হয়ে লেখকের মনের আকাশে বিরাজ করেন।

'প্রতিদিন'-এর ডি. টি. পি. ডিপার্টমেন্টের উমাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় আমার অত্যন্ত বাজে হাতের লেখা কপি কম্পোজ করে এবং পুলের সংশোধনের নির্দেশও নির্ভুলভাবে পালন করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। 'প্রতিদিন'-এর কমল চৌধুরী আমার 'কুখ্যাত' মেজাজ অনবরত হাসিমুখে প্রতিদিনই সহ্য করে গেছেন বলেও তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আনন্দ পাবলিশার্স-এর ডি. টি. পি.-র সমীর চৌধুরী এবং রাতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও খুব যত্ন ও ধৈর্যর সঙ্গে এ বই কম্পোজ ও মেক-আপ করেছেন। সে জন্যেও তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

বড় টাইপে, রয়্যাল সাইজে নয়নলোভন করে ছেপেছেন এ বই আনন্দ পাবলিশার্স-এর বাদল বসু। বইটি বেশ বড়। সাম্প্রতিক অতীত থেকে কাগজ, ছাপা এবং আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেড়ে

যাওয়াতে বইয়ের দাম অনেকই হয়ে গেল। প্রকাশকের হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা নিজগুণে প্রকাশককে মার্জনা করবেন।

অনুজপ্রতিম প্রচ্ছদ-শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়কেও অশেষ ধন্যবাদ।

বিনত,

বুদ্ধদেব গুহ

পোস্ট বক্স নং ১০২৭২
কলকাতা-৭০০০১৯

ঠিক চারদিন আগে কোজাগরী পূর্ণিমা গেছে। আজ কৃষ্ণা চতুর্দশী। হৃষীকেশ এর ত্রিবেণী ঘাটে যে মস্ত চাতালটি আছে একটি প্রকাণ্ড পিপ্পল গাছের তলার মন্দিরের সামনে, ঘাটে নামার পথের ডানদিকে, সেই চাতালেরই ওপরে দুপা মুড়ে বসে চারণ চট্টোপাধ্যায় নদীর দিকে তাকিয়েছিল।

সন্ধে তখনও হয়নি। তবে, হবো হবো।

আজ কোনও একটা ব্যাপার আছে এখানে। সেটা নবাগন্তুক চারণ চাটুজ্যে বুঝতে পারছে কিন্তু কী ব্যাপার তা বুঝতে পারছে না। জিগ্যেস করবে যে, এমন কেউও নেই এখানে পরিচিত। আসলে এই পৃথিবীতে, এই জীবনে, অপরিচিতরাই যে প্রকৃত পরিচিত এবং পরিচিতরাই যে অপরিচিত এই সত্য সম্বন্ধে চারণের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়নি।

সন্ধে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা, সুগন্ধি, বিভিন্নবয়সী, কলহাস্যময়ী নারীদের ঘাটের দিকে নেমে যেতে দেখা গেল। যাওয়ার পথে ওই চাতালে পৌঁছনোর আগে বাঁদিকে ও ডানদিকে যে অগণ্য দোকান আছে, সেইসব দোকান থেকে ফুল ও কী একটি গাছের পাতার দোনার মধ্যে বসানো জ্বলন্ত ধূপকাঠি এবং মাটির প্রদীপ নিয়ে তবেই এগোচ্ছিলেন প্রত্যেকে। একা-একা বা দলে-বলে, নদীর ঘাটের দিকে।

নারীদের মধ্যে বৃদ্ধা একজনও ছিলেন না। লক্ষ করল চারণ। দীপাবলীর আগেই কেন এই দীপাবলী চারণ তা না বুঝতে পারলেও সেই সুন্দর দৃশ্যের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল। আনন্দে মন ভরে যাচ্ছে তার অথচ এই আনন্দে তার নিজের কোনওই ভাগ থাকার কথা ছিল না। নেইও। এ আনন্দ সম্পূর্ণই নৈর্ব্যক্তিক। চারণ বুঝতে পারছিল যে, দুঃখেরই মতো আনন্দও বড় ছোঁয়াচে। নানারকম অনপসরণীয় দুঃখের ভারে, অকৃতজ্ঞতা, তঞ্চকতা, নীচ মগ্ন স্বার্থপরতার আঘাতে আঘাতে সে ভারাক্রান্ত। অথচ এই মুহূর্তে ওর আনন্দের কোনও শেষ নেই।

নারীরা কেউই একা আসেননি। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁদের ভালবাসার পুরুষেরাও আছেন। ওড়াউড়ি-করা জোড়া-জোড়া পাখিদের ভালবাসারই মতন এই নারী আর পুরুষদের স্ফুট ও অস্ফুট ভালবাসা, চুড়ির রিনঠিনে, চোখের চকিত ইঙ্গিতে, শাড়ির খসখসানিতে গোচর ও অনুভূত হচ্ছে চারণের।

গাড়োয়াল হিমালয়ে সন্ধে নেমেছে। কিন্তু তখনও রাত নামেনি। তবে প্রায়ান্ধকার। লছমন ঝুলা, রাম ঝুলার নীচ দিয়ে বেগে প্রবাহিত প্রাণদায়িনী পুণ্যতোয়া গঙ্গা এই হৃষীকেশে পৌঁছতেই সমতলে ছড়িয়ে গেছে। আর সেই দ্রুত ধাবমানা নদী, নারীদের যতন-ভরা আঙুলে ভাসিয়ে-দেওয়া অগণ্য প্রদীপ বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে হরিদ্বারের দিকে। হেলতে দুলতে, কাঁপতে কাঁপতে চলেছে দ্রুত বেগে ভাসমান প্রদীপগুলি। কোনও প্রদীপ ডুবে যাচ্ছে স্রোতে কিছুটা গিয়েই। ডুবে যাচ্ছে যার প্রদীপ, সেই নারী মনমরা হয়ে আবারও নতুন প্রদীপ আনতে উঠে আসছেন ঘাট ছেড়ে। নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশের সমতলে কৃষ্ণা রাতের, নিঃশব্দে কিন্তু অতি দ্রুত ধাবমানা গঙ্গার এই গতিমান আলোকসজ্জাতে, মুগ্ধ, স্তব্ধ হয়ে গেছে চারণ চাটুজ্যে।

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ওই নারীদের এবং নদীর দিকে চেয়ে চারণ ভাবছিল, সুখ অথবা দুঃখও কারও প্রাপ্তিতে পূর্ণতার বা হতাশার-আরোপ অনুভূতি নয়। সুখ যে নেয়, সুখও তার মধ্যে নিয়েই ওঠে। হয়তো সে কারণেই নজরুল কারণে সে সুখী হতে পারেনি জীবনে, সে প্রতি মুহূর্তে সুখী হয়ে ওঠে পরম কারণে। দুঃখ ধারণ করার মতো ভাবনা বা ভাষা যার নেই সে সেই দুঃখকে প্রতি মুহূর্তে অন্যের ঘাড়ে চালান করে দেয়। অসংখ্য এমন মানুষের সংখ্যাই বেশি। যার ভাষা আছে, পুঁথিগত ভাবও দুঃখ তাকেই দুঃখকের মতো ভাবা নয়, তার দুঃখবোধই নেই। যার দুঃখবোধ আছে, পুঁথিগত ভাবও দুঃখ তাকেই দুঃখকের মতো নিয়ত আকর্ষণ করে। নিজের দুঃখ তো বটেই, পরের দুঃখও।

চারণের পাশেই দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী জোড়াসনে বসে দিগন্তের দিকে চেয়ে।

কে সন্ন্যাসী তার কে নন তা পোশাক দেখে বোঝা যায় না। বোঝা যায় তার চেয়ে অনেকই বেশি বোঝা যায় তার মুখের ভাব দেখে। 'ভেক' ধরলেই কেউ কেউ পোশাকে প্রোথিত হয়ে ওঠেন না। তারা কেউ পোশাকে প্রোথিত হয়ে ওঠেন। তাঁদের পোশাক দেখে সন্ন্যাসী। প্রতিটির মানুষের পড়ে মনে হয় যে, তিনি সন্ন্যাসী। অবশ্য যাদের দেখার চোখ আছে তাদেরই চোখে।

চারণ কিন্তু মানুষটিকে দেখে বুঝল যে, তিনি সন্ন্যাসী।

একটুক্ষণ পরেই সেই দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়িয়ে দিকে মুখ করে বসলেন। তারপর ঝুলি থেকে একটা মালা চাট বের করে মুখের সামনে মেলে ধরে, নিজের মনে মনের মধ্যে আলোকে জ্বলন্ত মতির উপরে ধ্যানে বসলেন।

ধ্যান শেষ হতেই চারণ চমকে উঠে নিজেও খুব ধ্যানে বসল।

যখন বসল একাদিক্রমে। প্রথমত সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙার অপেক্ষায়। প্রতিটির মানুষের সংখ্যাধিক্য দেখেছে। প্রতিটির মানুষের ধ্যানরত কলকাতা শহরে সন্ন্যাসী মতন ধ্যানরত মানুষের বড় অভাব। পাতা-জোড়া ক্যালেন্ডার বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপনের ভাব প্রসন্ন। তাছাড়া, কবিতা লিখলেই বা তা প্রকাশিত হতে হলে পয়সা খরচ করে বই ছাপাতে হয়। যেমন কেউ শেখাবে না, সভাতে বা অনুষ্ঠানে ধ্যান শিখেই বা কেমন করে ধ্যান শিখতে হয়, কেউ কেউ কাজটা বেশ করলেই কেউ IPSO-FACTO ধ্যানরত হয়ে ওঠেন না। সকলের কবি নয়, কেউ কেউ কবিতা লেখে। ধ্যানরত হয়ে ওঠেন না। ধ্যান নিজে ধ্যানরত নয়। সুর ভাঁজে তার কানে, গলায় না থাকলেও। সুর-কেন্দ্রের ভেতর জোরে বলেই হয়তো সুর কম লাগে, তার গান শুনতে বড়ই শুনতে ভাঁজে। সে-গানের গলাতে সুর কম লাগে, তার গান শুনতে বড়ই কষ্ট হয়। চারণকে তেমন গান, অনেক না দিয়ে সেই গানে ভাবাশ্রয়ে।

এই যে মানুষ কথা, মানুষের মধ্যে মানুষের বেশি মানুষের বেশি।

সন্ন্যাসী, ভজনের সুরটি শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই চারণ সুরে বসে সেই গানে ভাবাশ্রয়ে। বাণীটি চেনা চেনা লাগল খুব। তারপরই মনে পড়ে গেল যে, এই গানটি ওর শোনা। কখন যেন আগমোড়াতে এক ভক্ত গায়কের গলাতে ওই গানটি শুনেছিল। খুব সুরের কোনও বয়সস্থানীতে দেশের পরিযায়ী পাখির মতন গানটি এসে চারণের মনের ছোট জলাতে ডানা ঝাড়ছে, জল নাড়ছে। জল-ছড়া দিয়ে এসে বসল।

আহা, এর সুর ঃ "খোঁজে খোঁজে তুমারে কানসহ্যা মুকে নয়না ধারে।"

ওর বলেই হয়তো আগমোড়ার সেই গায়কের এতায় সুরসত্ত্বে এক অবকাশ ছিল। অন্য বলেই তাঁর দেবতাকে চেয়ে দিয়ে দেখার তাঁর তাগিদ ছিল। অতীতের অতীতের বলেই এত দীর্ঘকাল পরেও গানটিকে একে গায়কের মজনবাসককে ভুলতে পারেনি চারণ। সন্ন্যাসীকে এই কথা চতুর্দশীতে এই অতেনা অঙ্গরসী সন্ন্যাসীর ভজনের মধ্যে দিয়ে বহু কষ্ট আগের আগমোড়ার সে মাঘের অমাবস্যার রাতের কথা যেন নিমেষের মধ্যে ওঠে এল। তবে পঞ্জনবাবুর গানের মধ্যে জোড়া তবুও। এবং যদের মধ্যে হয়েছিল সে গান। যাঁরা গান সময়ে কিছুমাত্রও জানেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, কোনওকম অনুরূপ হতো গানি এলাতে চারদিক খোলা জায়গাতে বসে সুরে গান গাওয়া এবং সেই গান শোনে

Security Page@MurchOna.com

www.MurchOna.com

কানে এবং মরমেও পৌঁছনো বড় সোজা কথা নয়। এই সন্ন্যাসী সেই প্রায় অসাধ্য কর্মটিই করছিলেন।

গান শেষ হলে চারণ বলল, বড় সুন্দর গান আপনি। ভারী ভাল লাগল।

সন্ন্যাসী চারণের দিকে চেয়ে রইলেন চুপ করে। কথা বললেন না কোনও।

তারপর বললেন, গান কি গায়কের ? গান চিরদিনই শ্রোতার। তাছাড়া গানের আমি কি জানি ! গান জানেন আমার গুরু।

আপনার গুরু ? তিনি কে ?

ওই যে।

বলেই, সন্ন্যাসী তাঁর বাঁদিকে আঙুল তুলে দেখালেন। চারণ, সন্ন্যাসীর তর্জনী নির্দেশ অনুসরণ করে দেখল যে, চাতালের ডানদিকের (মন্দিরের দিকে পেছন ফিরে বসলে যে দিক ডানদিকে, সেই দিকে) একেবারে শেষ প্রান্তে দু-তিনটি অসমান বাঁশের কঞ্চির উপরে বিছানো, একসময়ে সাদা ছিল কিন্তু এখন কালো হয়ে-যাওয়া প্লাস্টিকের চাদরের নীচে, কালো, শীর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ একজন মানুষ গেরুয়া লুঙ্গি আর হাতওয়ালা গেঞ্জি পরে, চোখ বুঁজে নিজের মনে, তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অ্যালুমিনিয়ামের একটি দুধের পাত্রর উপর তাল দিতে দিতে পুরোপুরি আত্মস্থ হয়ে গান গাইছেন। তাঁর বাঁ হাতের কব্জিতে একটা সস্তা হাতঘড়ি।

সন্ন্যাসী বললেন, যাবেন নাকি গুরুর কাছে ?

চারণ মাথা নাড়ল। নেতিবাচক।

যাবেন না ?

না।

চারণের কানে গুরু শব্দটাই অসহ্য ঠেকে। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির ভক্ত ও। গুরুবাদে বিশ্বাস নেই, মন্ত্রে-তন্ত্রে ভক্তি নেই, দীক্ষা-টিক্ষাতেও আদৌ নয়। তবে একথাও ঠিক যে, যাঁদের আছে, তাঁদের প্রতি কোনও বিরূপতাও নেই।

তারপর ভাবল, সন্ন্যাসীর কি কোনও ধান্দা আছে ? নাহলে সদ্য-পরিচিত তাকে নিয়ে গিয়ে তার গুরুর কাছে ভিড়িয়ে দেওয়ার মতলব কেন ?

তারপর ও আবার ঘুরে বসল ত্রিবেণী ঘাটের দিকে মুখ করে। সন্ন্যাসীও তাই করলেন।

চারণ জিজ্ঞাসা করল সন্ন্যাসীকে, আজ কি কোনও উৎসব এখানে ? কোনও ব্রত-ট্রত ? এত মেয়েরা সব বিয়ের সাজে সেজে বেনারসি-টেনারসি পরে, গা-ভরা গয়না পরে প্রদীপ ভাসাচ্ছেন কেন নদীর জলে ? আজকে এখানকার পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে যেন দশেরার দিনে বসে আছি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখানেও মেয়েদের অমন করেই প্রদীপ ভাসাতে দেখেছিলাম উত্তরবাহিনী গঙ্গাতে।

হুঁ।

সন্ন্যাসী বললেন।

তারপর বললেন, আমি দশাশ্বমেধ ঘাটেও ছিলাম দুবছর। দশেরার দিনে প্রদীপ ছেলেরাও ভাসায়। সেই জল-প্রদীপ উৎসর্গ করা হয় পূর্বপুরুষদের প্রতি। তর্পণের এক রকম আর কী।

তাই ?

হুঁ।

তা আজ এখানে কিসের উৎসব তা তো বললেন না।

সন্ন্যাসী বললেন, আজ "কড়োয়া চওথ।"

সেটা কি ?

বিবাহিত মেয়েরা, "কড়োয়া চওথ" মানে, কোজাগরী পূর্ণিমার পরের কৃষ্ণা চতুর্থীতে স্বামীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাতে সন্ধেতে এমনি করেই জলে প্রদীপ ভাসায়। হিন্দু ও জৈন মেয়েরাও এদিন সারাদিন উপোস করে থাকেন, বিবাহিত মেয়েরা। প্রদীপ ভাসানোর পরে তারপরই বাড়িতে গিয়ে

www.MurchOna.com

খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-আহ্লাদ।

চারণ জিগ্যেস করল, যে-গাছের পাতাতে দোনা বানানো হয়েছে সেগুলো কোন গাছের পাতা ? আমি তালগাছ চিনি। তাল নয়। শাল পাতাও তো নয়। ওই পাতাগুলো কোন গাছের ?

শাল তো এই পার্বত্য অঞ্চলে হয়ও না। মহুলানও হয় না। সন্ন্যাসী বললেন।

মহুলানটা কি জিনিস ?

এক রকমের গাছ। সেই গাছের পাতা ব্যবহৃত হয় দক্ষিণ ভারতের সব মন্দিরে। তবে সে গাছ হয় ভারতের অনেক জায়গাতেই।

তাড় মানে ? তাল গাছ ?

সন্ন্যাসী হেসে উঠে বললেন, না, না। তাড়। তাল আমি চিনি। কালিঘাটেও ছিলাম কিছুদিন যে ! হিমালয়ে জন্মায় এই তাড় গাছ। দেখাব এখন আপনাকে একদিন।

বলেই বলল, আছেন কদিন ?

চারণ বললেন, ঠিক করিনি।

বাঃ।

সন্ন্যাসী বললেন।

বাঃ কেন ?

আপনিও সন্ত দেখছি। ক্যালেন্ডার দেখে আসা, ক্যালেন্ডার দেখে যাওয়া, ক্যালেন্ডার দেখে হাসা, ক্যালেন্ডার দেখে কাঁদা, ঘড়ি ধরে দিন শুরু করা এবং শেষ করা এর মধ্যে একটা চাকরি-চাকরি গন্ধ নেই কি ? এ বড় কঠিন চাকরি ! অন্য যে কোনও চাকরিই ছাড়া খুবই সহজ কিন্তু এই ক্যালেন্ডারের চাকরি, ঘড়ির চাকরি ছাড়া ভারী কঠিন। ভারী কঠিন।

তাই ?

অন্যমনস্ক গলাতে বলল চারণ।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনাকে দেখে বয়স তো বেশি বলে মনে হচ্ছে না। আপনি সন্ন্যাস নিলেন কেন ?

সন্ন্যাসী হাসলেন।

বললেন, সন্ন্যাস কি কেউ ইচ্ছে করলেই নিতে পারে ? শুধু গেরুয়া পরলেই কি সন্ন্যাস নেওয়া সম্পূর্ণ হয় ?

তারপর কিছুক্ষণ ত্রিবেণী ঘাটের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তবে একথাও ঠিক যে, নেওয়ার চেষ্টাতেই আছি গত পঁচিশ বছর ধরে। সন্ন্যাস ব্যাপারটা যে ঠিক কি ?— তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।

চারণ একটু অবাকই হল। তারপরই ঘাটের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে। বড় নয়নলোভন দৃশ্য। কত রঙের শাড়ি পরা কত বিভিন্ন বয়সী নারীরা ঘাটে যাচ্ছেন। ঘাটের মস্ত বাঁধানো চাতাল পেরিয়ে আবার ফিরে আসছেন। চোখের পক্ষে এও একধরনের Movable Feast. স্রোতের পর স্রোত। কত মানুষের গলার স্বর। বেশিই মেয়েদের। চাতালের একদিকে একটি মন্দির। সেখানে লাউডস্পিকারে মন্ত্রোচ্চারণ হচ্ছে। ভজন হচ্ছে। আর অন্যদিকে সাদা পাথরের মূর্তি। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃশ্য। ঘাটের তিনদিক থেকে সরু পথ এসে পৌঁছেছে চাতালে। আবার অনেক পথ নেমে এসেছে পাহাড়ের গায়ের নানা ধরমশালা এবং আশ্রম থেকেও। অনেকখানি এলাকা জুড়ে দেখবার মতন ঘাট বটে। সিঁড়ির পরে সিঁড়ি নেমে গেছে।

সন্ন্যাসী, চারণকে মুগ্ধচোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে স্বগতোক্তি করলেন, বর্ষাকালে অধিকাংশ সিঁড়িই ডুবে যায়।

ওই চাতালে বসে থাকতে থাকতে ভারী এক ঘোর লাগছিল চারণের। চারদিকে এত ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ। ভরাট গলার মন্ত্রোচ্চারণ। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, মন্দিরের ঘণ্টার নানা পর্দার ধাতব ধ্বনি, ভজনের শুদ্ধ ধ্বনি, হংসধ্বনিরই মতন, ওর মনকে আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

www.MurchOna.com

হঠাৎই সন্ন্যাসীর প্রশ্নে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল চারণের।

উনি বললেন, উঠেছেন কোথায় ?

ওর ইচ্ছে করল, মিথ্যে বলে। কারণ, এই চাতালে, জোড়াসনে বসে-থাকা সাধুর পাশে নিজেও পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বসে যে মানসিক "তল"এ এতক্ষণ বিরাজ করছিল ও, হোটেলের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই, চারণ জানে যে, এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর মানসিক তল-এর তফাৎ হয়ে যাবে।

চারণ ভাবল, যে মিথ্যে কথা বলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ঠিক করল যে না, মিথ্যে বলবে না।

সন্ন্যাসী তারই মুখের দিকে চেয়েছিলেন।

বলল, মন্দাকিনী হোটেল।

সেটা কোথায় ?

অবাক হল চারণ। আশ্বস্তও। ভাবল এই জন্যেই ওই তরুণ, তার প্রায় সমবয়সী এই মানুষটি সন্ন্যাসী হতে পেরেছেন।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশে আসতে হলে 'মন্দাকিনী হোটেল' পথেই পড়ে। বাঁদিকে। তিনতারা হোটেল। হৃষীকেশে আর একটি মাত্র তিনতারা হোটেল আছে, দেরাদুনের পথে। সন্ন্যাসী যদি প্রকৃত সন্ন্যাসী না হতেন তবে হোটেলের নাম শুনেই লোভে চোখ দুটি চকচক করে উঠত হয়তো। কিন্তু হৃষীকেশের বাসিন্দা হয়েও মন্দকিনী হোটেলের নাম-না-শোনা সন্ন্যাসী তাঁর থলেতে হাত ঢুকিয়ে নির্লিপ্ত মনে একটি বিড়ি বের করলেন। তারপর দেশলাই দিয়ে ধরালেন সেটা। চারণের দিকে ভাল করে চাইলেন। হয়তো ভাবলেন, চারণ ধূমপান করলেও নিশ্চয়ই ভাল সিগারেট খায়। তাকে বিড়ি অফার করাটা ভব্যতা হবে না। সুতরাং তা থেকে নিরত থেকে, নিজের বিড়িতে সুখটান লাগালেন একটা।

আপনি ভারতের কোন প্রদেশের মানুষ ?

চারণ জিগ্যেস করল।

করেই, মনে পড়ল সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জিগ্যেস করতে নেই।

কিন্তু সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন। বললেন, মহারাষ্ট্রের। পুনের কাছের।

বলেই বললেন, সন্ত তুকারামের নাম শুনেছেন ?

নাঃ।

চারণ বলল।

বলেই মনে মনে বলল, কোনও সন্ত-ফন্ত-রই নাম শোনেনি সে। চারণের পরলোকগতা মায়ের খুবই ইচ্ছে ছিল যে, এইসব জায়গাতে আসেন তীর্থদর্শনে। কিন্তু তখনও চারণ নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি। বাবাও গত হয়েছেন আগেই। ওর সামর্থ্য ছিল না যে মাকে নিয়ে আসে। তখন মাকে আনতে পারেনি। এখন মা নেই। ও একাই এসেছে। ধর্ম-টর্ম মানে না ও। দেব-দেবতা মানে না। গুরু মানে না। কলেজের ছাত্র থাকাকালীন বাম-ঘেঁষা রাজনীতিও করেছিল। তাই ধর্ম, ধর্মস্থান, দেব-দেবী ইত্যাদি সম্বন্ধে জন্মে-যাওয়া এক গভীর অসূয়াও এইসব তীর্থস্থানে মাকে না-নিয়ে আসার হয়তো একটি কারণ ছিল।

তারপরে কী মনে করে বলল, কে তিনি ? সন্ত তুকারাম ?

সন্ন্যাসী বললেন, সন্ত তুকারামও মারাঠি ছিলেন। মহারাষ্ট্রেরই মানুষ।

তাই ? আপনি কি তাঁর চেলা ?

না, না। নাম শুনেছি। তাঁর সম্বন্ধে শুনেছি, পড়েছি। ওঁকে কি আর চোখে দেখেছি কখনও ? কত শতাব্দী আগের কথা।

আপনি কি তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন ?

সন্ন্যাসী হেসে ফেললেন চারণের কথা শুনে।

বললেন, আবারও বলছেন সন্ন্যাসের কথা। আগেই বলেছি, সন্ন্যাস আমি নিতে পারিনি এখনও। এখানে অনেক পকেটমার, নেশাখোর, চোর-বদমাশও আছে। আমিই যদি সন্ন্যাসী হতে পারতাম

www.MurchOna.com

তাহলে তারা দোষ করল কি ?

তাহলে ?

তাহলে কি ?

বলেই, কটুগন্ধ বিড়িতে কষে এক টান লাগালেন সন্ন্যাসী ।

গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল চারণের ।

বলল, তাহলে সংসার ছাড়লেন কেন ?

আমার মা আর বাবা তিন মাসের ব্যবধানে হঠাৎই মারা গেলেন । একেবারেই হঠাৎ ।

অ্যাকসিডেন্টে ?

না, না । এমনি অসুখেই । তবে অ্যাকসিডেন্টেরই মতন । কোনও ভারী অসুখও নয়, কোনও মারীতেও না, অতি সামান্য জ্বর হয়েছিল । দুজনেরই । কদিন আগে আর পরে । কিন্তু ডাক্তার দেখানোর আগেই গেলেন ।

এই অবধি বলেই সন্ন্যাসী আবার উদাস হয়ে নদীর দিকে তাকালেন । বিড়িটা শেষ করলেন আস্তে আস্তে ।

তারপর বললেন, মায়ের মৃত্যুর সময়ে বাবা তো বটেই, আমিও পাশেই ছিলাম । সন্ধে রাত্তিরে গেলেন মা । যাবার আগে মায়ের মুখচোখে কেমন আতঙ্কের ছাপ দেখলাম । দারুণ আতঙ্ক । আঙুল দিয়ে খোলা জানালার দিকে দেখালেন বারবার । যেন কারওকে বা একাধিক মানুষকে বা জন্তুকে দেখতে পাচ্ছেন । মানুষ বা জন্তু, যে বা যাদেরই মা দেখতে পেয়ে থাকুন না কেন, তাদের দেখে উনি ভীষণই ভয় পেয়ে গেছিলেন ।

তাই ?

অবাক হয়ে চারণ বলল ।

তারও মনে পড়ে গেল তার বাবার মৃত্যুর কথা । চারণও তার বাবার মৃত্যুর ক্ষণে তাঁর মুখেও দারুণ এক আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করেছিল !

একেবারে ভুলেই গেছিল ব্যাপারটা ।

মায়ের মৃত্যুর সময়ে অফিসের কাজে সে কলকাতার বাইরে ছিল । মায়ের মুখেও আতঙ্ক ফুটেছিল কিনা বলতে পারবে না মৃত্যুর ক্ষণে । এত বছর পরে আজ সন্ন্যাসী এ প্রসঙ্গ তোলাতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার বাবার মৃত্যুর কথা । আগে কিন্তু এ নিয়ে তেমন করে ভাবেওনি কখনও ।

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন ।

আর গান গাইবেন না ?

নাঃ । আজ আর নয় । রোজই যে গান গাই এমনও নয় । যেদিন ইচ্ছে করে, সেদিন গাই ।

ঠাকুরকে শোনাতে ?

না, তাও নয় । তবে যে যাই করুক না কেন সব কাজেরই যেমন একটা উদ্দেশ্য থাকে, তেমন বিধেয়ও থাকে । ওই দিকে মুখ করে গাওয়াটাই বিধেয়, তাই ।

সংসার কেন ছাড়লেন তা কিন্তু বললেন না এখনও ।

চারণ বলল ।

সন্ন্যাসী হাসলেন । ওঁর হাসিটা ভারী মিষ্টি । দুটি গজদন্ত আছে সন্ন্যাসীর । হাসলে, সুন্দর দেখায়, কৃশ, তামাটে সন্ন্যাসীকে । বয়সই বা কত হবে ? বড় জোর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ । চারণের চেয়েও ছোট ।

সন্ন্যাসী বললেন, আপনি তো খুব হড়বড়িয়া মানুষ ।

তারপর আবারও ঘাটের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সংসার ছিলই আর কোথায় ? সংসার তো ছিল, বাবা আর মাকেই নিয়ে । মা-বাবাই চলে গেলেন । তখন আমার বয়স মাত্র সতেরো । অত অল্প সময়ের ব্যবধানে, মানে, মাত্র দুমাসের ব্যবধানে, দুজনেই চলে যাওয়াতে বড় অসহায় তো হয়ে গেলামই, তাছাড়া আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগল, যা ওই বয়সী কোনও ছেলের মনে জাগার কথা ছিল

www.MurchOna.com

না কোনও। কিন্তু জেগেছিল।

কী প্রশ্ন ? মানে কীরকম প্রশ্ন ?

ওই ! জীবন কি ? জীবন কেন ? মৃত্যুই বা কি ? মৃত্যুর পরে কি অন্য কোনও জীবন .....তাই ভাবলাম, বেশ কিছু সময় হাতে থাকতে থাকতেই বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে দুনিয়া দেখতে। ভাবলাম, নানা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব, জিগ্যেস করব নানা সাধু-সন্তদের, ভাবব, প্রয়োজনে সাধনা করব। জেনে নেব, মা-বাবা কোথায় গেলেন ? যাওয়ার সময়ে অমন ভয়ই বা কেন পেলেন ? মৃত্যুর পরেও জীবন আছে কি না, এইসব নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজব। আমার নিজের জীবনওতো অনন্তকালের নয় !

কত বছর হল ঘর ছেড়েছেন ?

চারণ জিগ্যেস করল।

আঠারো বছর।

জানলেন কিছু ? মানে, আপনার সব প্রশ্নের জবাব কি পেলেন ?

নাঃ। কোনও প্রশ্নের জবাবই পাইনি। জবাব পাইনি যে তা নয়, সে সব জবাব মনঃপূত হয়নি। হতাশ ঠিক নয়, তবে উদাসীন গলায় বললেন সন্ন্যাসী।

তবে ? উত্তর নাই যদি পেয়ে থাকেন তো এখন ঘরে ফেরার বাধা কোথায় ?

নাঃ।

কী নাঃ।

ঘরে আর ফিরব না। ঘরকে তেমন করে ছেড়ে এলে ঘর আর ফেরত নেয় না কারওকেই। তাছাড়া, ঘর বলতে তো ছিলও না কিছু আমার। মানে, ভালবেসে থাকার মতন কিছু ছিল না। শুনেছি আমার সম্পত্তি কাকারা জবরদখল করে নিয়েছিলেন আমি চলে আসার পরেই। আমার এক মামা থাকতেন নাসিক-এ। তিনি চেয়েছিলেন আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে সংসারী করতে। জমিজমা কম ছিল না। কিন্তু আমিই পালিয়ে এসেছিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, জমিজমা, ঘর-বাড়ি যদি থাকতও তবেও ফিরে গিয়ে সেখানে তিষ্ঠোতে পারতাম না। এই আকাশ, বাতাস, এই পাহাড়, নদী, এই শ্মশান এইসব ধর্মস্থানে সারা ভারতের সারা পৃথিবীর সাধু-সন্ত, সন্ন্যাসীদের ভিড়। এদের ছেড়ে যেতে পারব না আর। কত কী জানার বাকি আছে। জানা তো কিছুই হয়নি। এঁরা কেন পড়ে আছেন বিভিন্ন তীর্থস্থানে ? কিসের খোঁজে ? কিছু কি পেয়েছেন এঁরা ? নাকি এঁরাও আমারই মতন তালাশেই আছেন এখনও ? কে জানে ! হয়তো এঁরাও কিছু পাননি। এঁরাও হয়তো নেশারই ঘোরে, গাঁজা-আফিঙের-ভাঙের নেশা, এই খোলামেলা জায়গার নেশা, এই ক্যালেন্ডার আর ঘড়ির দাসত্ব থেকে মুক্তির নেশাতে মজেছেন। আমারই মতন। সারা জীবনেরই মতন ফেঁসে গেছেন হয়তো।

ফেঁসে গেছেন কেন বলছেন ? বলুন, উৎরে গেছেন। চারণ বলল।

তারপর মনে মনে বলল, আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকেরা বলেন 'উত্তরণ'।

তারপর বলল, ফেঁসে গেছেন, গেঁথে রয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সংসারে আছেন। আপনার ভাষাতে ক্যালেন্ডার আর ঘড়ির দাসত্ব-করা জীবেরা। টাকা, ব্যবসা, বাণিজ্য, জাগতিক সব প্রাপ্তির পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছেন অবিরত তাঁরাই।

সন্ন্যাসী হঠাৎই প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, আপনি কি করেন ?

কিছু করি না। মানে, করব না আর এখন।

কি করতেন ?

বাঙালি হয়ে জন্মেছি, আর কী করব ? চাকরি। তবে আমি যা করি তাকে চাকরি ঠিক বলা যায় না। কারণ আমার অনেক মালিক, একজন নয়।

তাই ? সংসার করেননি ?

করব করব করেছিলাম, কিন্তু করা হয়নি।

www.MurchOna.com

তাজ্জব কী বাত।

বলেই, সন্ন্যাসী আবারও আসলেন। গজদন্ত দেখা গেল আবারও।

তারপরে গানের বইটির ধুলো ঝেড়ে কাঁধের ঝোলাতে ভরে ফেলে বললেন, এবারে...

চারণ ভাবল এবারে টাকা চাইবেন নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী, এতক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করার খেসারত হিসেবে। কিন্তু নাঃ। চারণ চাটুজ্যেকে অবাক করে দিয়ে তার মুখনিঃসৃত বাক্যকে সম্পূর্ণ করলেন উনি, এবারে আমি কালিকমলি বাবার আশ্রমে যাব।

কি করতে ?

চারণ শুধোল।

খেতে।

কি খাবেন কালিকমলি বাবার আশ্রমে ?

যা দেবে।

কি দেয় ?

রুটি, তরকারি। কখনও ডালও।

তাতেই হয়ে যায় ? আর কিছু ?

হয়ে যায়। পেটের খিদেকে সব সময়েই জাগিয়ে রাখা উচিত প্রত্যেকেরই। উপোস থাকতে পারলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তখন মাথাটা দারুণ সাফ হয়ে যায়। 'আগুন পোড়ায় শরীরকে আর চিন্তা পোড়ায় মনকে'। কাশীর শ্মশানে এক তান্ত্রিক আমাকে বলেছিলেন কথাটা। ভারী মনে ধরেছিল।

একেবারে উপোস ? উপোস করে থাকেন নাকি ?

হ্যাঁ। তবে, মাঝেমধ্যে খাই। আমি তো আর উচ্চমার্গে উঠতে পারিনি। আমার গুরু, যাঁকে দেখালাম, তিনি অনেকসময় পনেরোদিন বা একমাস না খেয়েও থাকেন। বকা-ঝকা করে খাওয়াতে হয়। গুরু বলেন, খেয়ে নষ্ট করার মতন সময় তাঁর নেই। বলেই, হাসলেন সন্ন্যাসী।

তারপর বললেন.....এ দেশের যারা মালিক, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তারা দেশটাকে ডোবাল খাইখাই করে আর বেশি খেয়েই। এই দেশটার নাম ভারতবর্ষ বাবু। এখানে যে কত আশ্চর্য সব মানুষ, ভাবনা-চিন্তা আছে, কত সাধু, সন্ত, তান্ত্রিক, সফী, সৈয়দ, পীর আছেন, তার খোঁজ এখন গ্রামের মানুষেরাই রাখে না, তা আপনার মতো শহুরে মানুষের দোষ কি ? এখন টিভি দেখলেই সব জানা যায়। জানার বাকি আর কি থাকে বলুন ? অন্তত আপনারা তাই ভাবেন। বড় অভাগা দেশ তো। হতভাগা মানুষদের দেশ।

বলেই, পা বাড়াবার আগে বললেন, আপনার নাম কি ?

চারণ চ্যাটার্জি।

তারপর চারণ জিগ্যেস করল, আপনার নাম, সাধুজি ?

পূর্বাশ্রমের নাম তো নিজেই প্রায় ভুলে গেছি। আমার নাম ভীমগিরি আর আমার গুরুর নাম ধিয়ানগিরি। উনিই আমার নাম রেখেছেন ভীমগিরি।

ভীমগিরি, কালিকমলি বাবার আশ্রমের দিকে যাবার আগেই চারণ বলল, আপনি রাতে শোবেন কোথায় ?

কেন ? এই চাতালে।

বলেন কি ? এই চাতালে ? এখনই যা ঠাণ্ডা !

হাঃ। গুরুজির সেবা করব ফিরে এসে। তাঁকে গাঁজা সেজে দেব। তারপর ত্রিবেণী ঘাট যখন নিশ্চুপ হয়ে যাবে, গভীর রাতে শুধু নদীর স্রোতের শব্দ আর হাওয়ার শব্দ বাজবে আর ছমছমে

www.MurchOna.com

অন্ধকার, তখন মধ্যরাতে গুরুজি গান গাইবেন। আহা কী গান!

শেষ রাতে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠবে আমার গুরুজির গান শোনার জন্যে।

তারপর?

এমন সময়ে একটি মেয়ে সন্ন্যাসীর দিকে ঘাটের দিক থেকে এসে সামনে দাঁড়াল। তার পরনে একটি ছাই-রঙা সিনথেটিক শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ। পিঠের উপরে ছড়ানো বেণীর চুলে নীল-রঙা কোনও ফুল গুঁজেছে। চেহারাটা একটু মোটার দিকেই। সুগন্ধ বেরুচ্ছে তার গা থেকে। যদিও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। নাকের খাড়াই-এর উপরেও ঘামের ছোট ছোট বিন্দুর সারি। নাক চিবুক দেখে মনে হয় কোনও শিল্পী যেন কালো পাথরে ছেনি-বাটালি দিয়ে তাকে গড়েছেন।

হাসি হাসি মুখে সেই কৃষ্ণা মেয়েটি এসে ভীমগিরির কাছে দাঁড়াতেই ভীমগিরি বললেন, কি খবর? মাদ্রী? আসনি কেন দুদিন?

জ্বরে পড়েছিলাম যে!

ভাল আছ তো এখন?

হ্যাঁ। আপনি ভাল আছেন?

আমি তো সব সময়ে ভালই থাকি। শুধু অম্বলই ভোগায়।

মেয়েটি হেসে বলল, এই এক বালাই বটে। ভোগী কী যোগী কারওই রেহাই নেই এর হাত থেকে।

ভীমগিরি হেসে বললেন, যা বলেছ।

মেয়েটি এবং ভীমগিরির কথোপকথন কিন্তু পরিষ্কার বাংলাতেই হচ্ছিল। ভীমগিরিকেও এমন চমৎকার বাংলা বলতে শুনে অবাক হয়ে গেল চারণ।

যাই।

বলল মেয়েটি।

এসো, রোজ এসো। তোমাকে না দেখলে ভজনে মন বসাতে পারি না। গানের সময়ে এসো।

আসব। বলেই, সেই কৃষ্ণা সিঁড়ি বেয়ে নেমে ঘাটের চাতাল পেরিয়ে প্রথমে প্রায়ান্ধকারে তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত পাহাড়ের উপরের কোনও আশ্রমে চলে গেল সে।

মাদ্রী! ভারী সুন্দর নাম তো। কী মানে, কে জানে? মানে কি আছে কোনও? সব নামের তো মানে হয় না! ভাবল চারণ।

ভীমগিরি বললেন, এবারে সত্যি সত্যিই যাই।

চারণ আশ্চর্য এবং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চলে-যাওয়া ভীমগিরির দিকে চেয়ে রইল।

অনেক কথা জানবার ছিল চারণের তাঁর কাছে।

এই মেয়েটি কে? ভীমগিরি এবং তাঁর গুরু ধিয়ানগিরির সঙ্গে কি সম্পর্ক তার? বাঙালি তো মেয়েটি বটেই কিন্তু বাড়ি তার কোথায় ছিল? কি করে সে হৃষীকেশে? কিছুই জানা হল না!

বড় ভাল লেগে গেল এই সন্ন্যাসীকে, তার কথাবার্তা এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার সম্ভ্রান্ততাকেও।

দেরাদুন থেকে হৃষীকেশে এসে আজ পৌঁছেই এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপিত হওয়াটা ওর কাছে মস্ত বড় এক প্রাপ্তি বলে মনে হল। কোনও ফেরেববাজ মানুষ, দুনম্বরী সাধুর সঙ্গেও তো দেখা হতে পারত। দুনম্বরী নেতা, দুনম্বরী সাহিত্যিক, হাকিম, উকিলে দেশ ছেয়ে গেছে। এই প্রেক্ষিতে এই একনম্বরী ভীমগিরি-প্রাপ্তি অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আত্মানুসন্ধানে প্রায় নিরুদ্দেশে ঘর-ছাড়া চারণের মনে হচ্ছিল এই 'কাড়োয়া চওথ'-এর সন্ধেতে এই সন্ন্যাসীর দর্শন লাভের ঘটনাটির গূঢ় তাৎপর্য আছে।

হোটেলে পৌঁছে ডাইনিং রুমের দিকেই যাচ্ছিল। তারপর ভাবল, চান করবে। গিজার তো আছেই বাথরুমে।

দুপুরে এসে পৌঁছনো অবধিই দেখছে লিফটটা একটু গোলমাল করে। কারণ, কয়েক বছর আগে

www.MurchOna.com

গাড়োয়াল হিমালয়ের ভূমিকম্পতে এই তিনতারা হোটেল বাড়িতেও সামান্য ফাটল ধরেছিল। তাতেই লিফটটার অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হয়ে গেছে। ভূমিকম্পর বাড় হয়েছিল এখান থেকে বহুদূরে যোশীমঠে কিন্তু জের এখানেও পৌঁছেছিল এসে। এখানেও তার আঁচড় লেগেছিল। এখানে ভূমিকম্প হলে কী হতে পারে তা কলকাতাতে বসে অনুমান করাও শক্ত। এই নগাধিরাজের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ভূমিকম্পের কথা ভাবলেও বুকে কাঁপুনি ধরে।

ঘরে গিয়ে চারণ ভাল করে চান করল। ভাবল, রুম-সার্ভিসে বলে রাতের খাবার আনিয়ে নেবে ঘরে। চান সারবার পরেই হঠাৎ ওর মনে হল যে, স্মরণেই আসে না সুস্থ অবস্থাতে ও জীবনে একদিনও স্বেচ্ছাতে একবেলাও অভুক্ত থেকেছে বলে।

সন্ন্যাসীর উপোস থাকার কথাটা তার মনে আলোড়ন তুলেছিল। চান সেরে, জামা-কাপড় বদল করে ও শুয়ে পড়ল। বাসে এসেছিল দেরাদুন থেকে। বাসে চড়ারও অভ্যেস চলে গেছে বেশ কয়েক বছর। তবু বাসে আসতে কষ্ট কিছুই হয়নি। বরং নানা মানুষের নানা কথা, কনডাক্টরের রসিকতা, এসব শুনতে শুনতে আসতে ভালই লেগেছিল। তবে দিল্লি থেকে দেরাদুন, মক্কেলের মার্সিডিস গাড়িতে এসেছিল। কয়েক বছর হল এমনই হয়েছে যে, তার জীবনটাই স্বাভাবিক আলো হাওয়ার সঙ্গে যেন সম্পর্ক-বিবর্জিত হয়ে গেছিল। অতটুকু পথ বাসে আসতে বেশ লেগেছিল। হরিদ্বার থেকে গা-জোয়ারি করেই বাসে এসেছিল, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে।

রুম-বেয়ারা এসে খোঁজ নিয়ে গেল, খাবারের অর্ডার দেবে বা দিয়েছে কি না টেলিফোনে, না সেই নিয়ে যাবে ?

চারণ বলল, খাবে না কিছু।

তবিয়ৎ খারাপ হ্যায় ক্যা সাব ?

নেহি। অ্যাইসেহি।

গুডনাইট সাব। বেড-টি কি বারেমে ইন্টারকমমে রুম-সার্ভিসসে বোল দিজিয়ে গা।

বেয়ারা চলে গেলে, ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে এসে একবার দাঁড়াল চারণ। তীব্র বেগে বয়ে চলেছে গঙ্গা, হৃষীকেশ এর কাছে একটি ছোট ড্যাম হয়েছে। নদীর উপরে। তারই উজ্জ্বল নীলাভ-সবুজ আলো দেখা যাচ্ছে। ঘাটের দিকে যাওয়ার আগে মন্দাকিনী হোটেলের ম্যানেজার বলছিলেন যে, ওই ড্যামের উপরের রাস্তা পেরিয়েই বাঁদিক দিয়ে নদীর গা-বরাবর এলে রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অনেকখানি উঠে নীলকণ্ঠদেবের মন্দির। নীলকণ্ঠদেবের মন্দিরে অবশ্য রামঝুলার হ্যাঙ্গিং ব্রিজ-এ গঙ্গা পেরিয়ে পাকদণ্ডী দিয়েও যাওয়া যায়। তবে চার ঘণ্টার পথ। চড়াইও খুব। নির্জন বলে জন্তু-জানোয়ারের ভয়ও আছে।

ও যে মন্দির দেখতে আসেনি। ও যে এসেছে মনকে শান্ত করতে, নিজের মনের মধ্যে যদি কোনও বিশ্বাসের মন্দির অনাবিষ্কৃত থেকে থাকে, তাকেই আবিষ্কার করতে। কিছু স্বার্থহীন মানুষ, কিছু ধান্ধাবিহীন মানুষের সঙ্গে মিশে, সাধারণভাবেই সব মানুষের উপরে যে বিশ্বাস ও প্রায় হারিয়েই ফেলতে বসেছিল, সেই বিশ্বাসকে ফেরাতে পারা যায় কি না, তারই সমীক্ষা করতে বেরিয়েছে যে ও। প্রায় নিরুদ্দেশই হয়ে গেছে বলতে গেলে চারণ। ইচ্ছে করেই থ্রি-টায়ারে এসেছে, নন-এসি। যদি কেউ খোঁজ করতে চায়ও তবে সকলেই বিভিন্ন এয়ারলাইন্স-এর প্যাসেঞ্জার লিস্ট এবং বিভিন্ন ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস এ সি-র প্যাসেঞ্জার লিস্টই চেক করবে। কারও মাথাতেই আসবে না যে, চারণ নন-এসি থ্রি-টায়ার ট্রেনে করে কোথাও যেতে পারে। দাড়ি-গোঁফও কামায়নি। কালই এই হোটেলটা থেকেও চেক-আউট করতে হবে। এখানেই দু-তিন জোড়া সাদা খদ্দরের পাজামা-পাজামা বানিয়ে নেবে। তা নইলে এই ভীমগিরি নামক সন্ন্যাসীদের মতন মানুষদের "সমতলে" নামা অথবা ওঠা হবে না।

কাকে "নামা" বলে আর কাকে "ওঠা" বলে, তা কে জানে! চারণ অন্তত জানে না। ওঁদের সমতলে না পৌঁছুতে পারলে....

www.MurchOna.com

হোটেলের তিনতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে অনতিদূর দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অতি দ্রুত বয়ে-যাওয়া খরস্রোতা গঙ্গার স্রোতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওপারের গভীর জঙ্গল, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে অন্ধকারতর দেখাচ্ছে। ওই জঙ্গলও রাজাজি ন্যাশনাল পার্কেরই অন্তর্ভুক্ত ? চাঁদ সবে উঠেছে, পুবাকাশে। তখনও ছোট। সেই প্রায়ান্ধকারে নদী আর জঙ্গল আর জঙ্গলের পা থেকে উঠে যাওয়া মেঘের শ্রোণিভারের মতন পর্বতশ্রেণী উঠে গেছে পরতের পর পরত। চারদিকে, এই রাতে, বড় রহস্য। পর্বতে কখনই ওঠেনি চারণ আগে। এখন ওঠার সময়ও নয়। আর কিছুদিনের মধ্যেই কেদারনাথ বদ্রীনাথের মন্দির অগম্য হয়ে যাবে। তাছাড়া মন্দিরে যাওয়ার জন্যে কোনও উদ্‌গ্র বাসনাও নেই, অগণ্য, অন্ধ-ভক্তি লালন-করা অথবা হুজুগে-মাতা ক্যাপসুল—পূণ্য প্রত্যাশী তীর্থযাত্রীদের মতন। তবে ওর জীবনে কোনও কাজই সময়ে করেনি ও। তাই অসময়েই পর্বতে উঠতে কোনও মানা, নেই মনের দিক দিয়ে। তবে উঠলে, ভ্রমণার্থী হিসেবেই উঠবে। মন্দিরে গির্জাতে মসজিদে তার কোনওই ঔৎসুক্য নেই। প্যারিসে গিয়েও নৎরদামের ভিতরে ঢোকেনি।

চারণ ভাবছিল যে, তার জীবনে এমন মুক্তি এবং আনন্দও কখনওই আগে বোধ করেনি। জীবিকা থেকে মুক্তি, জীবিকার সমস্তরকম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, মিথ্যা সমাজ, মিথ্যা আত্মীয়তা থেকে মুক্তি, এমনকি নিজেকে অক্টোপাসের মতো বহুবাহু দিয়ে বেঁধে রাখা নিজের বহুরকম নিজস্ব সত্তার আভ্যন্তরীণ বন্ধন থেকেও মুক্তি।

একজন মানুষের মধ্যে যে একাধিক মানুষ বাস করে, এই কথা 'মাধুকরী' নামের একটি বাংলা উপন্যাসে প্রথমবার পড়ে চারণ চমকে উঠেছিল। কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেনি।

যে কোনও তত্ত্বই জানা এক কথা আর তা জীবনে প্রয়োগ করা অন্য কথা। অধীত আর ফলিত বিদ্যাতে যেমন তফাৎ হয় আর কী ! অধ্যয়ন অনেকই বিষয়ে, অনেকেই করেন কিন্তু সেই অধীত বিদ্যা এবং জ্ঞানকে হৃদয় দিয়ে ছুঁয়ে সেই বিদ্যা এবং জ্ঞানে নিজেকে মঞ্জরিত করে তোলা সম্পূর্ণই অন্য ব্যাপার। ফুলের বাগানে গিয়ে বসে বাগানের শোভা দর্শন করা আর নিজের বুকের মধ্যে সেই ফুল ফোটানো যেমন সম্পূর্ণই ভিন্ন ব্যাপার।

সামনের নদী আর বন আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চারণ ভাবছিল, রাজাজি অভয়ারণ্যে যাবে একবার। সে বন বা বন্যপ্রাণী বিশারদ নয়। হবার কোনও সুযোগ অথবা ঔৎসুক্যও হয়নি। মনের বন ছাড়া অন্য কোনও বনেই ও যায়নি বিশেষ। মনে বিচরণ করলেও, মনের অলিগলির খোঁজ রাখেনি তেমন করে। তাই বনের অলিগলির খোঁজের তো কথাই ওঠে না।

চারণ নাম ভাঁড়িয়ে উঠেছে এই হোটেলে। ও চোর-ডাকাতও নয় বা সাধু-সন্তও নয়। সৌভাগ্যবশত ইদানীংকালের কোনও জননেতা বা চিত্রাভিনেতা বা সাহিত্যিক বা গায়কও নয়। দূরদর্শনের দয়া বা অভিশাপে যাঁদের একে-অন্যের মধ্যে তেমন তফাৎ আর অবশিষ্ট নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, সাধারণের কাছে তার কোনও পরিচিতিই নেই। অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা যেমন নেই কারওই তার সম্বন্ধে, কোনও উচ্ছ্বাসও নেই।

বাঁচা গেছে। কলকাতা থেকে পালিয়ে, জীবিকা থেকে পালিয়ে, নিজের মধ্যের এককালীন প্রিয় অধিকাংশ সত্তা থেকে নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে ছিনতাই করে নিয়ে আসতে পেরে সত্যিই বড় আনন্দ বোধ করছে চারণ।

ও ভাবছিল যে, এখানে এসে পৌঁছনো অবধি ও নিজের ভেতরটা ভাবনাতে ভাবনাতে এত ফেনিল করে তুলছে কেন ! তারপরই ব্যাখ্যা হিসেবে নিজেই নিজেকে বলল যে, জীবিকা, জীবন, সংসার, এই সমস্তও যে সততই ফেনিল। নিরন্তর ফেনা আর বুদ্বুদেরই স্বগতোক্তি সেখানে। সমুদ্রের নির্জন বেলাভূমির ফেনারই মতন। জীবিকা, জীবন, সংসার, সমাজের আবর্তে দলিত, পিষ্ট, মথিত যে ফেনা, তা থেকে সরে আসার কারণ বা স্বরূপ ঠিকমতো বোঝাতে গেলেও তো তা এক কথাতে বোঝানো যায় না। নিজেকেই বোঝানো যায় না ! তার, পরকে !

এর মধ্যেই এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। ত্রিবেণী ঘাটে যখন বসে ছিল তখনই সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে নদীরেখা ধরে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু হয়েছিল। তিনতলার বারান্দাতে

www.MurchOna.com

দাঁড়িয়েও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে।

হৃষীকেশে পৌঁছেই মনটা যেন কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে চারণের। একেই কি স্থানমাহাত্ম্য বলে ? নিজেই যেন নিজের আয়না হয়ে গেছে। ও ভাবছিল যে, মানুষ-মানুষীর বাড়িতে প্রতি ঘরে ঘরে যত অসাবাব থাকে সেই তুলনাতে আয়নার সংখ্যা অতি কম। অথচ আয়নার মতন প্রয়োজনীয় আসবাব মানুষ আর অন্য কিছুই আবিষ্কার করেনি। অন্য সব আসবাবেরই বিকল্প অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু আয়নার কোনও বিকল্প নেই। অন্তত ঘরের মধ্যে নেই। আয়নার সামনে মূর্খ সংসারী মানুষেরা যখন দাঁড়ায়ও তখনও তারা প্রত্যেকেই তাদের বাহ্যিক রূপটিকেই দেখে। শুধুমাত্র শারীরিক রূপই। চোখের কাজল বা সুর্মা, কপালের টিপ, গোঁফের বা জুলপির ছাঁট, ঠোঁটের লিপস্টিক, দাড়ি-কামানো নিখুঁত হল কি না। এই সবই। কিন্তু তাদের মনকে কি দেখে কখনও ? মানুষের মন কি দেখা যায় কোনও আয়নাতেই ? অবশ্য, দেখতে হয়তো কেউ চায়ও না।

এখানে আসার পরে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন চারণের বুকের মধ্যে অগণ্য আয়নাগুলো সব নড়েচড়ে বসেছে। আশ্চর্য ! এতগুলো বছর যে ওরা কোথায় ছিল।

অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল।

যখন নিয়মিত গলফ খেলতে যেত কলকাতার টালিগঞ্জ গলফ ক্লাবে, তখন যেমন ভাঙত।

গত রাতে কিছুই খায়নি বলে শরীরটা খুবই হালকা লাগছিল।

রুম-সার্ভিসে চা আর টোস্ট আনতে বলে দিয়ে, ও মুখ ধুয়ে বারান্দাতে এসে দাঁড়াল। পুবের আকাশ তখনও স্পষ্ট হয়নি। হবে, আধঘণ্টার মধ্যেই।

ত্রিবেণী ঘাট যেন ওকে হাতছানি দিচ্ছিল। কী এক অদৃশ্য টান বোধ করছিল ও। যেন কতদিনের পরিচিত এবং প্রিয় জায়গা।

অনেকগুলি 'হোল' খেলবার পরে টলি-ক্লাবের চারদিক-খোলা খড়ের ঘরে বসে ছুটির দিনে বিয়ার খেতে খেতে আড্ডা মারবার নেশার মতন এক নেশাতে আচ্ছন্ন করেছে যেন তাকে ত্রিবেণী ঘাট। আশ্চর্য কাণ্ড !

চা আসতেই দুটি টোস্ট দিয়ে চা খেয়ে ও তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কেডস-টেডস বা গলফ শু এসব কিছুই তো আনেনি। এ তো আসা নয়, পালানো। পালাবার সময়ে তো সকলেই একবস্ত্রেই বেরিয়ে পড়ে। কাবলি-জুতো পরে তাড়াতাড়ি হাঁটাও যায় না। শালটা গায়ে জড়িয়ে নিল ও। একটা টুপিও কিনতে হবে। এই বয়সেই মাথার চুল পাতলা হয়ে গেছে। বাবারও টাক পড়ে গেছিল পঁয়ত্রিশে। আর সবচেয়ে বেশি ঠাণ্ডা লাগে মাথাতেই। আর পায়েও। অথচ কাবলির সঙ্গে মোজা পরলে পা জুতোর মধ্যে ক্রমাগত পিছলে যেতে থাকে, হাঁটা যায় না। তাই পায়েও ঠাণ্ডা লাগছে। ট্রাউজার না পরাতে হাঁটুতেও শীত করছে।

ঘাটে পৌঁছে দেখল, সূর্য তখনও ওঠেনি। কিন্তু সেই চাতালে রাত-কাটানো সব মানুষই প্রায় উঠে পড়েছেন ততক্ষণে। এক-দুজন অবশ্য তখনও ঘুমুচ্ছেন। বোধহয় রাতে দেরিতে শোওয়ার জন্যে অথবা বেশি গঞ্জিকা সেবনের জন্যে। ভীমগিরিকে দেখতে পেল না এদিক-ওদিক তাকিয়ে। তবে তার গুরুকে দেখল। তিনি যোগাসনে, একেবারে স্থির হয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। দূর থেকে দেখে মনে হল তাঁর চারপাশের, পৃথিবী যেন মুছে গেছে তাঁর চোখ থেকে। সব কিছুই নড়ছে। কিন্তু তিনি অনড়।

www.MurchOna.com

গুরুর সঙ্গে তো চারণের আলাপ হয়নি, নামও জানে না। তাছাড়া কোনও দেব, দ্বিজ এবং গুরুতে তার ভক্তি নেই। তাই সে ঘাটের দিকে নেমে চলল সিঁড়ি বেয়ে। কয়েকটি সিঁড়ি নেমেই মস্ত বাঁধানো চাতালে এসে পড়ল। এত বড় চাতাল যে পাঁচ-ছ হাজার মানুষ আঁটে সেখানে একসঙ্গে। সূর্যদেব সবে উঠছেন পূবের আকাশ লাল করে। বহু মানুষ, নারী পুরুষ, তার মধ্যে সাধুসন্ত যেমন আছেন, গৃহী এবং অন্য পেশারও নানা মানুষ আছেন, যেমন দোকানি, হালুইকর ইত্যাদি, মনে হল চারণের। ওই সকালে সূর্যোদয়ের আগেই ওই ঠাণ্ডা জলে কী করে চান করছেন তাঁরা কে জানে! গলার শালটাকে দিয়ে ভাল করে গলা এবং কান ঢেকে সে নদীর আরও কাছে এগিয়ে গেল এবং চাতালের পরের অগণ্য সিঁড়ি ভেঙে নেমে যেতেই যেন মনে হল ভীমগিরিকে দেখতে পেল। এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে পুবে চেয়ে আছেন জোড়-করে দাঁড়িয়ে।

আরও এগিয়ে যেতেই সঠিক ভাবে চিনতে পারল তাঁকে। ভীমগিরিও চিনতে পারলেন চারণকে। তবে কথা বললেন না কোনও। উনি সূর্যমন্ত্র স্তব করতে লাগলেন।

"নমো মিত্রায় ভাবনবে মৃতোর্মা পাহি
প্রাজিষ্ণবে বিশ্বহেতবে নমঃ।
সূর্যাদ্ভবন্তি ভূতানি সূর্যেনপালিতানি তু
সূর্যে লগং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্যঃ সোহহমেব চ।
চক্ষুর্ণো দেবঃ সবিতা চক্ষুর্ণ উত পর্বতঃ।
চক্ষুর্ধাতা দধাতু নঃ।"

স্তব করেই চলতে লাগলেন ভীমগিরি মহারাজ।

চারণের মনে পড়ে গেল দাদু, মানে ওর মায়ের বাবা এই স্তব করতেন রোজ সূর্যোদয়ের সময়ে। উত্তরপাড়ার মামাবাড়িতে যখনই যেত চারণ ছেলেবেলাতে তখনই দাদু তাঁকে অন্ধকার থাকতে বিছানা ছাড়িয়ে গঙ্গাস্নানে নিয়ে যেতেন। ওই স্তব উনি শিখিয়েও ছিলেন চারণকে। চারণ যখন ক্লাস এইট-এ পড়ে তখন দাদু সজ্ঞানে মারা যান। কে জানে! মৃত্যুর সময়ে তাঁর মুখেও কোনও ভয়ের চিহ্ন ছিল কি না? না কি, সব সময়ে যে গভীর প্রশান্তি তাঁর মুখমণ্ডলে শোভা পেত সেই প্রশান্তি নিয়েই চলে গেছিলেন তিনি যাবার সময়ে?

মৃত্যুর সময়ে যে ভয় ফুটে ওঠে অনেক মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে এই কথাটা তো সন্নিসী ভীমগিরির মুখে না শুনলে তার এমন করে খেয়ালও হত না।

ভীমগিরি দ্বিতীয় শ্লোক শেষ করে তৃতীয় শ্লোকে পৌঁছে গেছিলেন ততক্ষণে। ওই খরস্রোতা জলে ভেসে যাবারই কথা ছিল কিন্তু হালকা-পলকা ভীমগিরি কী করে যে দাঁড়িয়ে ছিলেন কে জানে! তারও বোধহয় কোনও ঐশ্বরিক-ক্রিয়াকাণ্ড থাকবে। চারণ হলে তো নামা মাত্রই ভেসে যেত।

সূর্যমন্ত্রর মানে, তার দাদুই তাকে শিখিয়েছিলেন। এখন একেবারেই ভুলে গেছে। স্তব তো মনে নেই-ই। অথচ ভীমগিরি আবৃত্তি করাতে স্তবের মানে তো অবশ্যই, মন্ত্রও যেন মনে ফিরে এল।

দাদু তাঁর সুললিত ভরাট গলাতে আবৃত্তি করতেন। নৌকো বেয়ে যেত মাঝনদী দিয়ে মাঝিরা। লাল টকটকে থালার মতন সূর্যটা উঠত পুবাকাশে। শিশুকালের সেই স্মৃতির সঙ্গে চারণের সমস্ত ছেলেবেলাটাই যেন উঠে এল। উত্তরপাড়ার মামাবাড়িতে স্কুলের ছুটির সময়ে কাটানো দিনগুলি, দিদিমা, মেজমামীমা, ছোটমামীমা, মামাতো ভাইবোনেরা সবাই...। মস্ত মস্ত নিমগাছ আর বেলগাছ দুটোর কথাও, গঙ্গার ধারের বাগানে।

মামাবাড়ির দ্বারোয়ান রামখেলাওন পাঁড়ে বলত, জানো খোকাবাবু, ওই গাছে ভূত আসসে। শিংওয়ালা ভূত। সন্ধের পরে তাই বেলগাছের দিকে আদৌ যেত না ও। পরে জেনেছিল যে, সন্ধের পরে ওই বেলগাছতলাতেই খাটিয়া পেতে ভাঙ সেবন করত রামখেলাওন, তাই ওই ভূতের পত্তন!

মনে পড়ে গেল চারণের সূর্যমন্ত্রের মানে: "মিত্রকে নমস্কার, ভানুকে নমস্কার; তুমি আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর মার্কন্ড।

www.MurchOna.com

প্রকাশশীল বিশ্বের কারণকে নমস্কার। জীবগণ সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়, সূর্যের দ্বারা পালিত হয়, আবার সূর্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

যিনি সূর্য, তিনিই আমি।

সবিতা তেজস্বরূপ বলেই তিনি আমাদের চোখ। তিনি কালস্বরূপ বলেও আমাদের চোখ।

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের চোখ দান করুন।"

দাদু ঠিক এই ভাষাতেই বলতেন কিনা মনে নেই কিন্তু মানেটা প্রথম দুটি স্তবের মোটামুটি ওইরকমই ছিল। সন্নিসী ভীমগিরি প্রথম দুটি স্তব উচ্চারণ করতেই চারণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘাটের চাতালে এসে দাঁড়াল। এত মানুষ খালি গায়ে এবং মেয়েরা ভেজা শাড়ি জড়িয়ে চান করছেন তাই নিজে শাল চড়িয়ে জুতো পায়ে তাঁদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি লাগছিল। অসভ্যতার চরম হচ্ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো অন্য শ্লোকগুলি এবং মানেও মনে পড়ে যেত।

চারণ ভাবছিল, সংস্কৃত ভাষাটা, যে-ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের যাবতীয় ধর্ম-কর্ম-বিয়ে এবং শ্রাদ্ধ জড়িত, সে ভাষাটাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কেমন নষ্ট হয়ে গেল। এক জগাখিচুড়ি সরকারি হিন্দি এবং তারও পরে আরও জগাখিচুড়ি বলিউড এর হিন্দি এসে সব কিছুকেই গ্রাস করে ফেলল। টোল উঠে গেল, উঠে গেল চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত-চর্চাও উঠে গেল। শিকড়হীন হয়ে গেল একটি জাতি, একটি ধর্ম। অথচ একজনও তার প্রতিবাদ করল না। আশ্চর্য।

ভীমগিরি জল থেকে উঠে এসে বলল আপনি চা খান তো?

খাই।

ভিজে কাপড়ে ওই কনকনে হাওয়াতে সন্ন্যাসীকে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চারণের শাল গায়ে দিয়েও যেন শীত করতে লাগল।

তবে, চলুন, চা খাই গিয়ে।

ধুতিটা ছাড়বেন না? মানে, বদলাবেন না?

আর ধুতি থাকলে তবেই না বদলাব? শুকিয়ে যাবে রোদ উঠলেই। রোদ তো উঠেই গেছে। বাহুল্যই আসক্তির জন্ম দেয়। দুটো ধুতি থাকলেই চারটের ইচ্ছে জন্মায়।

একই ধুতি পরে থাকলে নোংরা হয়ে গন্ধ হয়ে যাবে যে!

কাল সন্ধের সময়ে তো আমার পাশে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। কোনও দুর্গন্ধ কি পেয়েছিলেন?

না। বরং মিষ্টি মিষ্টি কী এক গন্ধ পেয়েছিলাম। অগুরু-টগুরু মাখেন না কি?

আমি কিছুই মাখি না। যিনি দেহ দিয়েছেন তিনিই নিজে হাতে মাখিয়ে দেন। অদৃশ্য হাতে।

চারণ জোরে বলে উঠল, বাজে কথা।

ভীমগিরিও জোরে হেসে উঠলেন।

বললেন, আমিও জানি বাজে কথা। কিন্তু বাজে কথাও জোরের সঙ্গে বলতে পারলে কেমন সত্যি কথা বলে মনে হয়। হয় না?

চারণ বলল, চায়ের পয়সা আমি দেব কিন্তু।

দেবেন। আপনারটা আপনি দেবেন। আমাকে দোকানি সকালের এক ভাঁড় চা বিনি পয়সাতেই খাওয়ায়। আমি খেয়ে, গুরুর জন্যে নিয়ে যাব। তাঁরটারও পয়সা নেয় না।

কেন?

গুরুর কাছে কত ভক্ত আসে। দিশি বিদেশি। তারা কত কিছু খায় এই সব দোকান থেকে কিনে। জানি না, সে জন্যেও দিতে পারে আবার ভালবেসে বা ভক্তিতেও দিতে পারে। কেউ কোনও ভাল কাজ করলে, বা কোনও দান দিলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাল কাজের বা দানের পেছনের উদ্দেশ্য খুঁজতে যাওয়াটা সংসারীদের ধর্ম। আমরা যা পাচ্ছি, তাতেই খুশি। ভগবানের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। দানকে দানের মহিমামণ্ডিত করেই আমরা দেখি। দাতা কেন দান করলেন সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে বসে নিজেদের মনকে আমরা আবিল করি না। মন যদি আবিল হয়, তবে ঈশ্বর-চিন্তা করব কী করে!

www.MurchOna.com

চারণ ছেলেমানুষের মতন বলল, জানেন, কাল রাতে আমি উপোস ছিলাম।

ভীমগিরি হালুইকরের দোকানের সামনে চায়ের অপেক্ষাতে দাঁড়িয়ে হো হো করে জোরে হেসে উঠলেন।

চারণের খুব ভাল লাগল হাসিটা। এর আগেও লেগেছিল। একেই বোধহয় বলে প্রাণখোলা হাসি। এমন হাসি আজকাল শোনা যায় না বেশি।

হাসি থামলে ভীমগিরি বললেন, তাহলে তো হাফ-সন্ন্যাসী হয়েই গেছেন।

চারণ লজ্জা পেল।

বলল, আমি তো সন্ন্যাসী হতে আসিনি এখানে।

কী করতে এসেছেন তা আমি জানি। আমার গুরুও জানেন।

গুরু ? গুরু কি করে জানলেন ?

তা তো বলতে পারব না। কাল রাতে আমি যখন কালিকমলি বাবার আশ্রম থেকে খেয়েদেয়ে নেমে এলাম চাতালে, গুরু আপনার কথা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে জিগ্যেস করলেন আমাকে।

চারণ আরও অবাক হল।

বলল, আমার কথা ? কেন ?

কেন, তা কী করে বলব ! কত মানুষই তো রোজই এখানে আসেন সারা দেশ থেকে, বিদেশ থেকে, আমার সঙ্গে, এখানের অগণ্য সব সন্নিসীদের সঙ্গে কথা বলেন, চাতালে দিনের পর দিন বসে থাকেন, মোটা টাকা খরচ করে ভোগ দেন, কাঙালি ভোজন করান, কম্বল বিতরণ করেন, কত ভারী ভারী শেঠ, দিল্লি বম্বে কলকাতার ! কই, গুরু তো তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জিগ্যেস করেন না ?

চারণ বলেন, গুরু কি জিগ্যেস করলেন ?

তা নাই বা শুনলেন। নিজেকে একটু কম ভালবাসাই ভাল। নিজের সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য যত কমবে, আর পরের সম্পর্কে বাড়বে, ততই আমাদের চোখে পৃথিবী সুন্দরতর হবে।

চারণ লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

কাল রাতের আলো-আঁধারিতে লক্ষ করেনি, আজ সকালের আলোতে দেখল ভীমগিরি মানুষটি অবয়বে অতি সাধারণ, কৃশ, গড়পড়তা ভারতীয়র মতন হলেও তাঁর চোখ দুটি অসাধারণ। একবার করবেট পার্কে একেবারে কাছ থেকে বাঘ দেখেছিল চারণ। বাঘের চোখের মতনই চোখ ভীমগিরির। অথচ ভয় করে না তাকালে। শুধু মনে হয় যে, বুকের ভিতরের সব কিছু অব্যক্ত গোপন কথা বুঝি জেনে নিলেন, কোনও আড়ালই বুঝি আর রইল না।

ভীমগিরি বললেন, গুরু বললেন, আপনার আধার ভাল।

আধার মানে ?

আধার মানে জানেন না ?

নাঃ।

তবে জানবেন। সময়ে জানবেন।

ও মনে মনে বলল, "আমার আঁধার ভাল"।

চারণ, পোড়া মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভরা ভাঁড়ে গরম ধোঁয়া-ওঠা বেশি দুধ আর বেশি চিনি দেওয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবল, ওরা গুরু-শিষ্যে মিলে বোধহয় তাকে ফাঁসাবার মতলবে আছে। বাঁ হাতের কব্জিতে বাঁধা রোলেক্স ঘড়িটা বোধহয় চিনতে পেরেছে সাতঘাটের জল-খাওয়া গুরু। 'পার্টি' যে 'মালদার' তা বুঝেই সম্ভবত এই হরকৎ।

সন্ন্যাসী চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন, যা ভাবছেন, তা নয় চারণবাবু।

চমকে উঠল চারণ। একটু চা চলকে গেল, পড়ল পায়ের কাছে। বলল, কী ভাবছি ?

যা ভাবছেন।

আমার গুরু, আপনার আধারকে যতখানি ভাল বলে মনে করেছেন, ততখানি ভাল বোধহয় নয় এ আধার।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

চা খাওয়া শেষ করেই ভীমগিরি বললেন, চলি। পরে দেখা হবে।

কোথায় চললেন ?

তার গলার স্বরে এমন ভাব ফুটে উঠল যে, চারণের নিজের কানেই তা শোনাল অসহায়তার মতন। যেন, এই ভীমগিরি সন্নিসীর ভরসাতেই ও হৃষীকেশে এসেছিল !

নিজেকে বকল, মনে মনে।

তা জেনে কি লাভ ? সন্ন্যাসীরা কোথা থেকে আসেন আর কোথায় যান তা জানতে চাইতে নেই। যদি পারেন এবং মন করে, তবে সন্ধেবেলাতে আসবেন। থাকব আমি ঘাটে।

চারণের সকালটা যেন হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেল। রোদটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একদিনের মধ্যেই এই ভীমগিরি সন্ন্যাসীর উপরে যেন ও বড় বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

খারাপ। খুবই খারাপ।

বকল আবারও নিজেকে।

ভীমগিরি বললেন, কেউ কারও নয় এ সংসারে চারণবাবু। আমিও আপনার নই, আপনিও আমার নন। যান না কুঞ্জাপুরী থেকে ঘুরে আসুন।

কুঞ্জাপুরী ! সেটা কোথায় ?

গাড়োয়ালের রাজধানী ছিল নরেন্দ্রনগরে। সেই নরেন্দ্রনগর হয়ে যেতে হয়। বাসে গেলে কুঞ্জাপুরীর পায়ের কাছে নেমে, হেঁটে উঠতে পারেন উঁচু পাহাড়ে। তবে অনেক চড়াই। তারপর আবার মন্দিরে উঠতে প্রায় তিনশ সিঁড়ি চড়তে হবে।

প্রায় তিনশ ? বলেন কি ?

হ্যাঁ। কষ্ট না করলে কি সুন্দরের দেখা মেলে ? যা কিছুই সুন্দর ? তবে আপনার পক্ষে গাড়িতে যাওয়াই সুবিধের হবে। খুব ভাল লাগবে। খুব কম মানুষই জানেন কুঞ্জাপুরীর কথা অথবা যান কুঞ্জাপুরীতে। হয়তো কষ্টের জন্যেই যান না। একেবারে ভিড় নেই। মন প্রসন্ন হয়ে যাবে। যান, ঘুরে আসুন।

বলেই সন্ন্যাসী তাঁর গুরুর জন্যে এক ভাঁড় চা নিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ বোবার মতন দাঁড়িয়ে থেকে চারণ হৃষীকেশের বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চলল।

দোকানপাট এখনও খোলেনি সব। শুধু হালুইকরের দোকান আর ফুল ধূপকাঠির দোকানগুলি খুলেছে।

বড় রাস্তায় পড়ে চারণ ঠিক করল যে আজ কুঞ্জাপুরী না কোন জায়গার কথা বললেন ভীমগিরি, সেখানে যাবে না। তা ছাড়া, মন্দির-টন্দিরে তার কোনও ইন্টারেস্টও নেই। দেখা যাবে পরে। তা ছাড়া, গাড়িতে যেতে হলেও হোটেলে ফিরে গিয়ে কোনও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গাড়ি ভাড়া করতে হবে। নইলে গলা কাটবে। হিন্দুদের সব ধর্মস্থানেই নির্লোভ সাধুসন্ত যেমন থাকেন, 'ভেক' ধরা সাধুও থাকেন অনেক। আর থাকে তীর্থযাত্রীদের, পুণ্য-প্রত্যাশীদের গলা কাটার জন্যে ছুরি-শানিয়ে বসে-থাকা বিভিন্ন ধরনের বানিয়ারাও। আনজান-গাড়ি ভাড়া করলে তারা এখানকার সব ব্যাপার সম্বন্ধেই-অজ্ঞ চারণের গলা কাটবেই। ও যখন পুণ্য-প্রত্যাশী নয়, তখন ভাড়াটাই বা কিসের।

বড় রাস্তাতে পড়ে ভাবল, যে পথ দিয়ে কাতারে কাতারে বাস ও গাড়ি চলেছে কেদারনাথ বদ্রীনাথের পথে সেই পথে কিছুটা হেঁটে এগোয়। জায়গাটাকে পায়ে হেঁটে ঘুরেফিরে না দেখলে হবে না। পায়ে হেঁটে ঘোরাটা খুবই জরুরি যে-কোনও জায়গাতেই। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে, যাকে বলে, "To have a feel of the place" তা কখনওই হয় না।

এক কিমি মতো এগিয়েই লক্ষ করল বাঁদিকে একটা সরু পথ বেরিয়ে গেছে এবং সেই পথের মোড়ে বেশ বড় একটা জটলা। তাতে সন্ন্যাসীর পোশাকে অনেকে আছেন আবার সাধারণ পোশাকেও অনেকে। কিন্তু একজনও মহিলা দেখল না সেই জটলাতে। সমবেত জনমণ্ডলীর কারও মুখে কোনও কথাও নেই কিন্তু সকলেই বাঁদিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

www.MurchOna.com

হাঁটতে হাঁটতে সেখানে পৌঁছে চারণও দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, বাঁদিকের গলির মোড়ে একটি পাঁচিলঘেরা বাড়ি। দেওয়ালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডারি দপ্তরের বোর্ড টাঙানো। দপ্তরটা একতলা। তার সামনে অনেকখানি খোলা চত্বর। সেটি দেখা যাচ্ছে, মস্ত বড় এবং গরাদওয়ালা লোহার ফটকের মধ্যে দিয়ে। সেই চত্বরের মধ্যে একটি জবরদস্ত ষাঁড়কে দিয়ে গরুদের রমণ করানো হচ্ছে এবং এই ধর্মস্থানের বিভিন্ন বয়সী অগণ্য পুরুষ সাতসকালে পরম আগ্রহ নিয়ে আগাপাশতলা আহ্লাদের সঙ্গে সেই প্রক্রিয়া দেখছেন। সমবেত পুরুষদের প্রত্যেকেরই চোখ-মুখেই যেরকম গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠেছে, বারংবার-রমিত গরুটির চোখেও বোধহয় ততখানি তৃপ্তি ফুটে ওঠেনি।

হাসি পেল চারণের।

মীর বলেছিলেন, "এখানে মানুষের চেহারার জীব অনেকই আছে, কিন্তু মানুষ অত্যন্ত কম।" "হিঁয়া সুরত্-এ আদম বহুত হ্যায়, আদম্ নেহি হ্যায়।"

চারণের মনে হল, মানুষের মতন চেহারার মধ্যে জানোয়ারের সংখ্যা খুবই বেশি। মানুষের মনুষ্যত্বে পৌঁছনোর পথে জানোয়ার পথ আগলে আছে। এবং হয়তো থাকবে আরও বহুকাল।

ব্যাপারটা হাসিরই।

বৈরাগ্যর জায়গাতে এত অতৃপ্তি, এত খিদে? ষাঁড়ের রমণসুখেই এত আনন্দ! এ যেন ভক্তিরসেও হবার নয়। ভোগের নিবৃত্তি না হলে যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না এ কথা বহু মানুষের কাছে শুনেছে ও পড়েছে চারণ। হওয়া যে যায় না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেল এইমাত্র। উত্তরপ্রদেশ সরকারকেও বাহাদুরি দিতে হয়। লোহার গেটটা তো চট বা কোনও ধরনের চাটাই বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকেও দেওয়া যেত! পুরো জায়গাটাই দেওয়াল তোলা কিন্তু প্রকাণ্ড ফটকেই কোনও আড়াল নেই।

বহুদিন হল হাঁটাচলার অভ্যেস চলে গেছে। তাও পায়ে আবার কাবলি জুতো। কষ্ট হচ্ছে চলতে। আরও অনেকটা গিয়ে যেখানে পথটা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে সেখানে একটি ছোট্ট চায়ের দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চে ও বসে পড়ল।

নিজে একেবারে স্থির এবং গতিরহিত হয়ে সামনে দিয়ে চলমান, বহমান জনস্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে ভারী ভাল লাগে। Introspection এর জন্য যে নির্জনেই যেতে হবে এমন মানে নেই। প্রচণ্ড কলরোলের মধ্যে, অগণ্য মানুষের মধ্যে থেকেও নিজের অন্তরে নির্জনতা নিয়ে আসাও সম্ভবত ভগীরথের গঙ্গা আনার মতনই কঠিন কাজ। চারণ পারে না তা করতে কিন্তু শিশুকাল থেকেই চেষ্টা করে। এই চেষ্টা করার মধ্যে দিয়েও বুঝতে পারে, পারত সব সময়েই যে, আর দশ জন মানুষের সঙ্গে তার তফাত আছে।

ভাবছিল ও, তেমনটিই তো হবার কথা ছিল। শরীরে এবং মননে সব জন্তুই একরকম। শুধু মানুষই আলাদা। প্রত্যেক মানুষই। এইটেই তো একমাত্র অহংকার হওয়া উচিত প্রত্যেক মানুষেরই। তার স্বাতন্ত্র্যর অহংকার।

দোকানঘর ঠিক নয়। একটি খুপরি মতন। কেটলিতে দুধ সেদ্ধ হচ্ছে। বয়ামে কিছু সস্তা বিস্কিট ও সন্দেশ। বিড়ি, সিগারেট, দেশলাই। এক গাড়োয়ালি বুড়ো দোকানি। মূল পথ থেকে দোকানটির সামনে দিয়ে ডানদিকে, একটি কাঁচা পথ চলে গেছে নদীর দিকে। বাঁদিক থেকে একটা চওড়া জলহীন নদী এসে মিশেছে গঙ্গাতে। কিছুক্ষণ পর পরই যাত্রীবোঝাই এক-একটি বাস ডানদিকে চলে যাচ্ছে এ পথ বেয়ে নদীর দিকে। এখানে ঘাট নেই কিন্তু নদীর গভীরতা কম। আর বিস্তৃতি বেশি। পুরুষ ও মহিলা যাত্রীরা বাস থেকে নেমে চান সেরে নিচ্ছেন। বাসের পাশেই Instant ঘাট। অধিকাংশ বাসই দেখল, বাঙালিতে বোঝাই। বাঙালিকে "ঘরকুনো" যাঁরা বলেন তাঁরা কোনও খোঁজই রাখেন না।

কোনও কোনও বাস কোনও ভ্রমণ সংস্থার। কোনও বাস বা উত্তরপাড়া, বালি, শ্রীরামপুর, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান ইত্যাদি জায়গার কোনও ক্লাবের যাত্রীদের নিয়ে এসেছে। কোনও বাসে

www.MurchOna.com

বা একটি বৃহৎ পরিবারের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। যৌথ পরিবারের চলমান বিজ্ঞাপন। বাসের গায়ে রঙিন সিল্কের ব্যানারে ক্লাবের নাম লেখা। অধিকাংশই যাচ্ছে কেদার-বদ্রী।

ইংরেজিতে যাকে বলে Cooling off one's heels তাই করছিল চারণ, বেঞ্চে বসে বসে দোকানির সঙ্গে গল্প করতে করতে।

তার কাছ থেকে এক প্যাকেট বিড়ি দেশলাই কিনে নিতেই সে দোকানির খদ্দের হয়ে গেল। সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সে আর অনাহুত রইল না। তারপর চা-ও চাইল এক কাপ। দেশলাই জ্বেলে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

কথায় বলে, "নাই কাজ তো খই ভাজ", চারণ বলল নিজেকে, নাই কাজ তো বিড়ি ফোঁক। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ভীমগিরির কথা মনে হল ওর। চার বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে নিল সন্ন্যাসীর জন্য।

সেই দোকানে বসে বেশ অনেকক্ষণ সময় কেটে গেল। চারণ লক্ষ্য করল যে অটোগুলোকে এই সমতলের শেষ অবধিই আসতে দেওয়া হয়, পাহাড়ে চড়তে দেওয়া হয় না।

এই হৃষীকেশে, হয়তো এই সমুদয় অঞ্চলেই যেখানেই সমতল, সেখানেই এই অটোরাই অশান্তির বাহন। যেমন এদের বিকট আওয়াজ, তেমনই কালো ধোঁয়ার ছিরি! সমস্ত পরিবেশ এরা সব চেয়ে বেশি দূষিতও করে। অবশ্য পেট্রলের ধোঁয়াই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। কিন্তু যেহেতু চোখে দেখা যায় না সেই হেতু তারা কারওই তাৎক্ষণিক বিরক্তি উৎপাদন করে না।

দোকান ছেড়ে এসে চলতে লাগল ওই পথ ধরে উপরের দিকে। ডানদিকে অনেক পেছনে পড়ে রইল গঙ্গার উপরে লছমনঝুলা এবং রামঝুলা। পথের এই জায়গাটুকুতে পায়ে চলাও খুব বিপজ্জনক। কারণ, রাস্তা খুবই সরু এবং দুপাশ দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে নানারকম যানবাহন যাতায়াত করে। যে-কোনও মুহূর্তেই গাড়ি-চাপা পড়া এখানে মোটেই আশ্চর্য নয়।

তবে, সেই সরু পথ, বেশি দূর অবধি সরু নয়। আরও বেশ কিছুটা ওঠার পরেই রাস্তা ধীরে ধীরে চওড়া হয়ে এল এবং বাঁদিকে একটি পথ বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গিয়ে দেরাদুনের রাস্তাতে গিয়ে মিশেছে। এখানের পথের ম্যাপে দেখেছিল চারণ যে, দেরাদুনের পথে "দইঅলা" নামে একটি জায়গা পড়ে। পথটি ভারী সুন্দর। সে পথেও অনেক আশ্রম আছে এবং দু-একটি হোটেলও আছে।

চলতে চলতে আধ ঘণ্টার মধ্যে চারণ যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে গেল। বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের গা, তার উপরে বাড়িঘর, ফুলের বাগান, টেরাসিং-করা ক্ষেত, তাতে ফসল লেগেছে। আর ডানদিকে খাদ নেমে গেছে খাড়া। সেই খাদ দিয়ে তীব্র বেগে উপলখণ্ড ঘূর্ণন-চূর্ণন করে জলকণা উৎসারিত করে গঙ্গা বয়ে চলেছে হৃষীকেশ-হরিদ্বার হয়ে। আরও অনেক নীচে নেমে গেলে চুনার, বিন্ধ্যাচল, একপাশে এলাহাবাদ অন্য পাশে কাশী তারও পর অনেক জনপদ পেরিয়ে সেই ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের সঙ্গে। মোহানাতে। অবশ্য তারও আগে পথে তার সঙ্গে আরও অনেকই নদীর ভাব হয়েছে, মিলন হয়েছে, ঝগড়া হয়েছে।

যে-কোনও নদী যখন সমুদ্রে পড়ে, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তার অস্তিত্ব বুঝি লীন হয়ে গেল। নদীর সাগরে লীন হওয়ার প্রসঙ্গে চারণের রবীন্দ্রনাথের কিছু কথা মনে পড়ে গেল। 'নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে। তাই থেমে, তার কোনও ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল একদিক দিয়ে থামা, অন্যদিক থেকে থামা নয়। মানুষের জীবনের মধ্যেও এইরকম অনেক থামা আছে। ...কোনও একটা জায়গায় যে পূর্ণতা আছে, এ কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই একমাত্র গৌরবের জিনিস বলে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

জীবনকে যারা এইরকম কৃপণের মতন দেখে, তারা কোথাও কোনও মতেই থামতে চায় না, তারা কেবলই বলে, চলো চলো চলো। থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও গভীর হয়ে ওঠে না; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না। ...

আমাদের দেশ অবসানকে স্বীকার করে, এই জন্য তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এই

www.MurchOna.com

জন্য ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়। কেন না সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি না। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়। সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।'

নিজেই অবাক হয়ে গেল চারণ এতখানি গদ্য নির্ভুল ভাবে মনে রেখেছে বলে!

সত্যি। কত বছর পরে। যেন কমপুটারের চাবি টিপল আর শব্দমঞ্জরী ফুটে উঠল চোখের সামনে। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের মতন।

ভাবছিল। দাদু আরও কিছু দিন বেঁচে থাকলে আরও কত কী জানতে পারত, শিখতে পারত তাঁর কাছ থেকে! একদিকে যেমন সূর্যস্তব শেখাতেন অন্যদিকে তেমনই শেখাতেন আরও কত কিছু। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালা তাঁর মাথার কাছে থাকত, গীতা এবং বাইবেল-এর সঙ্গে। মাঝে মাঝেই দাদু বলতেন : রবীন্দ্রনাথ ভাল করে না পড়লে, তোর বাঙালিয়ানা এবং হয়তো ভারতীয়ত্বও সম্পূর্ণতা পাবে না। বুঝেছিস। ভাল করে পড়বি।

কিন্তু তেমন করে পড়া আর হল কোথায়!

ইতিমধ্যেই ও বেশ হাঁফিয়ে পড়েছিল। খাড়া চড়াই। পথের পাশে ডানদিকে একটি বড় গাছতলার নীচের মস্ত পাথরের উপরে বসে সে নদীর দিকে চেয়ে রইল। যেন সেই প্রথমবার বুঝতে পারল ও, কেন সারা ভারতের অগণ্য মননশীল মানুষ, মুক্তিকামী মানুষ, নির্জনতাপ্রিয় মানুষ এই সব অঞ্চলে এসে থিতু হয়ে যান। পুরো জীবন কাটান। এত শান্তি, এত নিস্তব্ধতা, প্রকৃতির এমন ভয়াবহ অথচ গভীর সৌন্দর্যময় রূপ, Introspection এর এইরকম স্থান হয়তো সত্যিই কম আছে।

আজ সকালের সুন্দর হু-হু করা ঠাণ্ডা নিষ্কলুষ হাওয়ায় দাঁড়িয়ে দুনাকে জোরে প্রশ্বাস নিয়ে চারণের মনে হল যেন কলকাতা শহরবাসী তার, বুকের সমস্ত কলুষই শুধু নয়, তার মনেও যে সব অদৃশ্য সব কলুষ ছিল, সে সব কলুষও যেন দূরীভূত হয়ে তার সমস্ত শরীর মনকে পুণ্য করল।

চারণ অনেকক্ষণ সেই পাথরে বসে নীচে গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদী, ওপারের খাড়া পাহাড়ের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। ও পাশের পর্বতের গায়ে বিশেষ গাছপালা দেখল না। তবে একেবারে রুক্ষ নয়। সবুজাভা আছে। তৃণগুল্ম আছে বহুরকম। তবে বড় গাছ নেই বিশেষ। খাড়া নেমেছে পর্বত। কতখানি খাড়া তা নিজের চোখে না দেখলে উপলব্ধি করা অসম্ভব। পর্বতের পর পর্বত, গায়ে গায়ে লেগে মৌন উর্ধ্ববাহু সন্নিসীদের মতন দাঁড়িয়ে আছে কতকাল ধরে। ভাবলেও শিহরণ জাগে মনে।

এদিকে গাছপালা আছে ওদিকে কেন নেই ভেবে পেল না। অবশ্য খাদ এমনই খাড়া নেমেছে যে, গাছপালারও পা রাখার জায়গা নেই। নদীর দিকে চেয়ে ছিল চারণ, হু-হু হাওয়ার মধ্যে বসে, এমন সময়ে অল্পবয়সী একটি স্থানীয় ছেলে উপর থেকে নেমে এল নিজের মনে গান গাইতে গাইতে। তার বাঁ হাতে একটা দড়ি। দড়ির অপর প্রান্ত একটা ধবধবে সাদা ছাগলের গলাতে বাঁধা। আর ডান হাতে একটা হ্যাজাক। ছেলেটি চারণকে সেখানে কবির মতন বসে থাকতে দেখে হেসে বলল, কী বাবু, আত্মহত্যা করবে না কি?

সেই আচমকা-করা উদ্ভট প্রশ্নে চমকে উঠল ও। তারপরই হেসে ফেলে বলল, কেন? আমাদের কলকাতাতে কি বহুতল বাড়ি কম আছে? নাকি সেখানে গঙ্গা নেই? আত্মহত্যা করতে সেখান থেকে এত পয়সা খরচ করে কেউ কি হৃষীকেশে আসে?

তা জানি না। তবে যদি কখনও আত্মহত্যা করতে মন চায় তো আমাকে বোলো, এর চেয়ে আরও ভাল জায়গাতে নিয়ে যাব। আরও উঁচু জায়গাতে। দেবপ্রয়াগে গেছ?

না।

তারপর হেসে বলল, সুক্রিয়াৎ।

তারপর বলল, তুমি তো বেশ রসিক দেখছি। তোমার নাম কি?

বুদ্ধু সিং।

www.MurchOna.com

তোমার মা-বাবার কি আক্কেল বলে কিছুই নেই ? এমন বুদ্ধিমানের নাম বুদ্ধু ?

বুদ্ধু সিং হেসে বলল, তোমার চেয়ে তাঁদের আক্কেল বেশিই আছে। আমার দাদার নাম রেখেছিল মা-বাবা বুদ্ধিরাম। সে ফৌজ-এ নাম লেখাবার বাহানা করে দেরাদুনে গিয়ে একটা মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে মাটন-রোল-এর দোকান দিয়ে মোটা কামাচ্ছে। মোটরবাইক কিনেছে। আর বুড়ো মা-বাবা ক্ষেতি করে মরছে। এ দুনিয়াতে বুদ্ধি যারই আছে সেই নিজের ফায়দা ওঠাতে সেই বুদ্ধিকে কাজে লাগায়। তাই মা-বাবা বলেন, বুদ্ধিরাম আমাদের হাঁদা বানিয়েছে, আমাদের বুদ্ধুই ভাল।

তুমি চললে কোথায় ?

কোথায় আবার ? হৃষীকেশে।

বুদ্ধু সিং বলল।

কেন ?

আলোটা খারাপ হয়ে গেছে। মেরামত করতে হবে। আর বকরীটার গতি করতে হবে।

কি গতি ?

সদগতি।

এখানে তো কেউ মাংস খায় না।

চারণ বলল।

বুদ্ধু সিং বলল, তোমরা বুঝি ছাগলের মাংস খাও ? নাম আমার বুদ্ধু আর তোমার কাম বুদ্ধু।

তারপর বলল, দেখছ না, ওর পেট ফুলেছে। বিয়োবে ও। আমার মাসী ওকে চেয়েছে, মানে, ওর বাচ্চাদের। তাই বাচ্চাদের অগলা-পত্তা যেখানে হবে, সেখানেই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বাচ্চাগুলো একটু বড় হলে ওকে আবার নিয়ে আসব ফেরত।

ছেলেটাকে ভারী ভাল লেগে গেল চারণের। বলল, থাকো কোথায় তুমি বুদ্ধু সিং ?

ওই তো।

বলেই, বুদ্ধু সিং ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যাজাক শুদ্ধু ডান হাতটা উপরের দিকে তুলে দেখাল।

চারণ দেখল, সত্যিই তো ! ওই খাড়া পাহাড়ের গায়ে গায়ে খাঁজ কেটে ক্ষেত, উঠোন, ঘর, সবই করা হয়েছে। ফুলকপি লাগানো হয়েছে। তার পাতা ছেড়েছে কচি কলাপাতা সবুজের মধ্যে একটু সাদাটে সাদাটে রং-এর। লাল আর হলুদ ঘাগরা পরে একজন বয়স্কা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোমরের উপরে দুহাত রেখে।

বুদ্ধু সিং বলল, ওই দেখো। আমার পেয়ারী।

তোমার পেয়ারী ?

জী বাবু। আমার মা। মা ছাড়া বুদ্ধু সিং-এর সঙ্গে আর কে পেয়ার করবে বল ? পেয়ার দুলহার যাই বল, সবই মা।

আর বাবা ?

সে পেছনের উঠোনে বসে হুঁকো খাচ্ছে বাঁ পায়ের উপরে ডান পা তুলে মাথাতে টুপি চড়িয়ে, খাটিয়াতে বসে। বাবা আমার বড় কুঁড়ে। সবই করে মা।

হবে না কেন ? বুদ্ধু সিং-এর মতো ভাল ছেলে যার আছে, সে কাজ করতে যাবে কোন দুঃখে।

বুদ্ধু সিং হাসল। এক মুখ। খুশি হল খুব।

চারণ ভাবল, কত সহজে খুশি হল বুদ্ধু সিং।

চারণ শিলাসন থেকে উঠে পড়ে তার সঙ্গে নীচে নেমে চলল কথা বলতে বলতে।

পথের দুপাশে ঘন একরকমের ঝোপ, তাতে বিভিন্ন-রঙা ফুল ফুটেছে। কমলা, নীলচে, বেগুনি, লাল, গাঢ় লাল, নীল এমনকি সাদাও।

চারণ জিজ্ঞেস করল, এই ফুলগুলোর নাম কি ?

বুদ্ধু সিং বলল, লালটায়েন।

www.MurchOna.com

চারণের মনে হল, এইগুলোই ল্যানটানা। যে সব ঝোপের বর্ণনা সে জিম করবেটের বিভিন্ন লেখায় পড়েছে। জিম করবেট তো এই গাড়োয়াল এবং কুমায়ুঁ হিমালয়েই তাঁর কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘ এবং চিতা শিকারের বিখ্যাত সব কাহিনী লিখে গেছেন।

ভাবছিল, এই পথেই তো যেতে হয় রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগের কুখ্যাত মানুষখেকো চিতাবাঘের কাহিনী চারণ স্কুলে থাকতেই পড়েছিল। এখনও পড়ে মাঝে মাঝে, রাতে ঘুম না এলে। সে কথা মনে হতেই আরও অনেক ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল এবং ওর খুব ভাল লাগল এ কথা ভেবে যে, সেই সব অঞ্চলেই সে পা রেখেছে। এ তো আর তীর্থযাত্রা নয়। সে কোনও মন্দিরে ঢোকেনি কোনও দিনও। ঢুকবেও না হয়তো। কিন্তু এই পথই তার তীর্থ। দেশের মানুষই তার কাছে মন্দিরের মতো। তাদের প্রত্যেকের কাছেই কত কি জানার আছে, শেখার আছে।

বুদ্ধু সিং যেন কেমন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উতরাই নামছিল বড় বড় পা ফেলে। তার সঙ্গে তাল রাখা দুষ্কর হচ্ছিল চারণের।

চারণ বলল, এমন করে হাঁটছ কেন ?

কেন ? উতরাই তো এমন করেই নামতে হয়। কথাতেই বলে, "চড়াইমে বুঢ়া ঔর উতরাইমে জওয়ান।"

কি বললে ?

চারণ উৎসুক গলাতে আবার জিগ্যেস করল।

বুদ্ধু সিং বলল, চড়াইমে বুঢ়া ঔর উতরাইমে জওয়ান।

বাঃ।

স্বগতোক্তি করল ও।

বুদ্ধু সিং-এর সঙ্গে গল্প করতে করতে চারণ নেমে এল সমতলে। যেখান থেকে সেই কাঁচা রাস্তাটা বাঁদিকে চলে গেছে নদী অবধি। এবং সেই অবধি গিয়েই তার পায়ে যথেষ্ট ব্যথা বোধ করতে লাগল। চড়াই উতরাই এবং প্রায় সাত-আট কিলোমিটার, হোটেল থেকে বেরোনোর পর হাঁটাহাঁটি হয়েছে কম করেও। রামঝুলা, লছমনঝুলা সব পেরিয়েই তো এসেছে। বুদ্ধু সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপেক্ষমাণ একটি অটোতে উঠে বসল হোটেলের দিকে যাবে বলে।

বুদ্ধু সিং বলল, ফিন মিলেঙ্গে।

কৈসে। আঃ হাঃ। কঁহা ?

আপ যঁহা বৈঠেতে পাথ্বল পর, হুঁয়া বৈঠকে বুদ্ধু সিং কো নাম লেকর পুকারিয়েগা, ম্যায় তুরন্ত উতারকে আয়েগা। খ্যয়ের, আপ রাজি হ্যায় তো আপকো হামারা ঘরমেভি লেতে যাউঙ্গা।

তুমি কি সকলের সঙ্গেই এমন ব্যবহার কর না কি ? সব তীর্থযাত্রীর সঙ্গেই ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

না, না, তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কখনওই করি না। তাঁদের সময় কোথায় দুদণ্ড বসবার ? দেখবার ? তাঁরা তো সাতদিনে সব তীর্থ শেষ করে কলকাতাতে ফিরে গিয়ে রিস্তেদারদের আর দোস্তদের বলেন গাড়োয়াল দেখে এলাম। আহা ! কী অপূর্ব। আপনি যে তীর্থযাত্রী নন, যদিও বাঙালি, তা আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম।

চারণ হেসে বলল, আসব বুদ্ধু সিং। আবার আসব দু-এক দিনের মধ্যে। কী নিয়ে আসব বল তোমার জন্যে ?

আমার জন্যে ?

হ্যাঁ।

পেয়ার, স্রিফ পেয়ার।

চারণ মনে মনে বলল, আমিও তীর্থযাত্রী বুদ্ধু সিং। তবে আমার গন্তব্য অন্য। যে তীর্থ সকলের বুকেরই মধ্যে থাকে অথচ যা বহু দূরে এবং অদৃশ্য এবং যেখানে পৌঁছনোর পথ খুবই দুর্গম।

অটোটা ছেড়ে দিল।

www.MurchOna.com

বুদ্ধু সিং আবার হ্যাজাক-ধরা ডান হাতটা তুলে হাত নাড়ল।

সকাল থেকে যে সব ঘটনা ঘটল বা যেখানে যেখানে গেল তার বিবরণটুকু দিতে হয়তো সময় বেশি লাগল না, কিন্তু যেতে যেতে দেখল যে তার ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে।

হোটেলে ফিরে একটু বিশ্রাম করল।

অনভ্যস্ত পা দুটো টনটন করছে। ঠিক করল, বিকেলে বেরিয়েই প্রথমে একটা নরম কেডস কিনতে হবে, আর একটা লাঠি। শিশুকাল থেকেই ও হেঁটে বেড়ানোর সময়ে হাতে একটা লাঠি রাখতে ভালবাসত। উত্তরপাড়ায় মামাবাড়িতে যাওয়ামাত্রই দাদু তাকে নিজে হাতে একটি লাঠি বানিয়ে দিতেন উচ্চতা অনুযায়ী। যখন পাঁচ বছরের শিশু, তখন সে লাঠির উচ্চতা একরকম ছিল, যখন সে তেরো বছরের কিশোর তখন তার উচ্চতা অন্যরকম। লাঠি হাতে হাঁটতে হাঁটতে চারণ যেন পৃথিবী শাসন করত মনে মনে। কত কী ভাবত, হাওয়ায় লাঠি দিয়ে আঘাত করত, বামে ডাইনে, পিছন পানে। আর তার মনের মধ্যে কত কিছু গড়ে উঠত। কত দুর্গ, কত প্রাসাদ, কত প্রাকার, কত গম্বুজ আবার পরক্ষণেই তার নিজেরই লাঠির ঘায়ে সে সব ছত্রখান হয়ে যেত।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে বড় বেশি পুরনো কথা মনে আসছে চারণের। ও কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে, ভাল করে গরম জলে স্নান করে রুম-সার্ভিসে খাবার অর্ডার করল।

এখানে এসে অবধি একটা জিনিস দেখছে যে, এখানে কোনও আমিষ খাবারের চল নেই। সকলেই নিরামিষ খায়। সব দোকানেই নিরামিষ, সব হোটেলেই নিরামিষ। তবে, এটাও ঠিক যে, শুনেছে যে হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশের পথপাশে ডানদিকে একটি দোকান আছে নাকি যার সামনে দুটি খোঁটার উপরে পেরেক দিয়ে সাঁটা টিনের ছোট্ট হোর্ডিং-এ লম্বকর্ণর ছবি আছে বাইরে। আর লেখা আছে 'মিট শপ'।

আর একটি দোকানও আছে এক সর্দারজীর। 'ফরেন লিকার শপ'।

তার মানে, হৃষীকেশে যাঁরা আসেন তাঁরা যে সকলেই নিরামিষাশী কিংবা পান-বিলাসী নন, এমন নয়। তেমন হলে হৃষীকেশে ঢোকার মুখে এসব দোকান থাকতই না।

চারণ তো নিরামিষাশী নয়, মদ্যপানও করে কখনও সখনও। কিন্তু এবারে ওর ওই হঠাৎ-করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়াটা, জীবিকার ওপরে বিতৃষ্ণায়, চারপাশের মানুষজনের ওপরে বিতৃষ্ণায়, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত সকলের ওপরে বিতৃষ্ণায় এবং নিজের জীবনের গন্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধা জন্মানোতেই হঠাৎই নোঙর তুলে চলে আসা। কোনও শিকড়ই রেখে আসেনি। অন্য কোথাওই যাবার সঙ্গে এ যাত্রা আদৌ তুলনীয় নয়। ও সত্যিই নিজেকে পুনরাবিষ্কার করতেই বেরিয়েছে এবারে এবং ওর মনের পরতে পরতে এতরকম তঞ্চকতা, এতরকম অকৃতজ্ঞতা, এতরকম আঘাত পুঞ্জীভূত হয়েছে মাড়িয়ে-আসা বছরগুলিতে যে, ও যদি এবারে আর তার দাঁড়ে ফিরে নাও যায়, তার অফিসের গুরুদায়িত্ব পূর্ণগ্রহণ না করে, তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার শত আরাম-সুবিধা থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় সত্যিই বিযুক্ত করে, তা হলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

লাগছে কিন্তু চমৎকার। এই দুদিনেই। হৃষীকেশ, এই ত্রিবেণীঘাট, এই নদী, এই নগাধিরাজ হিমালয়, এই সব সাধু-সন্নিসী, বুদ্ধু সিং-এর মতন এমন সব আশ্চর্য সরল মানুষ। তাও তো মাত্র একজন সন্ন্যাসীকেই এ পর্যন্ত দেখেছে। এরা সবাই চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই তার জীবনে ইতিমধ্যেই যেন এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে।

গতকাল থেকে, যখনই খাওয়ার সময় হচ্ছে এবং কিছু খাচ্ছে, তখনই ভীমগিরির সেই কথাটি তাকে বড়ই ভাবাচ্ছে। "বেশি খেলে, মাথা মোটা হয়।"

বেশি খেল না আজকে। ভাত, ডাল, মটর ডাল দিয়ে ভাল করে মেখে, স্যালাড, মুলো, পেঁয়াজ, শশা, কাঁচালঙ্কা আর একটু ছোলার তরকারি, যাকে অবাঙালিরা চানা বলেন, আর একটু টক দই।

খেয়ে উঠে বিছানাতে গা এলিয়ে দিল। সেই স্কুল-কলেজ জীবনের মতন। আঃ কী আরাম! পায়ে ব্যথা বলেই যেন আরামটা আরও বেশি লাগছিল।

www.MurchOna.com

দেখতে দেখতে প্রায় সপ্তাহখানেক কেটে গেল। মনে হচ্ছে, মন বসে গেছে এই হৃষীকেশে।

এক বিকেলে, চা খাওয়ার পরে, চারণ তার তিনতলার ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে দাঁড়িয়েছিল।

নীচের পথ দিয়ে সাংঘাতিক আওয়াজ করে বাস, ট্রাক, গাড়ি, অটো ছুটে চলেছে। অধিকাংশ যাবে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কেদারনাথ, নয় বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী, নয় গঙ্গোত্রী। কত জায়গায়ই না মানুষ যাচ্ছে। আর কিছু যাবে দেরাদুনের দিকেও। এখানে বিভিন্ন যানবাহনের এই আগ্রাসী আওয়াজটাই বড় বিরক্ত করছে। একবার ভাবল, বিকেলের দিকে ম্যানেজারকে বলে ঘর বদলে পিছন দিকের ঘরে চলে যাবে। আবার ভাবল, তা হলে তো ঘরে বসে এবং নিজস্ব বারান্দাতে বসে গঙ্গা দেখতে পাবে না। ওপারের গহন অরণ্যানী, হিমালয়ের পাদদেশে খাঁজে খাঁজে জমাট বাঁধা রুখু উত্তুঙ্গ শিবালিক পর্বতমালা।

তারপর ভাবল, ভেবে দেখবে বিকেলে, কী করবে! তাড়া নেই কোনও সিদ্ধান্ত নেবার।

চারণ ভাবছিল, এই যে এত মানুষে ছুটছেন, কেউ পুণ্য করতে, কেউ বেড়াতে। তাদের মধ্যে সকলেই কি তাদের এই মত্ততার মানে খুঁজেছেন? বা, খুঁজলেও পেয়েছেন খুঁজে? তাঁদের সমস্ত আনন্দ কি ধেয়ে গিয়ে বুড়ি ছোঁয়ারই মধ্যে? বুদ্ধু সিং যেমন বলছিল?

তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কি শুধুমাত্র দেশ বেড়ানোর বা তীর্থস্থানে যাবার শ্লাঘার জন্যই যাচ্ছেন? 'ঘামণ্ড' এরই জন্যে? গতিমাত্রই, গন্তব্যমাত্রই, সে বন-পাহাড়ের গন্তব্যই হোক কী মন-পাহাড়ের; পৌনঃপুনিক যতি বিনা যে নিতান্তই অর্থহীন হয়ে যায়, তা কি তাঁরা জানেন? কে জানে! হয়তো এই অগণ্য ধাবমান নারী-পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ জানেন। অবশ্যই জানেন। তবে অধিকাংশই হয়তো জানেন না।

চমৎকার ঘুম হল দুপুরে। দুপুরে ঘুম! অভাবনীয়। প্রায় তিনটে অবধি ঘুমোল চারণ। তারপরে উঠে, হোটেলেরই প্যাডে সেদিনের ঘটনাবলী সংক্ষেপে লিখে রাখল। সেদিনের নয়, এখানে আসা অবধি যা কিছু ওর মনে দাগ কেটেছে সেই সব। সফল কবি বা সাহিত্যিক হওয়া হয়নি কিন্তু জাগতিকার্থে সফল মানুষ হয়ে, সেই আনন্দে ডগমগ হয়ে, কলকাতার বিভিন্ন ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব এবং রোটারিতে 'এলিট' সমাজে দশজনের ঈর্ষার কারণ হয়ে জ্বলজ্বলে তারার মতো সে বিরাজ করেছে।

এইটাই হাইট অফ অ্যাচিভমেন্ট। এবং এইটা ট্রাজেডিও বটে।

তবে সুখের কথা এইটুকুই যে, চারণ অবশ্যই বোঝে যে তার এই চোখ-ঝলসানো সাফল্য ট্রাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সহজ সস্তা সাফল্য যে ওর প্রার্থিত নয়, ও এই সরল সত্যটা যে বুঝেছে সে কারণেও কৃতজ্ঞ থাকে। তবে এ কৃতজ্ঞতা যে কার কাছে সেটা স্পষ্ট বোঝে না।

হোটেল থেকে যখন বেরুল তখন রোদের তেজ কমে এসেছে। কিছুটা এগোতেই দেখল পথের বাঁদিকের একটি আশ্রম থেকে অতি অল্পবয়সী এক সাধু বেরুল, বন-থেকে-টিয়ে বেরুনোর মতন। তার বয়স বেশি নয়। হয়তো বাইশ-তেইশ হবে। পরনে ইস্ত্রি-করা রক্তচন্দন-রঙা টেরিকটের ধুতি, লুঙির মতন করে পরা এবং তার উপরে পাঞ্জাবি। টেরি-কাটা চুল। ঘাড়ের পেছনটাতে কোনও দক্ষ হাজামৎ-এর সযতনে ডিজাইন করা ছাঁট। ইনি টালিগঞ্জের 'অধম-কুমার' না সন্ন্যাসী বোঝা দুষ্কর। লম্বা জুলফি। বাঁ হাতে একটি টাইটান ইন্ডিগো ঘড়ি। পাছে ঘড়িটা দেখা না যায়, তাই বাঁ হাতের পাঞ্জাবির হাতাটি একটু গোটানো।

www.MurchOna.com

সন্ন্যাসীসুলভ পোশাক-আশাক না থাকলেও হৃষীকেশের যাত্রী মাত্রই যে সন্নিসী অথবা পুণ্যার্থী এমন ভেবে নিয়ে তিনি চারণের কাছে পেছন থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। এসে বললেন, 'কবে এলেন ?'

সন্ন্যাসী দেখেছিল যে, চারণ 'মন্দাকিনী হোটেল' থেকে বেরিয়েছে। একসপেনসিভ হোটেল।

ভাবল, ভীমগিরিও সন্ন্যাসী, এ মক্কেলও সন্ন্যাসী।

কোনও উত্তর দিল না।

উত্তর না-দেওয়াতে সন্ন্যাসী চটে গেল। চারণ জানে যে, কোনও মানুষকে উপেক্ষা করলে সে যতখানি অপমানিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। অবশ্য যদি তার অপমানবোধ আদৌ থাকে।

চলতে চলতে সন্ন্যাসী বলল, উত্তর দিচ্ছেন না যে !

এমন সময়ে পথের উলটোদিকের, মানে, ডানদিকের একটা বড় অডিও-ক্যাসেটের দোকান থেকে ভীমসেন যোশীজির বিখ্যাত এবং গায়ে কাঁটা দেওয়া, ভৈরবীতে বাঁধা ভজন ভেসে এল। "যো ভজে হরিকো সদা,...পরমপাদ...মিলেগা" বাজছিল।

সেই সন্ন্যাসীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই পথ পার হয়ে চারণ সেই ক্যাসেটের দোকানে গিয়ে ঢুকল। পেছনে পেছনে বর্মী-জোঁকের মতন সেই সন্ন্যাসীও এসে ঢুকল।

ক্যাসেট তো চারণ কিনতে ঢোকেনি ! একটু পরেই বেরিয়ে এসে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোল। সেই সন্ন্যাসী কিছুটা রাগে, কিছুটা ঔৎসুক্যে কিছু দূর অবধি চারণের পেছন পেছন এসে তারপর অন্য কোথাও চলে গেল। চারণ কেন যে অমন করল তা ও জানে না। ওর মধ্যে যে অনেকগুলো মানুষ বাস করে। তাদের একজনের চরিত্রও সে তখনও বুঝে উঠতে পারেনি। ওর সবচেয়ে বড় বিপদ নিজেকে নিয়েই। ওর নিজের ভেতরটা এমনই অগোছালো যে একদিক গোছাতে গেলে অন্যদিকে ধুলো জমে। এ জীবনে নিজেকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি হিমসিম খায় চারণ।

নিজেই নিজেকে বোঝে না, তার অন্যদের বোঝাবে বা বুঝবে কী করে।

চারণ যখন জনস্রোতে মিশে গেল তখন হঠাৎই ওর খুব হালকা লাগতে লাগল। এই ভারশূন্যতার রকমটি ও ঠিক ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। কারণ, তার স্বরূপ সে নিজেও জানে না। শিকড় উপড়ে গেলে যেমন মনে হয়, তেমন এক বোধ। রিচার্ড বাক-এর লেখা জোনাথন লিভিংস্টোন সীগাল বইটি পড়ে যেমন বেশ কিছু দিন শিকড় আলগা করে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, সেইরকম স্বপ্ন সে আবারও দেখতে আরম্ভ করেছে এখানে এসে।

শিকড়বাকড় মানুষের সব কি ঘরের মধ্যেই থাকে ? চার দেওয়ালেরই মধ্যে ? শৈশব থেকে বার্ধক্য এই সব পর্বেই কি শিকড়বাকড়ের দড়াদড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে মানুষ মাত্রই ? ওই সমস্ত প্রশ্নর একটিরও উত্তর ওর কাছে নেই। দেখবে, উত্তর যদি খুঁজে পায় হৃষীকেশের বাসিন্দা অগণ্য সব ঘরছাড়াদের কারও কাছে।

ভাবছিল চারণ, কিসের নেশাতেই বা মানুষ ঘরে থাকে ? আর কিসের নেশাতেই বা ঘর ছাড়ে ? ঘরছাড়ারা যদি ঘরের বাইরের টানের মধ্যে এক ধরনের তীব্র আসক্তিই বোধ করে, তবে গৃহস্থরা দোষ করল কি ? এটা নইলে চলবে না, ওটা নইলে চলবে না, এই তো আসক্তির মূলে। আর যদি তাই হয়, তবে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে, নিজের অন্তরের মধ্যের বন্দী আমিত্বকে অন্তরতমর কোরক থেকে বিচ্ছিন্ন করে উৎপাটিত রক্তাক্ত হৃৎকমলের মতন তাকে যদি নিজের করপুটে রেখে তীব্র কিন্তু নিরাসক্ত আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা যেত তা হলে কি উত্তর পেতে পারত ওর এই প্রশ্নর ?

এত সব গভীর তত্ত্বের বোধের চৌকাঠে পৌঁছেই ও হোঁচট খেল এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করে যে, ভীমগিরি তাকে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে টানছেন। কোনও টানেই যদি ধরা দেবে, সে টান যে টানই হোক না কেন, পুরনো গোপন রোগের মতন নিজের মনের মধ্যে গভীরে প্রোথিত অগণ্য বিরক্তি এবং আসক্তি থেকে মুক্ত হবার চেষ্টাতে এসেও আর এমন গা-ভাসানো কেন ? ভীমগিরি নামক এক বিড়ি-ফোঁকা গঞ্জিকাসেবী, অশিক্ষিত সন্নিসীর টানেই যদি স্রোতের মুখে কুটোর মতন

www.MurchOna.com

ভেসে যাবে চারণ চাটুজ্জে, তবে কক্ষচ্যুত সে আবার তার নিজকক্ষে ফিরে গিয়ে জয়িতাকেই বরং জয়ী করুক। স্মিত, স্নিগ্ধ, পূর্ণ চন্দ্রই গ্রাস করুক তীব্র দৃপ্ত মার্কণ্ডকে। সেই সর্পিণীর ছোবলেই প্রাণ এবং মান হারাক ও।

জাহান্নামে যাক চারণ চাটুজ্জে। রিয়্যাল জাহান্নামে।

ভারী রাগ হল চারণের নিজেরই উপরে। আইন বোঝে, অর্থনীতি বোঝে, লাভ-লোকসান বোঝে, কমপ্যুটার বোঝে, জীবনের মীন-মিডিয়ান-মোড বোঝে, এতরকমের কোশিয়েন্ট বোঝে, বাণিজ্য জগতের ঝাঁ-চকচক নিত্যনতুন টার্মস আর ভ্যারিয়েবলস যার নখদর্পণে, যার অঙ্গুলি হেলনে বিনুর স্বপ্নের রেলগাড়ির মতন দুলে উঠে চলতে আরম্ভ করে আধুনিক পৃথিবী, সেই মানুষ কেন, কী করে ভীমগিরি নামক একজন চাতালবাসী হা-ভাতে সন্নিসীর প্রতি এমন করে আকৃষ্ট হয় ?

যে নিজে এত বড় আইনজ্ঞ সে এ কোন বে-আইনে বাঁধা পড়তে চলেছে ?

আশ্চর্য।

না। ও ঠিক করল, যেখানেই যাক, আজ সন্ধেতে ত্রিবেণী ঘাটে মোটেই যাবে না। এই মোহ ওকে ত্যাগ করতেই হবে। সে ব্যাটা সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তাকে কোনও তুকতাক করেছে। গুরুকে দিয়ে হয়তো বাণ মারিয়েছে। তার মতন বিজ্ঞানমনস্ক বামপন্থী ইনটেলেকচুয়াল, তার মতন সফল ভারতবিখ্যাত আইনজ্ঞর পক্ষে অমন এক গঞ্জিকাসেবীর খপ্পরে পড়ার চেয়ে বড় লজ্জা আর কি হতে পারে। "Emancipation"-এর এই সব মুখ্যুরা বোঝেটা কি ? রামমন্দিরের চাতালে বসে ভজন গাওয়াই যার সিদ্ধিলাভের একমাত্র প্রক্রিয়া তার কাছে বা তাদের কাছে আর যারই কিছু শেখার থাকুক চারণের শেখার কিছুমাত্রই নেই।

আর একটু এগোতেই দেখল পথের বাঁ পাশে প্রাচীন একটি হর্স-চেস্টনাট গাছের নীচে ঝুপড়ি বানিয়ে আছে এক পরিবার। তারা বড়ই গরীব। এক বৃদ্ধ এক হাতে দু-আড়াই বছরের নাতনিকে জড়িয়ে ধরে কোলে বসিয়ে মেরুদণ্ড টান টান করে একটি ছোট চৌপাইতে বসে অন্য হাতে হুঁকো ধরে, গালের সঙ্গে লাগিয়ে হুড়ুক-ভুড়ুক শব্দ করে হুঁকো খাচ্ছে। তার জওয়ান ছেলে আগুনের মধ্যে লোহা গরম করে সেই গনগনে লাল লোহা চিমটে দিয়ে তুলে একটি মোটা লোহার থামের মতন জিনিসের উপরে ধরে আছে আর তার যুবতী, সুগঠিতা বউ একটি বড় হাতুড়ি দিয়ে সেই লাল লৌহখণ্ডকে পিটছে। ছেলেটির হাতের কাছেও একটি ছোট হাতুড়ি রয়েছে। তা দিয়ে সে নরম লোহাকে পিটে-পাটে চূড়ান্ত রূপ দিচ্ছে, লোহার একপ্রান্তকে ছুঁচোলো করছে। সম্ভবত ত্রিশূল বানাবে।

মেয়েটি একটি বহুবর্ণ ঘাঘরা পরে আছে আর বহুবর্ণ ছিটের আঁটসাঁট ব্লাউজ। ঘাঘরার ঘের বেশি নয়। আর তার ঝুল থেমে গেছে তামাটে গোড়ালির অনেকখানি উপরে এসে। তার সুগঠিত পা, সুন্দর সুডৌল, ঘর্মাক্ত, পুরনো-সোনার রঙের স্তনযুগল ছেড়ে ঘরছাড়া চারণ চাটুজ্জ্যের চোখ কোথাওই আর যেতে চাইছিল না। দুটি স্নিগ্ধ এবং কোমল পাখি যেন জোড়ে উড়ে এসেছে স্বর্গ থেকে। এই মর্ত্যভূমিতে আদৌ এদের স্থায়ী বাস যে হতে পারে, তা বিশ্বাসই হয় না।

জয়িতা কত ইটালিয়ান অলিভ অয়েল, কত বিদেশি ময়েশ্চারাইজার, কত ম্যাসুরের সাহায্য নিয়েও এই মেয়েটির স্তনের মতন সুন্দর করতে পারেনি নিজের স্তনকে। এ যে পথপাশের পারিজাত ! কখন যে ফোটে শুধু তাই জানা নেই চারণের। শুনেছে, পারিজাত রাতে ফোটে।

পরমুহূর্তেই ভাবল ও, স্তনী তো প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা নারীই। কিন্তু জয়িতার স্তনের সঙ্গে কি তুলনা হতে পারে অন্য কারও স্তনের ? সে যে জয়িতারই স্তন !

চারণের জিগরি দোস্ত লক্ষ্ণৌ-এর বাসিন্দা হাফিজ একটি শায়ের বলত প্রায়ই, যখন লানডান স্কুল অফ ইকনমিকস-এ পড়াশুনো করত ওরা একসঙ্গে। বলত : "নীগাহ্ যায়ে কঁহা সীনেসে উঠকর ? হুঁয়াতো হুসনকি দওলত গড়ী হ্যায়।" অর্থাৎ, সুন্দরীর সব সৌন্দর্য, তার সব দৌলত তো ঈশ্বর যুগলবুকেই গড়ে রেখেছেন। বুক ছেড়ে চোখ আর কোন চুলোতে যাবে ?

মানল নয় তা। কিন্তু এই সৎ, পরিশ্রমী, স্বনির্ভর ক্ষুধাকাতর ভারতীয় পরিবারের

www.MurchOna.com

পরিশ্রমমুখিনতাতে বা তাদের কষ্টে বা সততাতে চারণ একটুও চমৎকৃত না হয়ে চমৎকৃত হল অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীর স্তনযুগলে ! ছিঃ ছিঃ ।

মনে মনে বলল, শান্তি ? নির্বাণ ? বোধি ? চারণ চাটুজ্যের জন্যে ? দূর অস্ত । দূর অস্ত ।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল চারণ ।

বুড়ো বলল, জাতে ওরা পান্ধী । যাযাবর । এমনই ঝুপড়ি বানিয়ে আবার ভেঙে ফেলে পথ থেকে পথে, জেলা থেকে জেলাতে চলে যাবে । কোনও পিছুটান নেই । ওদের শুধুই সামনে চাওয়া ।

ভারী ভাল লাগল চারণের । ভাবল, কত বড় দেশ এই ভারতবর্ষ ! কত বিচিত্র পেশার, বিচিত্র নেশার মানুষের সমাহার এখানে । দেশকে ভাল করে না দেখলে, দেশের মানুষকে ভাল করে না জানলে, তাদের জন্যে সমব্যথী না হলে মানুষ হয়ে জন্মানোই বোধহয় বৃথা । এরাও তো এক ধরনের সন্ন্যাসীই !

ভাবল ও ।

মেয়েটি অত বড় ও ভারী হাতুড়ি বারংবার ওঠাতে নামাতে, হাঁপ উঠছিল তার । কথা বলার মতন অবস্থা তার ছিল না । অপরিচিতর সঙ্গে কথা সে বলতও না হয়তো ।

মাঝে মাঝেই সে কোমর টানটান করে দাঁড়িয়ে পড়ে চোলি দিয়ে মুখ, গলা এবং ঘাড়ের ঘাম মুছছিল । সে যখনই নিচু হচ্ছিল তখনই তার স্তনযুগল ম্যাগনোলিয়া গ্র্যান্ডিফ্লোরা ফুলের মতনই বিভাসিত হচ্ছিল ।

সেই দৃশ্যে বিমোহিত হয়ে ছাত্রাবস্থায় পঠিত কবি ও সাহিত্যিক মণীশ ঘটকের (যুবনাশ্ব) কবিতার দুটি পঙক্তি মনে পড়ে গেল হঠাৎই চারণের : "বল্কলমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়, সহসা উদ্বেল হল শুভ্র বক্ষময় ।" বল্কলমুক্তর আগে একটা শব্দ ছিল । একটি দারুণ শব্দ । কিছুতেই মনে করতে পারল না ।

কবিতাটির আশ্লেষ সেই একটি হারিয়ে যাওয়া শব্দে যেমন ক্ষুণ্ণ হল, তেমন আবার ভাস্বরও হল ।

মেয়েটিকে দেখে, তার সন্ন্যাসী হওয়া যে এ জীবনে অথবা এ যাত্রাতে হবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হল চারণ । এবং নিশ্চিত হয়ে বিলক্ষণ দুঃখিত হল । তরুণ, শক্তিশালী কোনও গদ্যকারের লেখা গদ্যর মতন গদ্যে এই মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু লিখতে ইচ্ছে করল চারণের ।

মাত্র একটি প্যারাগ্রাফ । জীবনে একটিমাত্র প্যারাগ্রাফের মতন প্যারাগ্রাফও যদি লেখা যেতে পারত, সারা জীবনের চেষ্টা দিয়ে নিজেকে নিয়ত ভাঙচুর করে, মাত্র একটিমাত্র তেমন প্যারাগ্রাফ বা মণীশ ঘটকের ওই কবিতাটির মতন মাত্র দুটি ছত্র, তা হলেই যথেষ্ট ছিল ।

স্বপ্নময়ের গদ্যর স্বপ্নহীনতা চারণকে এই যুবতীর স্তনযুগলেরই মতন আবিষ্ট করে, ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসের অশ্রুত ছন্দ তাকে মুগ্ধ করে, হুসেনের তেল রঙের মারদাঙ্গা অথচ নয়নশোভন ঔজ্জ্বল্য, জয়নুল আবেদিনের হালকা জল রঙের গাঢ় আভিজাত্য, জয় গোস্বামী অথবা অনিল ঘড়াই-এর অথবা শিবতোষ ঘোষের, তাদের পদ্য ও গদ্যর মধ্যে দিয়ে জীবনকে দেখার ভঙ্গি, জিন-কণ্ঠী ইফফাত আররা খান-এর অননুকরণীয় গভীর যৌনগন্ধী স্বরের নাব্যতা, অথবা শ্রুতি সাডোলিকারের গলার প্রভাতী বিভাস এ সব কিছুর কথাই একই সঙ্গে মনে পড়ে গেল চারণের সেই হাতুড়ি-পেটা ঘর্মাক্ত পান্ধী মেয়েটির কর্বুর ব্লাউজের মধ্যে অস্ফুটে ফুটে-থাকা স্তনযুগলে চোখ পড়েই ।

হঠাৎই যেন কানের মধ্যে কে বলে উঠল, 'বেটা । তোর আধার ভাল ।'

চারণ হতভম্ব হয়ে গেল । পরক্ষণেই কান্না পেয়ে গেল তার । মনে মনে বলল, হবে না, হবে না । যে জীবনকে এতখানি ভালবাসে, জীবন যাকে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রেখেছে, তার কখনওই পালানো হবে না ভোগের জীবন থেকে । বন্ধনই তার কপাল-লিখন । চির-বন্ধন । জীবনকে যে ভালবেসেছে, যে ঘৃণা করেছে, যে প্রেমিকার মতন জড়িয়ে ধরেছে, যে ফুটবলের মতন লাথি মেরেছে চারণের মতন, শুধু সেই জানে যে জীবন অক্টোপাস । সহস্র হাতের সুদৃঢ় অদৃশ্য

www.MurchOna.com

বন্ধনে জীবন মানুষ-মানুষীকে বেঁধে রাখে। অভ্যেসের মধ্যে। প্রতিদিনের কাজের মধ্যে, সুগীত গান, সুলিখিত কবিতা, সুললিত কথোপকথন, সুন্দর দৃশ্য, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দর মায়ার ঘেরে।

সংসারের থেকে, জীবনের বজ্রমুষ্ঠি থেকে, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু লুকোনো যাবে না কোথাওই। দৌড়নো হয়তো যাবে, দূর হতে বহু দূরে, হয়তো দিগন্ত অবধিও কিন্তু লুকোনো হবে না। জীবন ঠিক পিছনে পিছনে এসে তার বজ্রমুষ্টিতে কব্জি আঁকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে চারণকে তার ঘেরাটোপের মধ্যে। চারণ অলীক মানুষ নয়, অলীক স্বপ্নও দেখে না!

চারণ জানে যে, একদিন হৃষীকেশের এই কটি দিনকে স্বপ্নের মতন মনে হবে। সত্য, কঠিন এবং বাস্তব জীবনের ফ্রেমের মধ্যে এই দিনকটি, এই পাক্কী যুবতীর কর্বুর ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারা ভীরু কবোষ্ণ পাখির মতন স্তনযুগলের মতন, পৃথিবীর সব সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার সংজ্ঞার মতনই বাঁধানো থাকবে মনে।

না কি, মোড় নেবে তারও জীবন?

বাঁকে বাঁকে কি বয়ে যাবে নতুন খাতে? হয় হৃষীকেশ, নয় আরও উপরের দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, কোথায়? তা কে বলতে পারে!

মুক্তি নেই ভীমগিরি মহারাজ। মুক্তি নেই।

যদি আত্মহত্যা করে ও?

জীবন্মৃত জীবনের চেয়ে মৃত্যুই কি শ্রেয় নয়?

পাঠক। আপনি ভাবছেন চারণ চাটুজ্জ্যেকে রাঁচির কাঁকে রোডে পাঠানো দরকার। যার প্রকৃত বেদনা নেই, আর্থিক কষ্ট নেই, যার কষ্ট বেদনা-বিলাস মাত্র, তার দুঃখটা কিসের?

পাঠক। আপনি যদি মানুষ হন অথবা মানুষী, তবে অবশ্যই জানবেন যে, মানুষের প্রকৃত কষ্টটা কোনও দিনই ভাত-কাপড়ের ছিল না। এ সব কথা নানা মতের, নানা দেশের রাজনীতিকদের বানানো কথা। ভোট বাগানোর কল। ভাত-কাপড়ের কষ্টই যদি মানুষকে কোনও দিনও তেমন করে ক্লিষ্ট করত তবে ভীমগিরির মতন কেউই হাসিমুখে বলতে পারতেন না 'ভুখখা মরো।'

মানুষের মতন মানুষ যে, সে চিরদিনই দুঃখী। বড়লোকই হোন, কী গরীব, রাজাই হোন কী প্রজা। এই দুঃখবোধেরই আর এক নাম বোধহয় মনুষ্যত্ব।

ভেবেছিল যে, অন্য কোথাও যাবে। ত্রিবেণী ঘাটের দিকে যাবে না। কিন্তু সেই ডানদিকেই ঘুরল। তবে প্রথম মোড়ে নয়, এগিয়ে গিয়ে, দ্বিতীয় মোড়ে। ঘাটে যাওয়ার সেই দ্বিতীয় পথটি ভাল করে দেখা হয়নি ওর এখনও।

একটু এগোতেই দেখল, বাঁদিকে একটি ইডলি-দোসার দোকান। বিকেলে চায়ের সঙ্গে কিছু খায়নি। একটু খিদে-খিদে বোধ করছিল। দুদিনেই তো আর 'ভুখখা মরো' বাণীতে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না। সময়কে সময় দিতে হবে বৈকি, যতখানি সময়, সময় চায়। ঢুকে পড়ল, দোকানটিতে। দেখল, দেওয়ালময় রবীন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং শরৎচন্দ্রর ছবি তো বটেই দার্জিলিং-এর সূর্যোদয়, দীঘার শীতকালের তটের ফোটো, এই সব টাঙানো। একটি প্লেইন দোসা আর কফির অর্ডার দিয়ে ও ছবিগুলো দেখতে দেখতে ভাবল দোকানি নিশ্চয়ই বাঙালি। ক্যাশ কাউন্টারে যে ছেলেটি বসে ছিল, তাকে জিগ্যেস করল উঠে গিয়ে, মালিক বাঙালি কি না। সে দুদিকে মাথা নেড়ে তামিলিয়ান অ্যাকসেন্টের আড়ষ্ট হিন্দিতে বলল, "আম হাজহি আয়া, আমারা ইন্দি নেই আতা আয়।"

এক ভদ্রলোক বসে ডিশের উপরে কফি ঢেলে সুরুৎ সুরুৎ করে মেপে মেপে চুমুক দিয়ে কফি খাচ্ছিলেন। চারণের ঔৎসুক্য দেখে আপনা থেকেই তিনি হিন্দিতে বললেন, "মালিক মাড্রাজি হ্যায়।"

দক্ষিণ ভারত যে একটি মস্ত বড় জায়গা, সেখানে যে অনেকগুলি রাজ্য আছে এসব খবর পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিম ভারতেরও সাধারণ মানুষে রাখেন না। অনেক শিক্ষিত মানুষও রাখেন না। তামিল, তেলেগু, মালয়ালি, কর্নাটকি, কুর্গি, সকলেই "মাড্রাজি" বলেই বর্ণিত হয়। আশ্চর্য

www.MurchOna.com

সরলীকরণ !

দেওয়ালের ছবিগুলো দেখিয়ে চারণ বলল, তব ?

তব ক্যা ?

ইয়ে সব বাঙালি ঔর বাঙালকি তসবির ?

সে বলল, হাঃ। ইয়ে সব বাঙালি কাস্টোমার পাক্কাড়নেকো লিয়ে !

হাসি পেল চারণের।

সত্যি। বাঙালি এক আশ্চর্য জাত। তাদের নিজ শহরে অমিতাভ বচ্চন আর মাধুরী দীক্ষিতে মজে থাকে তারা, কিন্তু প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দর ফোটো দেখেই কাত। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রর একটি বইয়ের এক লাইনও পড়া থাক আর নাই থাক, তাতে যায় আসে না কিছুমাত্রই। প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামকৃষ্ণদেব বা বিবেকানন্দর চার ফেললে বাঙালিরা যে মাছেরই মতন বুড়বুড়িতুলে হুড়মুড়িয়ে আসে এই তথ্য দোকান-মালিকের ভাল করেই জানা ছিল। তাই সেই দোকানের বিক্রি ঠেকায় কেডা ? চাকরি-করা আর বসে-খেতে ভালবাসা বাঙালি অন্য সব রাজ্যের সব স্তরের ব্যবসায়ীকে যেমন নির্বিকারে বড়লোক করে তেমন আর কোনও রাজ্যের মানুষই করে বলে চারণের জানা নেই।

দোসাটা যখন তৈরি হচ্ছে তখনই হঠাৎ সেই নবীন সন্ন্যাসী পথ দিয়ে দুধারে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে যেতে যেতে চারণকে দেখতে পেয়েই দোকানে ঢুকে পড়লে।

সন্ন্যাসীরাও কি দোসা খান ?

ভাবল চারণ।

তারপরই ভাবল, না খাওয়ার কি আছে ? তা ছাড়া ইনি তো সন্ন্যাসী ননও। ভেকই ধরেছেন শুধু।

চারণের উলটোদিকের চেয়ার টেনে বসে পড়ে সন্ন্যাসী বলল, পালাতে চাইলেই কি পালাতে পারা যায় ?

চারণ উত্তর দিল না।

সন্ন্যাসী মিটিমিটি হাসতে লাগল।

চারণের রাগ, বিরক্তি, কৌতূহল সব মেলানো এক অনুভূতি জাগল মনে। কিন্তু ঠিক করল যে, কথা বলবে না।

রক্তচন্দন-রঙা টেরিকট পরা সন্ন্যাসী বলল, আমি অনেক ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসেছি।

চারণ বোবার মতন চেয়ে রইল।

উত্তর না পেয়ে সন্ন্যাসী আরও চটে গেল।

বলল, সন্ন্যাসী কত রকমের হয় জানেন ?

চারণ এবারে তার তর্জনী আর মধ্যমা দেখাল তাকে ?

মানে ?

চারণ মুখে বলল, দুরকমের।

ঘণ্টা জানেন।

সন্ন্যাসী বলল।

বলেই বলল, কোন কোন রকম ?

সাচ্চা আর ঝুঠা।

আপনি একটা ইডিয়ট !

মুখের উপরে প্রকৃত ইডিয়ট যে, তাকেও ইডিয়ট বললে সে চটে উঠত কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে এবং ওই ল্যাকব্যাকে ভীমগিরির সামান্য প্রভাবেই বোধহয় চারণের আমিত্ব কিছুটা ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকবে ইতিমধ্যেই। সে না রেগে, ঠাণ্ডা গলাতে বলল, "লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে নয়।"

এই বাক্যটি দিদিমার উত্তরপাড়ার পুজোর ঘরের দেওয়ালে কাঁচ ঢাকা ফ্রেমের মধ্যে বাঁধানো

www.MurchOna.com

ছিল।

তারপরই সন্ন্যাসী যা বলল, তা শোনার জন্য চারণ তৈরি ছিল না। সে বলল, আপনাকে আমি চিনি। আমার বাবার সঙ্গে আপনার অফিসে আমি বহুবার গেছি।

আপনার বাবার নাম কি ?

অবাক হয়ে চারণ জিগ্যেস করল।

সেই তরুণ সন্ন্যাসী যে নামটি বলল তা শুনে চারণ চমকে উঠল। তার নির্মোহ নির্মোক আর বজায় রাখা সম্ভব হল না।

চারণ বলল, দোসা খাবে ?

নাঃ।

এবার তার পালা চারণকে উপেক্ষা করার।

চারণ বলল, তুমি ঘর ছাড়লে কবে ? আর ছাড়লেই বা কেন ?

সে সব অনেক কথা। পূর্বাশ্রমের কথা আমি আলোচনা করতে চাই না। আপনার Arrogance ভাঙবার জন্যই পিতৃপরিচয় দিতে হল। তবে সে লোকটাকে আমি বাবা বলতে যা বোঝায়, মানে যে সম্মান সম্ভ্রম প্রাপ্য থাকে সব বাবারই তার ছেলের কাছ থেকে, তার কণামাত্র দিতে পারিনি, দেব না। কারও গর্ভে কাম-উৎসারিত এক ফোঁটা ঔরস নিক্ষেপ করলেই কেউ কারও বাবা হয়ে ওঠে না। সব বাবার বেলাতেই 'পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, পিতাহি পরমন্তপ' বলা চলে না। সন্তানের জন্মদাতা পাবেন কোটি কোটি কিন্তু বাবা কজন তাঁদের মধ্যে ?

নিজের বাবাকে এত ঘৃণা কি করা ভাল ? এত ঘৃণা নিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হতে পারবে ? তোমার নামটা যেন কি ? তোমার নাম অবশ্য আমি জানতামও না কোনও দিন ?

সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের নাম জেনে লাভই বা কি ? আমার এখনকার নাম পাটন। গুরুজি বলেন পাটনানন্দ।

পাটন ! অদ্ভুত নাম তো। পাটন। মানে কি ?

বাঙালির ছেলে হয়ে পাটন মানে জানেন না ? 'পাটনি' শব্দের মানে জানেন তো ?

পাটনি ? ও হ্যাঁ।

তবে পাটনের স্ত্রী লিঙ্গই তো পাটনি। আমি খেয়াঘাটের মাঝি। আপনার মতো শর্ট টেম্পারড অ্যারোগ্যান্ট মানুষদের নদী পার করাই আমি, আমার নির্বাণের খেয়া নৌকোতে।

বাব্বা ! তুমি বয়সে ছোট হলে কি হয়, কথা তো বেশ বড় বড় বলতে শিখেছ।

এখনও কিছুই শিখিনি। শুধু কথাই না, কাজও শিখব। কথা বলা তো অতি সহজ। এই সব কথাকে জীবনে ট্রানস্লেট করে দেখাতে হবে।

বাবা। বাংলাও তো খুব ভাল বলো দেখছি তুমি !

সবই গুরুর কৃপা। তার পায়ের কাছে বসে থাকি। যা উপচে পড়ে এসে জোটে তাই তো যথেষ্ট।

দীক্ষা-টিক্ষা নিয়েছ নাকি ? হাসালে তুমি। তুমিও !

এমন করে কথাটা বলল চারণ যে, 'You too Brutas! এর মতনই শোনাল।

সে বলল, আপনি মস্ত বড় ইমপট্যান্টি লোক হতে পারেন, সমাজের দণ্ডমুণ্ডের একজন মালিক, কিন্তু আপনি জানেন না কিছুই।

তুমিও কিছুমাত্রই জানো না আমার সম্পর্কে। অবান্তর কথা বোলো না। চৌধুরী সাহেবের একমাত্র ছেলে ঘর ছেড়ে গেরুয়া পরে হৃষীকেশের এই ইডলি-দোসার দোকানে বসে আমার সঙ্গে বে-এক্তিয়ারে বিতণ্ডা করবে এ আমার পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার। আমি তো বলব তুমি উন্নতি করোনি, অধঃপাতে গেছ। তোমার বাবা কখনওই আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলতেন না।

কি করে বলবেন ? তাঁর টিকি যে বাঁধা আছে আপনাদের মতন Professionalsদের কাছে। আমার বাবা তার কর্মচারীদের সঙ্গে কী ভাষাতে কথা বলে তা কি আপনি কখনও শুনেছেন ?

www.MurchOna.com

না শুনিনি।

ওঁর যত বিনয় সব আপনাদেরই কাছে।

তোমার বয়স কত পাটন ?

বয়স কি বয়সে হয় স্যার ?

বয়স তবে কিসে হয় ?

বয়স হয় অভিজ্ঞতায়। বয়স, কোনওদিনই বয়সে হয় না, হয়নি। জীবনের মূল্যও কোনও দিনও আয়ু দিয়ে মাপা হয় না। এ সব জানেন না বলেই তো খেয়াঘাটের মাঝির দরকার আপনার। আমার বয়স পঁচিশ। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে আমি হয়তো আপনার চেয়ে পঞ্চাশ বছরের বড়।

পঞ্চাশ বছরের ?

ইয়েস স্যার।

দোসাটা এসে গেল। এক কাপ কফিও দিতে বলল চারণ। তারপর বলল, কফিও খাবে না এক কাপ ? অথবা চা ?

নাঃ। থ্যাঙ্ক উ্য।

তুমি না গোয়ালিয়রের পাবলিক স্কুলে পড়তে ? তারপরে কোথায় ছিলে ? সত্যি। ভাবা যায় না। সেই তুমিই এখন...

স্কুলিং শেষ করে স্টেটসে গেছিলাম।

কেন ?

বাবা বলেছিল এ দেশে পড়াশুনো হয় না। আমাকে 'মানুষ' করতে পাঠিয়েছিল। ম্যাসাচুসেটসও গেছিলাম। সেখান থেকে এম বি এ করে ফেরার কথা ছিল।

তা চলে এলে কেন ?

ওসব না করেই লেজ গজিয়ে গেল। স্টেটস-এ তো লোকে লেজ গজাতেই যায়। তা ছাড়া গুরুও ডাকলেন।

গুরুও কি লেজ গজাবার জন্য স্টেটস-এ গেছিলেন না, তোমাকে ডাকতে ?

সে সব কথা অবান্তর। আপনি জেনে কি করবেন ? তবে লিটারালি ডাকেননি। আমার অন্তরে সেই নিরুচ্চারিত ডাক পৌঁছেছিল। দুত্তোর বলে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে এলাম তাঁরই সঙ্গে।

তোমার গুরু কে ?

গাড্ডুবাবা। কেউ কেউ বলে ভোঁদাই মহারাজ।

সেকি ! এমন বিচ্ছিরি নাম কেন ?

তা জানি না। আমি তো দিইনি নাম। তবে মনে হয় ওই নামটা আসল মানুষটাকে প্রচ্ছন্ন রাখে। যদি কোনও গুরুর নাম হয় ইন্টেলিজেন্ট মহারাজ তবে জানতে হবে তাঁর মতন বড় বুদ্ধু আর দ্বিতীয় নেই।

চারণের বুদ্ধু সিং-এর কথা মনে পড়ে গেল। কফি আর দোসার দাম দিয়ে দোকান থেকে বেরোল চারণ, পাটনের সঙ্গে।

কোন দিকে যাবেন আপনি চ্যাটার্জি সাহেব ?

পাটন বলল।

আমাকে তুমি চারণদা বলেই ডেকো।

বলব। কিন্তু আপনিও আমাকে পাটন বলেই ডাকবেন।

তারপর বলল, ক্যাসেটের দোকানে কি আমাকে ফলো করেই ঢুকেছিলে না কোনও ভজনের ক্যাসেট কিনতে ?

ফলো করে তো নিশ্চয়ই ! তবে ভজনের ক্যাসেটের জন্য নয়, মাইকেল জ্যাকসনের কোনও ক্যাসেট পাওয়া যায় কি না খোঁজ করতে গেছিলাম।

www.MurchOna.com

মাইকেল জ্যাকসন ! মাই গুডনেস। মাইকেল জ্যাকসন এবং পাটন মহারাজ। ভাবা যায় না।

কেন ? Incompatibility-টা দেখলেন কোথায় ?

Incompatibility নেই ?

নাঃ। কোনও Incompatibility-ই নেই।

তুমি তো চিন্তায় ফেললে আমাকে।

চিন্তাই তো মানসিক উৎকর্ষতার একমাত্র পথ। তবে চিন্তার রকম-ভেদ আছে। সৎ চিন্তা করতে হবে। আমার বাবাও তো সব সময়েই চিন্তা করে। তবে শুধুই টাকার চিন্তা, টাকার, আরও টাকার। অথচ টাকার ব্যবহার জানে না। এ ছাড়াও প্যাঁচ মারার চিন্তা, অন্যকে 'টাইট' দেওয়ার চিন্তা। পরের অপকার করার চিন্তা।

তোমার বাবার জন্যই তুমি তা হলে এই অন্য জীবনে প্রবেশ করতে পারলে বল। এ জন্যও তো তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার।

তা বলতে পারেন। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু আপনি এখানে কেন ?

এমনি।

নাঃ। এমনি নয়। এমনি যারা আসেন তাঁদের দেখেই বোঝা যায়।

তাই নাকি ? তা হলে মনে করো এমনি নয়। আচ্ছা ভীমগিরিকে চেনো ? ভীমগিরি মহারাজ ?

এখানে কত মহারাজ, কত বাবা আছেন। আমি চিনি না। তা ছাড়া আমি তো থাকিও না এখানে।

এখানে থাকো না ? তবে কোথায় থাকো ?

উপরে। ভিয়াসির আগে। এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে দেবপ্রয়াগের পথ থেকে বাঁদিকে পোয়া কিমি মতো উঠে এক মস্ত গুহা আছে। সেখানেই গাড্ডু মহারাজ থাকেন। আমিও সেখানেই থাকি।

তাই ? নিয়ে যাবে আমাকে ?

কেন ? গাড্ডু মহারাজকে দেখতে ?

না, না থাকতে। তোমরা বাইরের লোকদের থাকতে দাও ?

কে যে বাইরের আর কে যে অন্তরের তা তো অন্তর্যামীই জানেন। গুরুকে জিগ্যেস করতে হবে। কিন্তু কেন ? ভাল লাগছে না এখানে ?

মন্দাকিনী হোটেলে থেকে সাধু-সন্ত-মহারাজদের নাগাল পেতে বড়ই অসুবিধা হচ্ছে। তাদের কাছে পৌঁছতে পারছি না, পারব না যে, তাও বুঝতে পারছি।

নাগাল পাওয়ার জন্য এমন কাঙালপনাই বা কেন ? আপনি Instant Coffee-র মতো Instant বৈরাগ্য প্রার্থী ?

না তা না।

ঠিক বলতে পারব না। বলব, যাকে সাধু বাংলাতে বলে "মন উচাটন" হওয়া, তাই হয়েছে। সে জন্যই...

বাঃ।

আমার গুরু বলেন, এই হল প্রকৃত সাধকের লক্ষণ। মানে, সাধক হওয়ার প্রস্তুতির লক্ষণ। দামি বলে যা-কিছুকেই জানতেন তার সব কিছুই হঠাৎ মূল্যহীন, অসার বলে ঠেকেছে তো ? হুমম। কিন্তু আমি যদিও ওঁকে গুরু বলি, উনি আমাকে কেন, কারওকেই শিষ্য বলে মানেন না।

বলেই বলল, আপনি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা পড়েছেন ?

হ্যাঁ।

চারণ বলল, আচ্ছা আরও একটা কথা বলো তো ? তুমি তোমার পাঞ্জাবির বাঁ হাতের হাতাটা গুটিয়ে ঘড়িটা বের করে রেখেছ কেন ? দেখাবার জন্যই তো ? এটা কোন সাধনার লক্ষণ ? এটা কি এগজিবিশানিজম্ নয় ?

www.MurchOna.com

চারণের কথাতে খুব জোরে হেসে উঠল পাটন।

হাসছ কেন ?

হাসি পেল বলে।

তারপর বলল, এর পরে আপনি নিশ্চয়ই জিগ্যেস করবেন যে আমি রক্তচন্দন-রঙা টেরিকটের এবং ইস্ত্রি করা লুঙি-পাঞ্জাবি কেন পরেছি ? তাই না ?

চারণ লজ্জিত হল।

তারপর বলল, তোমার কথাটা ঠিকই।

তা হলে শুনুন। ঘড়িটা বাঁ হাতের কব্জিতে বের করে রেখেছি কারওকে দেখাবার জন্য নয়। না। এই দেখুন। ডান হাতের পাঞ্জাবির হাতা ডান হাতের আঙুল দিয়ে উঠিয়ে ঘড়ি দেখার উপায় নেই। ডান হাতটা সব সময়েই আটকে থাকে। এই দেখুন।

বলেই, ডান হাত বের করে দেখাল পকেট থেকে। চারণ দেখল, সত্যিই তার হাতে জপমালা।

তুমি জপমালা পকেটে নিয়ে ঘোরো ? চৌধুরীসাহেবের ছেলে। যিনি পশ্চিমবঙ্গের পয়লা নম্বরী ঢালাইওয়ালা, 'মাধুরী স্যানিটারি ন্যাপকিন'-এর মালিক...। তুমি গোয়ালিয়রের পাবলিক স্কুলের ছাত্র।

হ্যাঁ। ঘুরি। তারা টাকার জন্য মালা জপে আর আমি জপি মোক্ষর জন্য।

মোক্ষ ! হাসালে তুমি পাটন।

বলল, চারণ।

তারপর বলল, এই বয়সে মোক্ষর তুমি বোঝোটা কি ?

আবারও বয়স বয়স করছেন ! স্বামী বিবেকানন্দ মারা গেছিলেন কত বয়সে ?

চারণ চুপ করে গেল।

তুমি যাই বল, ব্যাপারটা অভাবনীয় আমার কাছে। প্রিন্স-অফ-ওয়েলস মালা জপছে রক্তচন্দন বসন পরে !

কেন ? এতে অবাক বা স্তম্ভিত হবার কি আছে ? অভাবনীয়ই বা কেন ? মুসলমানেরা তো দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে। কি ? পড়ে না ? খ্রিস্টানেরা প্রতি রবিবারে চার্চে যায় না ? বৌদ্ধরা, সেই ডাব্বার মতন জিনিসটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, নাম মনে পড়ছে না, বলে না, ওঁ মণিপদ্মে হুঁম। ওঁ মণিপদ্মে হুঁম। ওঁ মণিপদ্মে হুঁম ? তা হলে লজ্জা কি শুধু পুজোআচ্চা করাতেই ? মালা জপাতেই ? স্তম্ভিত হবার কথা তো ছিল আমারই ! আপনার অজ্ঞতাতে অথবা ঔদাসীন্যে ! অথবা হিন্দু হয়েও আপনার হিন্দুত্ব অস্বীকার করার এই হাস্যকর চেষ্টাতে। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে ভারতবর্ষে বিশেষ করে, পশ্চিমবঙ্গে এখন নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়াটা আউট অফ ফ্যাশান।

আমি হিন্দু নই।

চারণ বলল।

আপনি তবে কি ?

আমি জন্মসূত্রে অবশ্যই হিন্দু, কারণ আমার মা-বাবা হিন্দুই ছিলেন। কিন্তু তোমার জানবার কথা নয়, তাই তোমাকে জানাবার জন্যই বলছি যে আমার প্রথম (এবং শেষও বটে) চাকরির দরখাস্তে Religion-এর যে Column ছিল সেখানে লিখেছিলাম "Hindu by birth but do not conform to any known form of Religion."

পাটন বলল, কোনও Known form of Religion-এ আপনার ভক্তি না থাকতে পারে কিন্তু আপনি কি ধর্মই মানেন না ?

ধর্ম মানে ইডিয়টসরা, হাফ-উইটসরা, জড়বুদ্ধিরা।

চারণ বলল।

পাটন দুঃখিত অথবা ক্রুদ্ধ অথবা অপমানিত কোনও কিছুই না হয়ে, হাসল।

ছেলেটা বয়স অনুপাতে সত্যিই বড় বেশি পেকে গেছে। সবজান্তা হয়ে গেছে। ভাবল চারণ।

www.MurchOna.com

পাটনের হাসিতে একটু শ্লেষও ছিল।

পাটন বলল, আপনি তা হলে যথার্থই এক জন নিটোল বাঙালি ইনটেলেকচুয়াল। কোনও ভেজাল নেই আপনার ইনটেলেক্ট-এ। ধর্ম-মানা মানুষ মাত্রই আপনার কাছে ইডিয়টস, হাফ-উইটস, জড়বুদ্ধি। Very well said indeed!

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে, একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি এবারে ফিরে যাব। আপনার পেছন পেছন অন্য পথে অনেকই দূর চলে এসেছি।

সকলেই তো অন্যের পেছন পেছনই ভুল পথে চলে যায়। অনেক দূর। তারপর পস্তায়। তোমার এখনও সময় আছে। বয়স বেশি নয়। এখনও অন্যের পেছন ছাড়তে পার।

থ্যাঙ্ক উ্য ফর দ্য অ্যাডভাইস স্যার।

ভেকধারী চৌধুরী, অধুনা পাটন মহারাজ বলল।

তারপর বলল, চলে যাবার আগে আমার এই ইস্ত্রি করা রক্তচন্দন-রঙা টেরিকটের বসনের রহস্যটাও জানিয়ে যাই। এ নিয়ে প্রথম দর্শন থেকেই আপনার মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে যে তা বুঝতে পেরেছি।

কি করে ?

বুঝেছি। কি করে, তা নাই বা জানলেন। তা হলে শুনুন, এই পোশাকও আমার নয়। আমার বলতে আমার গায়ের চামড়াটুকুই। তবে সুখের বিষয় এই যে চামড়াটা মানুষের, চোখের চামড়াসুদ্ধু, গণ্ডার অথবা শিম্পাঞ্জির নয়। পোশাকটি পথপাশের যে আশ্রম থেকে আমাকে বেরোতে দেখলেন, যেখানে গত রাতটি কাটিয়েছিলাম, সেই আশ্রমের এক সৌখিন সন্ন্যাসীর। আমার জিনের ট্রাউজার আর শার্ট ছিঁড়ে গেছে। একজোড়ার দুটিই। তাই সেলাই ও রিপু করতে দিয়েছি। আজ মানে, এখনই দিয়ে দেবে। যাঁর পোশাক তাঁকে ফেরত দিয়ে পুনর্মূষিকঃ হব।

চারণ অবাক হয়ে বলল, জিনস পরা সন্ন্যাসী ?

পাটন বলল, পোশাকে কি আসে যায় বলুন ? আমার গুরুও তো গেরুয়া পরেন না। মুসলমান কসাইরা যেমন চেক-চেক রঙিন লুঙি পরে, গাড্ডুবাবাও তাই পরেন। উপরে সাদা পাঞ্জাবি। টুইলের। তাঁর এক শিষ্য আছেন মুসলমান। তাঁর নাম ইমতিয়াজ। লানডান স্কুল অফ ইকনমিকস-এর ছাত্র ছিলেন।

ইমতিয়াজ ?

চমকে উঠল চারণ।

কেমন দেখতে ?

কে ?

ইমতিয়াজ ?

নবাবের মতন চেহারা। লক্ষ্ণৌ-এর মানুষ। কথায় কথায় শায়েরের ছেরছাড় করেন, যেন মির্জা ঘালিব। লম্বা। আগুনের মতন গায়ের রং। ছিপছিপে। আগে মোটা-সোটা ছিলেন কি না বলতে পারব না।

প্রত্যেক সেন্টেন্স-এ একবার করে ইনসাল্লা বলে কি ?

ঠিক ঠিক। আপনি চেনেন নাকি তাঁকে ?

চিনি। আমার সহপাঠী ছিল লানডান-এ।

তাই ?

হ্যাঁ। কিন্তু সে কি হিন্দু হয়ে গেছে ? কাফির বনেছে।

না। তা কেন বনবেন ? তা ছাড়া আমার গুরুর মধ্যে তো কোনও রকম গোঁড়ামি নেই। থাকলে, মুসলমান শিষ্য কি থাকত ? তবে ইমতিয়াজ মহম্মদ সাহেব এখানে থাকেন না বরাবর। বছরে দু-তিনবার ঘুরে যান। আমার গুরুর কাছে এসে নানা জিজ্ঞাসার নিরসন করেন, আলোচনা করেন তারপর ফিরে যান। কোরান, হাদিস-এর উপরে যেমন, কনফ্যুসিয়াস, স্পিনোজার উপরেও

www.MurchOna.com

তেমন দখল। পোলিটিকাল এবং ইকনমিক থিওরিতে যেমন, দর্শনেও তেমন দখল।

চারণ স্বগতোক্তির মতন বলল, জানি। তারপর বলল, ইমতিয়াজ মহম্মদ থাকে কোথায় এখন ?

তাঁর বাড়ি তো লক্ষ্ণৌতে। কিন্তু আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে না দিল্লির কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান যেন। দিল্লিতেই থাকেন। অত জানি না।

তাই ?

হ্যাঁ। এবারে আমি চলি।

কবে ফিরে যাবে ?

আজই যাব।

কখন ?

আমার জামাকাপড় পেলেই। তা ছাড়া, একটু রাবড়ি নিয়ে যাব গুরুর জন্য। রাবড়ি খেতে খুব ভালবাসেন গুরু।

বাঃ। বেশ ভোগী গুরু তো তোমার।

শুধু ভোগী নন, ত্যাগীও। তিনি গুরুবাদে বিশ্বাসী নন। আমরাই তাঁকে গুরু মানি। উনি কারওকেই দীক্ষা দেন না, কারও উপরেই নিজের কোনও মত বা ইচ্ছা বা দর্শন আরোপ করেন না। গাড্ডুবাবা এই ভাগীরথীরই মতন। তিনি নিজের খেয়ালেই বয়ে যান। কেউ সে নদীতে চান করে যায়, কেউ তা থেকে খাবার জল নিয়ে যায়, কেউ বা নোংরা কাপড় কাচে, কেউ বা হাতমাটিও করে। যার যেমন আত্মা, যার যেমন আধার।

বলেই বলল, আর দেরি করতে পারব না। অন্ধকারে পাহাড়ে চড়তে অসুবিধে হবে। ভুলে টর্চটাও ফেলে এসেছি।

তারপর দুপা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আপনি এখানে কি করতে এসেছেন চ্যাটার্জি সাহেব ?

বললামই তো। ঘুরতে। জাস্ট ঘুরতেই।

বাঃ। ভাল। 'মন উচাটন' রোগ যদি পুরোপুরি না সারে, তবে চলে আসবেন আমাদের গুহাতে।

চিনব কি করে ?

আপনিই পথ চিনে নেবেন। আপনি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' পড়েছেন ?

না। তবে একবার নাটকটি দেখেছিলাম।

তাই ? তাতে ধনঞ্জয় বৈরাগীর সেই গানটি ছিল না ?

কোন গান ?

'পথ আমাকে সেই দেখাবে যে আমারে চায়।'

মনে নেই।

মনে পড়ে যাবে। চলি আমি, চ্যাটার্জি সাহেব।

চারণ তখনও অবিশ্বাসীর চোখে কলকাতার কোটিপতি বুজু চৌধুরীর একমাত্র ছেলের দিকে চেয়েছিল। ধীরে ধীরে পরম-বিস্ময় পাটন, নির্বাণের নৌকো-বাওয়া, খেয়াঘাটের-মাঝি, জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।

পাটন চলে গেলে, চারণ বলতে গেলে, অনবধানেই ত্রিবেণী ঘাটের দিকে পা বাড়াল।

নানারকম দোকান সেই পথে। দর্জির, মনোহারির, হিন্দি বইয়ের, নানারকম ধর্মপুস্তকের। সরল গ্রামীণ তীর্থযাত্রীদের লুব্ধ করার জন্যে চোখ-ঝলসানো কাঁচের চুড়ির দোকান। কোথাও, কোথাও নানা-রঙা প্লাস্টিকের খেলনা। কোথাও বা গরম জিলাপি আর সিঙ্গাড়া ভাজা হচ্ছে। কোথাও পুরী আর আলুর তরকারি, লেবু ও লংকার আচার সহযোগে পরিবেশিত হচ্ছে। সস্তা ঘি আর আচারের গন্ধ উড়ছে হাওয়াতে। এখানকার দুধ খুবই ভাল। তাই, দুধের নানারকম মিষ্টিও অঢেল। রাবড়ি, মালাই।

চারণ ভাবল, এখানে সিদ্ধির সরবতও নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, তার

www.MurchOna.com

খোঁজ জানে না। ভীমগিরি জানবেন হয়তো।

শ্লথ পায়ে, উদ্দেশ্যহীন এই চলা ওর। বেশ লাগছে চারণের।

যে কোনও আধুনিক শহরেই অধিকাংশ মানুষেই হাঁটে না, দৌড়োয়ই। দুলকি চালে চলে। TROT-এ। আর পশ্চিমে তো Literally দৌড়োয়। কলকাতার কথা আলাদা। কলকাতা তো তিলোত্তমা। কলকাতার তুলনা একমাত্র কলকাতাই। সেখানে সকলেই হয়তো অজানিতেই তাঁদের আলসেমি ও অনিয়মানুবর্তিতাতে এক একজন দার্শনিক বনে গেছেন। তাঁদের হাঁটা দেখলে মনে হয় যে, তাঁদের কোনও গন্তব্য তো নেইই, থাকলেও সেখানে পৌঁছবার জন্যে আদৌ কোনও তাড়া নেই।

এই যে।

কে যেন পথ চলতে চলতে নানা চিন্তাতে বুঁদ হয়ে-যাওয়া চারণের ঘোর ভাঙালে।

এই যে! চারণবাবু।

চারণ চেয়ে দেখল, ভীমগিরি। বিড়ি কিনছেন বিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা সস্তা বাঁদুরে টুপি।

চারণ হাসল। বলল, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ভাল নয়।

তারপরেই নিজের পকেট খুঁজে বিড়ির সেই বাণ্ডিলগুলো বের করল। করে, ভীমগিরিকে দিল।

কেন? ভাল নয় কেন?

ভীমগিরি শুধোলেন।

ফুসফুসে ক্যানসার হয়, হার্ট অ্যাটাক হয়।

হলে?

মানুষ মরে যায়।

কোনও মানুষই কি আর চিরদিনের জন্যে ইজারা নিয়েছে জীবন, চারণবাবু? জন্ম-মুহূর্তেই যে সত্য সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা হল মৃত্যু।

ভীমগিরি বিড়িগুলো নিয়ে হেসে বললেন, সুক্রিয়া।

তারপর বললেন, মৃত্যু নিয়ে এত উদ্বেগ শুধুমাত্র ভোগী মানুষদেরই থাকে। আমার মতন একজন নগণ্য উদাসী যত তাড়াতাড়ি এই গরীব দেশের অন্নধ্বংস করা বন্ধ করি ততই তো মঙ্গল। এই ভাগীরথী, শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশ দিয়ে, এই ত্রিবেণী ঘাটের সামনে দিয়ে ঠিকই বয়ে যাবে। বসন্তর পরে গ্রীষ্ম আসবে, প্রতিবছরই, গ্রীষ্মর পরে বর্ষা, তারপরে শীত। ত্রিবেণী ঘাটও আজ সন্ধেরই মতন গমগম করবে রোজই, আমার মতন উদাসী, সাধু, সন্ন্যাসী ও পুণ্যার্থীদের ভিড়ে। দিনের বেলা দক্ষিণ বাহিনী আর রাতের বেলা উত্তর বাহিনী হাওয়া ঠিক এমন করেই বয়ে যাবে, যেমন করে বইছে যুগযুগান্ত ধরে। 'কড়োয়া চওথ'-এ এমনি করেই প্রদীপ ভাসাবে সালঙ্কারা বিবাহিতা মেয়েরা। কোনও কিছুরই কিছুমাত্রই পরিবর্তন হবে না। শুধু আমিই থাকব না। এই ঘাটটিকুও কারও চোখেই হয়তো পড়বে না।

তারপর একটু থেমে বললেন, চারণবাবু, জীবন নিরবধি চলছে, চলবে। মানুষের জীবন বড়ই ছোট। এখানে জলের উপরে নাম লিখতে এসেছি আমি। অগণ্য সাধারণ মানুষেরই মতন। আমার মৃত্যুতে মহাদেবের ওই পাথরের চতুষ্পদ নন্দীও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না। তাই বলছিলাম, বিড়ি খাওয়ার সামান্য সুখটুকু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব কেন?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, তাছাড়া, আমরা প্রত্যেকেই তো প্রাপ্তবয়স্ক। কেউই শিশু নই। তাই "এটা কোরো না", "ওটা কোরো না" কারওকে না বলাই ভাল। কথা তো কেউই শুনবে না অন্যের। মধ্যে দিয়ে আপনিই মিছিমিছি নিজের মান হারাবেন।

চারণের দুকান লাল হয়ে গেল। চুপ করে রইল ও।

ভীমগিরি বললেন, চলুন। আজ আমার গুরুর কাছে দুজন বিদেশি শিষ্য এসেছেন। তাঁরাই গুরুসেবা করছেন। তাই আমি আজ একটু ঘুরে-ঘারে গিয়ে ভজনে বসব।

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

বিদেশি শিষ্য মানে ? কোন দিশি ?

অস্ট্রিয়া।

তারপরই তিনি জিগ্যেস করলেন চারণকে, আপনি কি গেছেন সে দেশে ? দেশটা কোনদিকে ?

গেছি। দেশটা পশ্চিমে। ইউরোপেরই দেশ একটি আর কী ! টীরল বলে একটি প্রভিন্স আছে অস্ট্রিয়াতে। দারুণ। জেনারাল রোমেল-এর নাম শুনেছেন আপনি ? তিনি সেখানেই জন্মেছিলেন।

কে জেনারাল রোমেল ?

জার্মান জেনারাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন মরুভূমির যুদ্ধে যিনি বাঘা বাঘা ইংরেজ জেনারালদের, মন্টোগোমারি সুদ্ধ, একেবারে ঘোল খাইয়ে ছিলেন। জেনারাল রোমেলকে বলা হত 'ডেজার্ট-ফক্স'। মানে মরুভূমির শেয়াল। নাম শোনেননি ? তাঁর নাম শুনলেই শত্রুপক্ষের সৈন্যদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত।

তাই ? নাঃ। শুনিনি।

হেসে বললেন, ভীমগিরি।

তারপরই বললেন, আমি শুধু একজন জেনারালেরই নাম শুনেছি। এ পৃথিবীর সব দেশে কত শয়ে শয়ে জেনারাল আছেন। সকলকে জানার সময় কোথায় ? প্রয়োজনই বা কি ? এই ছোট জীবনে একজনকে জানাই যথেষ্ট। তাঁর নামেই এ ভবতরী পার হয়ে যাব। তারপরে একটু থেমে বললেন, আপনাদের গোলমালটা কোথায় জানেন ?

কোথায় ?

আপনারা বড় বেশি জানেন। অত কিছু জানার প্রয়োজন নেই কোনও।

তাই ?

তা নয়তো কি ? জ্ঞান হলেই তো হল না, জ্ঞান তো হজমও করা চাই। গরু-ছাগলেও জাবর কাটতে জানে, শুধু জানল না মানুষে। ভাবলেও বড় অবাক লাগে।

কে তিনি ? মানে আপনার সেই একজন ?

ধিয়ানগিরি মহারাজ। আর কে আমার জেনারাল ? আমার গুরু।

বলেই, আবার হাসলেন।

এখানে সিদ্ধি পাওয়া যায় ?

প্রসঙ্গ বদলে, চারণ বলল।

সিদ্ধিলাভের জন্যেই তো এত মানুষের এখানে আনাগোনা। কেউ কেউ অবশ্যই পায়।

আহা ! সে সিদ্ধি না। মানে, খাওয়ার সিদ্ধি।

ও বুঝেছি। ভাঙ্গ এর কথা বলছেন ? অবশ্যই পাওয়া যায়। তা আপনি গুলি খাবেন, না সরবত ?

গুলি কখনও খাইনি। দশেরার দিনে সরবত খেয়েছি কয়েকবার।

সরবতই যখন খাবেন তো আমি নিজে হাতে বানিয়ে দেব। দোকানের সরবত ভাল নয়।

কোথায় বানাবেন ?

আমার ডেরাতে নিয়ে যাব।

আপনি তো ওই চাতালেই থাকেন। ডেরা আবার কোথায় আপনারা ?

এতদিন তাই ছিলাম। কাল রাত থেকেই উঠে গেছি ডেরাতে। পরশু থেকেই শীতটা বড় জাঁকিয়ে পড়েছে। বিস্ত ডাগদার বলেছেন আমার ব্লাড প্রেসার নাকি লো, তাই ঠাণ্ডা বেশি লাগে। তাছাড়া, সাইনাসাইটিস না কি রোগ, তাও আছে আমার। ঠাণ্ডা সয় না বেশি।

তাই ?

হ্যাঁ।

আর আপনার গুরু ?

www.MurchOna.com

গুরু আমার সিদ্ধপুরুষ। তিনবছর এই নদীতেই গলা অবধি ডুবিয়ে নাঙ্গা হয়ে বসেছিলেন।

বলেন কি ? কবে ? শীতেও ?

চমকে উঠে বলল, চারণ।

হ্যাঁ।

সে বহুদিনের কথা। সব ঋতুতেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা। লাগাতার তিন বছর।

কেন ?

নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে। শরীরটা যে কিছু নয়, মনটাই আসল, এই জানাকে ধ্রুব করার জন্যে।

চারণ অবাক হয়ে গেল। ভাবল, এমনিতেই বেঁচে থাকতে কতরকম কষ্ট। তাতেও কুলোল না! নিজেকে আরও কষ্ট দেওয়া! এখনও পুরো শীত আসেনি তবুও নিজে ও এই বরফ-গলা নদীতে পনেরো মিনিটও থাকতে পারবে না। আর তিন বছর ?

তারপরই মনে মনে ভাবল, এসব গাঁজাগুল। সত্যি হতেই পারে না। এ সব করা হিউম্যানলি ইম্পসিবল। এ কথা সত্যি হওয়ার পেছনে কোনওই যুক্তি নেই। এঁরা নিজেরা গাঁজা খান বলে তো আর চারণ গাঁজা খায় না যে যা-ই শুনবে অশিক্ষিত তীর্থযাত্রীদের মতন তা-ই বিশ্বাস করবে ?

ভীমগিরি বললেন, যা ভাবছেন, তা নয়।

চমকে উঠে চারণ বলল, কি ভাবছি ?

যা ভাবছেন।

তারপরই বললেন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

বলেই, একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এই বাক্যটি এর আগে বহু মানুষকে বহুবারই বলতে শুনেছে চারণ। ও নিজেও হয়তো বলেছে কখনও সখনও সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষিতে। কিন্তু আজ এই সন্ধেবেলাতে ত্রিবেণী ঘাটের পাশের গলিতে দাঁড়িয়ে ভীমগিরির মুখ থেকে শুনে বুঝতে পারল যে, ওই বাক্যটি জানত ঠিকই কিন্তু তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানই ছিল না। বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস কলকাতাতে নিছকই দুটি শব্দ মাত্র। কিন্তু হৃষীকেশের এই ত্রিবেণী ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে শব্দ দুটির যে কী তাৎপর্য তা যেন বুঝতে পারছে একটু একটু।

চলুন এগোই। আজ আবার মাদ্রীও এসে বসে থাকবে।

মাদ্রী! মাদ্রী কে ?

চেনেন না ? সেই যে গুরুবহিন আমার। আমার কাছে এসে কথা বলল না সেই রাতে ? দেখেছেন নিশ্চয়ই, মনে নেই আপনার ?

হবে।

স্বগতোক্তি করল চারণ। আসলে মনে ঠিকই ছিল। সেটা দেখাতে চাইল না।

চলতে চলতে ভীমগিরি বললেন, আমাদের এই সব হঠযোগ নিয়ে পশ্চিমী দেশে অনেক হাসি-তামাশা করা হয় বলে শুনেছি। কলকাতা বম্বে দিল্লির মতন বড় বড় শহরেও আপনাদের মতন ইংরেজি-নবীশেরাও করে থাকেন যে, তাও জানি। তাতে আমার গুরুর মতন যোগীর কিছুমাত্রই এসে যায় না অবশ্য। শুধু অঙ্গারই জানে, আগুনের মাহাত্ম্য। যারা আগুন পোহায়, আগুনে শুধু উষ্ণতাই খোঁজে, তারা আগুনের স্বরূপ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে। সকলকেই সব কিছু জানার জন্যে মাথার দিব্যিই বা কে দিয়েছে কাকে!

বলেই, একটি বিড়ি বের করে বলল, নিন, বিড়ি খান একটি। তারপরই বলল, এইরকম তিনবছর জলে ডুবে ছিলেন দুধাহারী বাবাও। হরিদ্বারে।

কি নাম ?

দুধাহারী বাবা। শুধু দুধ খেয়ে থাকতেন তাই নয়, তাঁর আশ্রমে আজও যেই যায় তাকে হয় দুধ, নয় লস্যি বিতরণ করা হয় বিনামূল্যে।

www.MurchOna.com

তিনি কি বেঁচে আছেন ?

না, গত হয়েছেন বহুদিন হল ।

আমি যে এনেছিলাম, সেই বাণ্ডিলগুলো থেকে খেলেন না বিড়ি ?

চারণ বলল ।

আপনি এনে দিয়েছেন তো বটেই । সবসময়েই 'আমি' 'আমি' করবেন না । আমিত্বকে পুরোপুরি মাটি চাপা দিতে হবে । এই প্রথম পাঠ । আমার এই বিড়ি সে বিড়ি নয় । এতে গাঁজা আছে । খেয়ে দেখুন ।

গাঁজা খেলে কি হবে ?

চিন্তিত গলাতে বলল চারণ ।

তাজা হবেন আর কী ! খেলে, মনের গ্রহণ ও প্রেরণ শক্তি বেড়ে যাবে, বৃষ্টির পরে প্রকৃতির যেমন হয় । আপনাদের বিলিতি মদের চেয়ে অনেকই ভাল । পশ্চিমী দেশের নেশা মাত্রই উত্তেজনা বাড়ায় । আর আমাদের নেশাকে, ঠিক নিস্তেজক বলব না, বলব এ নেশা নির্লিপ্তি আনে । গাঁজা বা ভাঙ্গ খেয়ে কেউ কারোকে ধর্ষণ করেছে এমন কি শুনেছেন কখনও ? খুনোখুনি করেছে ? কিন্তু মদ খেয়ে অনেকেই করে । করে কি না বলুন ?

হ্যাঁ । কাগজে তো প্রায়ই দেখি তেমন খবর ।

গাঁজা খেলে না কি বিশেষ কোনও কোনও ক্ষমতা বাড়ে ।

বাড়ে কি না বলতে পারে তেমনই মানুষ, যার দুরকমের অভিজ্ঞতাই আছে । অর্থাৎ, খেয়ে এবং না খেয়েও যে··· । বলব বলব, সে সব কথা হবে এখন । এবারে একটু পা চালিয়ে চলুন দেখি চারণবাবু ।

দূর থেকে আলো-ঝলমল ত্রিবেণী ঘাট দেখা যাচ্ছিল । মাইকে ভজনের আওয়াজ ভেসে আসছিল । এত স্ত্রী পুরুষ, দেশ-বিদেশের কত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা, কেউ ঘাটের দিকে যাচ্ছেন, কেউ ফিরে আসছেন । কেউ হাসিখুশি, কেউ বিমর্ষ । দ্রুতধাবমানা দীপমালা বুকে-করা গঙ্গা অন্ধকারে কতজনের সুখ দুঃখ বয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে হর-কি-পউরির দিকে ।

ঘাটের কাছে এলেই মনটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যায় । কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও দেখেছে যে এমনটি হয় । ভক্তি বা বৈরাগ্য বা ভীমগিরি সন্নিসীর ভাষায়, 'উদাসীনতা' (নিজেকে উনি 'উদাসী' বললেন আজ ।) সম্ভবত কোনও বিশেষ স্থানের দান নয় । তা থাকে এক-একজনের অন্তরেরই মধ্যে । কোনও বিশেষ স্থান সেই ভাবকে উদ্দীপ্তই করে মাত্র ।

দেখল, চাতালের সেই কোণে দুজন লম্বা শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সাদা ধবধবে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ধিয়ানগিরি মহারাজের সামনে বসে আছেন জোড়াসনে । একজনের হাতে ফাইফ-ফাইফ-ফাইভ সিগারেটের খোলা-প্যাকেট, দুহাতে ধরে বাবাকে নিবেদন করছেন । অন্য জন, গাঁজার কলকে সেজে বাবার জন্যে ধরে আছেন । নিবেদন করবেন বলে স্থির । ধিয়ানগিরি মহারাজ যেন ধন্দে পড়েছেন আগে কোনটির সেবা করবেন তা নিয়ে । পাশেই, ভীমগিরির সেই গুরুবহিন মাদ্রী দাঁড়িয়ে আছে । আজ একটা লাল শাড়ি পরেছে মাদ্রী, সাদা ব্লাউজ । দেখে মনে হচ্ছে যেন তামাকের টিকেতে আগুন লেগেছে । কিন্তু মাদ্রীর গায়ের কালোরঙের কথা কারোরই মনে থাকবে না, তার সাদা দাঁতের হাসি একবার দেখতে পেলে । ওই হাসি দেখলেই বোঝা যায় যে ও সাধারণ নয়, হয় 'উদাসী' নয় 'সন্ন্যাসিনী' । গৃহী মানুষী অমন হাসি হাসতে পারে না । চারণ লক্ষ করল যে, আজও মাদ্রীর মাথাতে ফুল । আজকে বেণী বাঁধেনি, খোঁপা করেছে । মুখে বিন্দুমাত্র প্রসাধন নেই তার, সারল্য আর বুদ্ধির প্রসাধন ছাড়া ।

ভীমগিরিকে তার ভালই লেগেছিল । কিন্তু এখনও তাঁর গুরু ধিয়ানগিরি সম্বন্ধে কিছুমাত্রই ব্যক্তিগতভাবে না জেনে তাঁকে ভাল বা মন্দ কিছুই এখনও লাগেনি । পরের মুখে ঝাল খাওয়া স্বভাব নয় চারণের । মানুষটি তার দিকে তাকিয়েছেন, ভীমগিরির পাশে বসে সেই রাতে অনেকক্ষণ যে

www.MurchOna.com

চারণ গল্প করেছে তাও লক্ষ করেছেন। কিন্তু তাতেই ধন্য হয়ে যাবার মতন কিছু ঘটেনি চারণের। এখনও অন্ধভক্তি বা মূর্তি বা ব্যক্তি-পুজোর মতন বোকামি তাকে পেয়ে বসেনি। তবে এ কথা ঠিক, যতই দিন যাচ্ছে, চারণ এই অনুষঙ্গে, এই প্রেক্ষিতে বেশ এক মজা তো বটেই একধরনের সম্ভ্রমও যেন বোধ করতে শুরু করেছে। ধিয়ানগিরি তাকে পাত্তা দেননি। তারই বা কি দরকার পড়েছে তাঁকে পাত্তা দেওয়ার। ওর কোনও পাটন-পাটনির দরকার নেই।

হঠাৎ পাশ থেকে ভীমগিরি বললেন, 'জগৎ আমি-ময়, তাই না চারণবাবু ?

ভীষণ চমকে উঠল চারণ।

তারপরই একটু ভয়ও পেয়ে গেল। এই উদাসী ভীমগিরি তো উদাসী মাত্র নন। যাই চারণ ভাবুক না কেন সঙ্গে সঙ্গেই তা জানতে পেরে যাচ্ছেন এই সন্নিসী। যেন, কোনও মন্ত্রবলে।

চারণ মাথা নেড়ে জানাল, যে, তাই। জগৎ আমি-ময়।

ভীমগিরি বললেন, জানেন, এক ব্যাধ গেছিল এক অদৃষ্টপূর্ব সাংঘাতিক হিংস্র জানোয়ারকে মারতে, গ্রামবাসীদের অনুরোধে। সেই জানোয়ারকে গ্রামবাসীরাও দেখেনি কেউই। কিন্তু তাদের গ্রামের লাগোয়া-জঙ্গলে সেই প্রাণীর ভয়ংকর উপস্থিতি টের পেয়েছে তারা নানাভাবেই। ব্যাধ যখন খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে এক তালাও-এর পাশের নিবিড় বনের মধ্যে আলোড়নের শব্দ শুনল হঠাৎ, তখন সে বিষাক্ত তীর, ধনুকের ছিলাতে চড়িয়ে অতি সাবধানে এগোল সেদিকে। এগোতে এগোতে যখন সেই ভয়ংকরের খুবই কাছে পৌঁছে গেল তখন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সেই জানোয়ার। ব্যাধ চমকে উঠল নিজে, নিজেরই গলার স্বর শুনে। তারপরই দেখতেও পেল। তার নিজেরই চেহারা, তাকেই। তবে ভয়াবহ, রোমশ, পৃথুল, বিকটদন্তী, কোনও প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক জন্তুরই মতন।

জন্তু বলল, মারবি কাকে ? আমি বাইরের কেউ নই, আমি তোরই অন্তরবাসী। আমিই তুই। তোকে কাছে আনবার জন্যেই আমি গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে ছিলাম। তীর খুলে নে ছিলা থেকে। নিজেকে শাসন কর, শোধন কর, তোর অন্তরের জানোয়ারকে, শৃঙ্খলাবদ্ধ কর, তাহলেই আমার মৃত্যু হবে। তোর মধ্যে যে-আমি আছি, সেই-আমিকে গলা টিপে মেরে ফেল। যদি মানুষের মতন মানুষ হয়ে বাঁচতে চাস।

চারণ বলল, এ গল্প আপনি কোথায় পড়েছেন ?

কোথাওই পড়িনি। গুরুর মুখে শোনা। গুরু কোথায় পড়েছেন তা গুরুই বলতে পারবেন। পড়াশুনা আমি আর কতটুকু জানি। আমার যতটুকু শেখা, সবই গুরুমুখী।

ভীমগিরি মাদ্রীর কাছে চলে গেলেন।

চারণ কিছুক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে কী এক অপ্রতিরোধ্য টানে ধিয়ানগিরির কাছে পৌঁছেও তাঁর একেবারে সামনে গেল না। বুঝল, তার ভিতরের জন্তুটা তখনও একটুও দুর্বল হয়নি। সে ওই অস্ট্রিয়ান ছেলে দুটির পেছনে চাতালে বসে ঘাটের দিকে চেয়ে রইল যেন ও ধিয়ানগিরির প্রতি আদৌ মনোযোগী নয়। তবে কান দুটি খাড়া করে রাখল, আধো-শোয়া আধো-বসা উবু হয়ে থাকা অতি সাধারণ চেহারার সেই সন্নিসীর মুখনিঃসৃত কথা শোনার জন্যে।

এই অস্ট্রিয়ান যুবক দুটিও কি হিন্দি জানে ! তাদের বয়স চারণের চেয়ে পাঁচ-ছ-বছর কম হবে হয়তো। আরও কম হতে পারে। পশ্চিমদেশের আর পর্বতবাসীদের বয়স চট করে বোঝা যায় না।

গাঁজা-দেওয়া বিড়িটা খেয়ে বিশেষ কিছু যে মনে হল এমন নয়, তবে এক অভূতপূর্ব বোধ জাগতে লাগল ধীরে ধীরে। ভীমগিরি যেন বুঝতে পেরেই হঠাৎই উদয় হয়ে আর একটি বিড়ি দিয়ে গেলেন চারণকে। ছোট হয়ে-আসা প্রথম বিড়িটি থেকে চারণ দ্বিতীয় বিড়িটি ধরিয়ে নিল।

ছেলে দুটির মধ্যে একজন, যে, চাতালের উপরে কিন্তু ঘাটের দিকে বসেছিল, ইংরেজিতে বলল, গুরুজি, আপনি বললেন, Religion মানে "A force which binds together". কিন্তু হিন্দুধর্মর বাঁধন এমন আলগা হয়ে গেছে কেন ? এইরকম ধর্মস্থান ছাড়া হিন্দুধর্ম যে বেঁচে আছে তাই তো বোঝা যায় না। আমাদের মতে, মানে আমরা দেখি এদেশে এসে, ইসলামের বাঁধন, ধর্ম হিসেবে,

www.MurchOna.com

অনেকই দৃঢ়, অনেকই সহজ গোচর। প্রতি শহরে এবং গ্রামেও আমাদের ঘুম ভেঙে যায় আজানের শব্দে। অধিকাংশ মুসলমানই দিনে পাঁচবার না হলেও দুবার অন্তত নামাজ পড়েন। ধর্মাচরণ করাটা (Rituals) শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই কমবেশি কর্তব্য বলে মনে করেন দেখি অথচ শিক্ষিত হিন্দুরা ধর্মাচরণকে ছোট চোখে দেখেন। আপনি কি বলেন ? এটা কি হিন্দুধর্মের দৌর্বল্য বা হীনতা ?

কথাবার্তা সবই হচ্ছিল ইংরেজিতেই। চারণের নেহাত বিদেশিদের সঙ্গে নিত্য ওঠা-বসা ছিল, নিজেও একসময়ে পড়াশোনাও করেছিল ইংল্যান্ডে। তাই অস্ট্রিয়ান ছেলেটির ইংরেজি উচ্চারণ বুঝতে তার কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু ও অবাক হয়ে যাচ্ছিল ভিখিরির চেয়েও গরিব, প্লাস্টিকের নোংরা চাদরের চাঁদোয়ার নীচে কুঁজো হয়ে বসে, অ্যালুমিনিয়ামের খালি-দুধের বাসনের গায়ে তাল দিয়ে গুনগুনিয়ে গান-গাওয়া এই ধিয়ানগিরি সন্নিসী কী করে এইরকম অ্যাকসেন্টের ইংরেজি অতি সহজে বুঝছেন !

বুঝছেন যে, তা বুঝল তাঁর উত্তর শুনেই।

ধিয়ানগিরি যখন মুখ খুললেন, মিটিমিটি হাসতে হাসতে, তখন চমক লাগল চারণের তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনেও। শুদ্ধ অক্সোনিয়ান উচ্চারণে কথা বলছেন ধিয়ানগিরি মহারাজ। যে উচ্চারণের কথা আজকের তেল-সাবান টিভি ভিসিআর বিক্রি করা 'ভারতীয় ইংরেজি'-বলা, অধিকাংশ অ্যাড-এজেন্সির সর্বজ্ঞরা অথবা তাঁদের মক্কেলেদের এক-লাখি দু-লাখি চাকরেরা কল্পনাতেও আনতে পারেন না।

খুবই লজ্জা পেল চারণ, নিজেরই কারণে। ভাবল, সাহেবরা পাত্তা দিচ্ছে, এ দেখে বা ধিয়ানগিরি দারুণ সাহেবি ইংরেজি বলছেন বলেই কি তার মনে সম্ভ্রম এল সন্নিসী সম্বন্ধে ? ছিঃ। ছিঃ। ছিঃ।

হতেও পারে। ইংরেজরা এদেশে থাকাকালীন ওদের উপরে যতখানি প্রভুত্ব করতে পেরেছিলেন, তাঁরা চলে যাবার পঞ্চাশ বছর পরে সেই প্রভুত্ব আরও অনেকই বেশি দৃঢ় হয়েছে। তবে তার প্রকৃতি পালটে গেছে। উইনস্টন চার্চিল কবরের মধ্যে শুয়ে তাঁর বিদ্রূপাত্মক হাসিটি হয়তো সমানে হেসে চলেছেন। উনি বলেছিলেন যে, এই অসভ্য বর্বর মানুষেরা (ভারতীয়রা) নিজেদের স্বাধীনতার যোগ্য করে তোলেনি এখনও।

কে জানে। হয়তো তিনি ঠিকই বলেছিলেন। স্বাধীনতার যোগ্যতা যদি চারণদের সত্যিই থাকত তাহলে পঞ্চাশ বছরে দেশের অবস্থা এইরকম করে তুলত না। হয়তো নিজেদের স্বরাজ এমন নৈরাজ্যে এসে পৌঁছত না।

পরক্ষণেই অস্ট্রিয়ান শিষ্যর কঠিন প্রশ্নর উত্তরে ধিয়ানগিরি কি বলেন তা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল চারণ সমস্ত মনোযোগ সেদিকে দিয়ে।

ধিয়ানগিরি হেসে বললেন, সব ধর্মেরই বাহ্যিক রূপটি একরকম নয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে বললেন, তুমি কি আমাদের ফল্গু নদী দেখেছ ? গৌতম বুদ্ধ যেখানে বোধিলাভ করেছিলেন সেই বোধগয়ারই পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফল্গু। অন্তঃসলিলা।

সাহেবরা সমস্বরে বলে উঠল ইয়েস ইয়েস, নিয়ার গায়া।

ধিয়ানগিরি হাসলেন। উনি জানতেন যে গয়াকে ওরা গায়া উচ্চারণ করবে।

তারপর বললেন, সে নদীর দুটি শাখা নদীও আছে। নাম, জাঁম আর ইলাজান।

দ্বিতীয় শিষ্য বলল, জাঁম। অদ্ভুত নাম তো।

অদ্ভুত নয় বেটা। আমাদের দেশ মস্ত দেশ। বহু ভাষাতে কথা বলে এখানে মানুষ। অধিকাংশ মুসলমানের ভাষাই হল উর্দু। জাঁম শব্দটা একটি উর্দু শব্দ।

জাঁম মানে কি ?

এক শিষ্য প্রশ্ন করল।

ধিয়ানগিরি হাসলেন।

কাছ থেকে তাঁর হাসি দেখে চারণ এই প্রথমবার বুঝল যে, এই ব্যক্তিটির সঙ্গে তার অনেকই

www.MurchOna.com

অমিল। এমন সরল পবিত্র হাসি বহুকাল দেখেনি কারওকেই হাসতে।

উনি হেসে বললেন, "জাঁম মানে, পানপাত্র।" বিখ্যাত এক মুসলমান কবির কবিতা আছে :

"অ্যায়সা ডুবাহুঁ তেরী আঁখো কি গেহরাইমে,
হাত মে জাঁম হ্যায়, মগর পীনেকি হোঁস নেহি।"

চারণ মুগ্ধ হয়ে গেল এবারে ধিয়ানগিরির উর্দু উচ্চারণ শুনেও। যদিও মানেটা সাহেবের ঠিক বোধগম্য হল না।

তারপরই বললেন, Hinduism, as a religion is like that river. River Falgu. It is not apparent. The water flows Beneath the sands Unseen.

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, You have to scratch a Hindu to find Hinduism in Him.

অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ফল্গু নদীরই মতন অন্তঃসলিলা। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না যে, আছে।

তারপর ধিয়ানগিরি গাঁজার কল্কেতে একটান দিয়ে কিছুক্ষণ দম আটকে রেখে তারপর ধুঁয়ো ছেড়ে বললেন, এই ধর্মের আচার-আচরণ, রেজিমেন্টেশান, অন্য ধর্মের চেয়েও অনেক কম দৃশ্যমান কিন্তু ফল্গুর বালি খুঁড়লেই তবেই যেমন জল বেরোয় তেমনই কোনও শিক্ষিত ইংরেজিনবীশ, ধর্মে আপাত-অবিশ্বাসী উচ্চমণ্য হিন্দুকে খোঁচাখুঁচি করলে হিন্দুত্ব যে নিহিত আছে তার চামড়ার নীচে, তখনই তা বোঝা যাবে।

এ কথা কেন বলছেন ? একটু বুঝিয়ে বলুন।

প্রথম শিষ্য নিজের কল্কেতে টান দিয়ে বললেন।

বলছি, এ জন্যে যে, এটাই সত্যি। আজকের অর্ধশিক্ষিত, দাম্ভিক, স্বাভাবিক বুদ্ধিরহিত অগণ্য ধর্ম-বিশ্বাসহীন আধুনিক হিন্দুদেরও কানে যখন মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা, ফুলের আর ধূপ-ধুনোর গন্ধ, তাদের সদ্য-স্নাতা মা-ঠাকুমার লালপেড়ে গরদের বা তাঁতের বা মিলের শাড়ির গন্ধ স্মৃতি থেকে উঠে আসে নাকে, সেই সব পবিত্র, পাখিডাকা সকাল-সন্ধে, পুজোর ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে যখন ফিরে আসে তাদের মস্তিষ্কে, তাদের স্মৃতিতে, পরিযায়ী পাখিদেরই মতন বহুদূরের বিস্মৃতি ও পণ্ডিতম্মন্যতার কুয়াশা-ভেজা জলাভূমি থেকে, তখন তারা বুঝতে পারে এবং বোঝেও যে, ঈশ্বরবাদ যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হয় (তারা 'প্রমাণ' বলতে যা বোঝায়) তবে নিরীশ্বরবাদও সমানভাবেই প্রমাণ সাপেক্ষ। ধর্ম মানা বা ধার্মিক হওয়ার মধ্যে কোনওই লজ্জা নেই। সে ধর্ম, যে ধর্মই হোক না কেন। সে হিন্দু বলে তার লজ্জিত হওয়ারও বিন্দুমাত্র নেই, যদি না সে সর্বার্থে অজ্ঞ এবং কাপুরুষ হয়।

ধিয়ানগিরি অবশ্যই হুবহু এই ভাষাতে বলছিলেন না। তবে চারণ, অন্য কিছু না জানলেও ইংরেজিটা হয়তো ধিয়ানগিরির চেয়ে একটু ভালই জানে, তাই ধিয়ানগিরির বক্তব্য তার নিজের ভাষাতে ব্যক্ত করতে গিয়ে হয়তো একটু অন্যরকম করে ফেলল।

একটু চুপ করে থেকে আবার ধিয়ানগিরি বললেন, ইসলাম কি শেখায় জান ? শেখায়, আল্লা ছাড়া দ্বিতীয় কারও কাছেই মাথা নোয়াবে না। আমাদের হিন্দুধর্মও তাইই শেখায় : ঈশ্বর ছাড়া আর কারওকেই ভয় করবে না।

তবে, মাঝে মাঝেই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় এই দুই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আপনাদের ভারতে ?

বাঁদিকে বিদেশি শিষ্য জিগ্যেস করলেন।

সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই গুণ্ডা বদমাইস থাকে। মানুষ হিসেবে যারা বাজে। তাদের চেয়েও বড় বদমাইস সব ধর্মের রাজনীতিকেরা। শালারা সবাই গিধ্বড়। ধর্মাবলম্বীদের এক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ সব কালেই সব দেশেই ছিল, ক্রিশ্চান-ইহুদি, ইহুদি-মুসলিম, মুসলিম-হিন্দু কিন্তু কোনও ধর্মের সঙ্গেই অন্য ধর্মের বিরোধ নেই। কখনওই ছিল না। All Roads lead to Rome।

বলেই, হেসে, এমন এক টান লাগালেন তাঁর গাঁজার কল্কেতে যে, কল্কে প্রায় ফাটে ফাটে আর কী ! তারপর আবারও দম বন্ধ করে রইলেন, গাল ফুলিয়ে বেশ অনেকক্ষণ। চোখ দুটি লাল হয়ে

www.MurchOna.com

বড় হয়ে গেল। চোখের মধ্যেও যে শিরা আছে, থাকে, তা দৃশ্যমান হল।

দুই বিদেশি শিষ্য মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসে রইলেন গুরুর পায়ের কাছে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। তাঁদের মুগ্ধতার অনেকখানিই গুরুর বহুমুখী পাণ্ডিত্যর কারণে। আর কিছুটা এল গঞ্জিকা সেবনেরও ফলে। চারণ এখানে এসে পৌঁছবার ঠিক কতক্ষণ আগে থেকে তারা গুরু এবং গঞ্জিকার সেবা করছিল তা অবশ্য জানা ছিল না চারণের। তবে, খুব বেশিক্ষণ হবে না। সন্ধে তো হয়েছে মাত্র ঘণ্টা-খানেক ঘণ্টা-দেড়েক হবে।

চারণ উঠে পড়ল।

ভাবল, জ্ঞান আহরণ ভাল কিন্তু একসঙ্গে ডোজ বেশি হয়ে গেলে দলমা থেকে আসা পুরুলিয়ার বা মেদিনীপুরের Over-Tranqulaised বুনো-হাতিরই মতন বেঘোরে অক্কা পাবে। সবে গাঁজার নেশা জমেছে চারণের, গুরুর নেশাও। এখুনি সে মরতে চায় না আদৌ।

সে একটু তফাতে গিয়ে বসল চাতালে। গুরু আজও তাকে পাত্তা দিলেন না। সেও বিশেষ পাত্তা দিল না। পাত্তা দেবার মতন কিছু হয়ওনি। গুরু যত বড় মানুষই হন না কেন চারণকে তিনি ইম্পট্যান্ট মনে করলে তবেই চারণ তাঁকে ইম্পট্যান্ট মনে করবে।

আপাতত, তাঁর ভীমগিরিই ভাল।

মাদ্রী মেয়েটির মুখে সবসময়েই হাসি ঝুলে থাকে এবং একটি আলগা শ্রী-র সঙ্গে আলগা দীপ্তি, তার চুলের ফুলেরই মতন। এই দীপ্তিময়ী শ্রী, তার গায়ের রঙের কালিমাকে ধুয়ে-মুছে দিয়ে তাকে এক আশ্চর্য স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। প্রথম দর্শনেই মনে হয়েছিল চারণের যে, মাদ্রী যেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরণ্যকের ভানুমতী। রাজা দোবরু-পান্নার কন্যা, পথ ভুলে, লবটুলিয়া বইহার বা নাড়া বইহারের তৃণভূমি পেরিয়ে, মহালিখাপুরের পাহাড়ের মায়া কাটিয়ে, এই শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে প্রবাহিত পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর পাশে এসে থিতু হয়েছে। এখনও সে অবিবাহিতা। 'অতি বড় বরণী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর'। চারণের মা এই বাক্যটি বলতেন ওদের ছেলেবেলায়। মানেটা তখন ঠিক বোঝেনি, আজও বোঝে না। তবে আন্দাজ করতে পারে অবশ্যই।

মাদ্রী, ভীমগিরিকে ছেড়ে, সেদিন যেমন ঘাটের দিকে গেছিল, তা না গিয়ে বাজারের অলিগলির মধ্যে ঢুকে আলো-ঝলমল বহুবর্ণ কাঁচের দোকানের সারির মধ্যে তার লাল-শাড়ি পরে হারিয়ে গেল।

ভীমগিরি, চারণকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল, এবারে একটু ভজন করা যাক।

চারণ বলল, করুন। ভজন শুনব বলেই তো বসে আছি। আপনার গলাতে সপ্তসুর জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভীমগিরি লজ্জা পেয়ে বললেন, ছিঃ ছিঃ। আমি গান গাইতেই জানি না, সপ্তসুরই সুপ্ত এখনও। গান করেন আমার গুরু। যেদিন শুনবেন, সেদিন বুঝবেন।

ঠিক সেই সময়ে একজন সন্নিসী যেন শূন্য থেকেই উদিত হয়ে ভীমগিরির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার পথজুড়ে। তার পিঠের উপরে গোল করে পাকানো একটি চিতল হরিণের চামড়া। বেঁটে-খাটো, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারা। গায়ের রঙ কালো না হলে হুবহু ডিয়েগো মারাদোনা বলে চালিয়ে দেওয়া যেত অনায়াসে। তবে বয়স হয়েছে পঞ্চাশ-মতন। ভীমগিরি তাঁকে দেখেই ভজনের তোড়-জোড় ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন।

আগন্তুক বললেন, মেধানন্দ মহারাজ নেই?

মেধানন্দ?

প্রথমে অবাক হলেন, তারপরে একটু ভাবলেন ভীমগিরি।

তারপর বললেন, আমার গুরু হয়তো তাঁকে জানাতে পারেন। আমি তো তাঁকে জানি না। কোথায় থাকতেন তিনি?

এই ত্রিবেণী ঘাটেই।

কোন সময়ে?

www.MurchOna.com

তা বছর কুড়ি আগে হবে।

ভীমগিরি আগন্তুককে ধিয়ানগিরি মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। দূর থেকে, ধিয়ানগিরি মহারাজ এবং আগন্তুক সন্নিসীর মধ্যে কি কথা হল শুনতে পেল না চারণ ঘাটের গোলযোগের মধ্যে তবে দেখল যে, আগন্তুক ধিয়ানগিরির কাকের বাসার মতন বাসাটিরই অনতিদূরে খোলা আকাশের নীচে পিঠের মৃগচর্মটি বালির উপরে সমান করে পেতে নদীতে গেলেন আচমন করতে। একটু পরেই ফিরে এসে, ওই চিত্রল হরিণের চামড়ার আসনের উপরে পদ্মাসনে পশ্চিমে চেয়ে ধ্যানে বসলেন।

ভীমগিরি তাঁকে বসিয়ে দিয়ে, আবার চারণের কাছে ফিরে এলেন।

বললেন, বহু দূর থেকে আসছেন। সারাদিন অভুক্ত আছেন।

উনি কে ? এলেন কোথা থেকে ?

ওঁর নাম স্বামী পদ্মানন্দ, মেধানন্দ মহারাজের শিষ্য। মেধানন্দ মহারাজ নাকি সিদ্ধ-যোগী ছিলেন। আমার গুরু তাঁকে জানতেন। তবে তিনি এই ঘাটেই দেহ রেখেছেন আজ প্রায় দশ বছর হল। এখানের অনেক আগন্তুক সাধু-সন্তই তাঁর কথা জানেন না। পদ্মানন্দ এখন এসেছেন পউরি থেকে। কিন্তু থাকেন কুমায়ুঁ হিমালয়ের বিনসার-এ।

পউরি জায়গাটা কোথায় ?

গাড়োয়াল হিমালয়েই। তবে বেড়াবার জায়গা হিসেবেই বেশি পরিচিত।

ভীমগিরি বললেন, তেহরি-গাড়োয়ালে গেছিলেন কাজে। ফিরেও যাবেন আবার পউরি হয়েই, পাহাড়ে পাহাড়ে। সারাদিন খাওয়া দাওয়া করেননি। এদিকে সন্ধেও হয়ে গেছে। আজ আর কিছু খাবেন না। ধিয়ান সেরেই শুয়ে পড়বেন ভজন করে।

এসেছিলেন কেন ?

গুরু সন্দর্শনে।

ও।

বলল, চারণ।

তা উনি থাকবেন কোথায় ?

এই চাতালেও থাকতে পারেন। যদি অসুবিধে হয় তো নিয়ে যাব ওঁকে কালিকমলি বাবার আশ্রমে। গুরু আমাকে বলেই দিয়েছেন। আমি যখন ভজন করব তখন ওঁর উপরে একটু নজর রাখবেন তো। ধ্যান শেষ হলেই আমাকে তাঁর সেবা করতে হবে। গুরুর আদেশ।

সেবা ? এঁকে তো আপনি চেনেনই না। অচেনা মানুষকে, যাঁর প্রতি আপনার কোনও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই, তাঁকে সেবা করবেন ? মনের সায় পাবেন সেবা করার ?

নিশ্চয়ই।

কী আনন্দ পান এমন অপরিচিত আনজান মানুষের সেবা করে ? কি সেবা করবেন ?

আগে পদসেবা করব। কতদূর থেকে হেঁটে এসেছেন।

পুরোটা হেঁটে এসেছেন ?

না পুরোটা নয়। নরেন্দ্রনগর থেকে।

কেন ?

বাসভাড়া ছিল না, তাই।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

পদসেবা করবেন ?

হ্যাঁ।

বদলে কি পাবেন ?

ভীমগিরি হেসে ফেললেন।

www.MurchOna.com

তারপরে বললেন, আমার গুরু একটা কথা বলেন। বলেন, এখন না হয় টাকাপয়সার চল হয়েছে। মুদ্রা, কাগজের টাকা, কিন্তু মানুষের সভ্যতার গোড়ার দিকে যদি পেছনে হেঁটে যান তবেই মনে পড়বে যে তখন কারেন্সি ছিল না, "Legal Tender" বলতে আজকে আমরা যা বুঝি তা ছিল না।

আপনি "Legal Tender" শব্দের মানে জানেন ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

ভীমগিরি হাসলেন। বললেন একটু একটু জানি বই কী ! সব কিছুই কি আর বই পড়ে শিখেছি ? জীবনের পথে চলতে চলতে আপনাদের মতন অনেক মানুষের সঙ্গে মিশেছি, যেখানেই গেছি, ভাল ভাল গুরু পেয়েছি। আমি খুবই ভাগ্যবান বলতে হবে। আমার এক গুরু ছিলেন সাবারিমালাতে, তিনি ফিজিসিস্ট। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে ছিলেন। সন্নিসী হয়ে গেছেন।

সাবারিমালাটা আবার কোথায় ? এ জায়গার তো নাম শুনিনি।

দক্ষিণ ভারতের কেরালাতে। খুব উঁচু পাহাড়ের উপরে সে তীর্থ। এখানকার কেদার বদ্রীরই মতন বছরের এক বিশেষ সময়ে সেই তীর্থ করতে হয়। কালো পোশাক পরে পদব্রজে যেতে হয় সেখানে।

কালো পোশাক ?

হ্যাঁ। সকলেই কালো পোশাক পরে যেতে হয়। পুরো দক্ষিণাঞ্চল থেকে তামিল, তেলেগু, কন্নড়, সকলেই যান সেই তীর্থে। তবে মেয়েদের···

মেয়েদের যাওয়া বারণ ?

সব মেয়েদের নয়। যাঁরা রজস্বলা তাদের যাওয়া বারণ। ঋতুমতী হবার আগে অথবা ঋতুবন্ধ হওয়ার পরে যেতে কোনও বাধা নেই।

কদিন লাগে সেই তীর্থে, মানে তীর্থ শেষ করতে ?

নির্ভর করে। অনেকে পুরো পথটিই হেঁটে যান, পায়ে হেঁটে পাহাড়ে চড়েন, যেমন এখনও অনেকে যান কেদার-বদ্রীতে পায়ে হেঁটেই, অমরনাথে, কৈলাসে, মানস সরোবরে। পায়ে না হাঁটলে কি পৃথিবীকে জানা যায় ? নিজের মনের চালই খোলে না। মন গাঁটে-গাঁটে আটকে থাকে যে। না হাঁটলে পায়ের বাতেরই মতন মনের বাতও ছাড়ে না। একা পদব্রজে কোথাওই যাওয়াটা, উদাসী হতে হলে, খুবই দরকার।

আর সন্ন্যাসী হতে হলে ?

ভীমগিরি আবারও হাসলেন, একেবারে disarming হাসি।

বললেন, বলেইছি তো ! সন্নিসী বা সাধু সন্ত কি সকলের হওয়া হয়ে ওঠে চারণবাবু ? সারা জীবন সাধুসঙ্গে থেকেও অনেকেরই হওয়া হয়ে ওঠে না আবার অনেকে ঘনঘোরা ভয়াল সংসারের মধ্যে থেকে তার সব দাবি অবহেলে মিটিয়েও পংকের মধ্যে ডুবে থেকেও সন্ত হতে পারেন। পাঁকের মধ্যে বাস করেও পাঁক লাগে না তাঁদের গায়ে, পেঁকো গন্ধ থাকে না, তাঁরা পদ্মর মতন ফুটে থাকেন পাঁকেরই মধ্যে। আসল হল আধার চারণবাবু। আধারটাই আসল। আমার গুরু বলেছেন না, আপনার আধার ভাল।

চারণ লজ্জিত হল নতুন করে। একটু ভীতও হল। মাত্র কদিনের মধ্যেই সে কলকাতা থেকে এসে ক্রমশ এ কোন এক অন্য জগতে ঢুকে পড়ছে অনবধানে ? একের পর এক ঘটনা, একের পর এক অভিঘাত তাকে এ কোন অন্য নিয়তির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে, ও ঠিক বুঝতে পারছে না। এই অনুষঙ্গ, এই পরিবেশ, এই হৃষীকেশ, ত্রিবেণী ঘাট এসবই কি টানছে শুধু ? না, তাও বোধহয় নয়। ওর মনের ভিতরে বহুদিন ধরে যে শূন্যতা, যে অসারতা যে উদ্দেশ্যহীনতা বাসা বেঁধেছিল তাই ত্বরান্বিত করছে তার এই তাড়াতাড়ি বদলে যাওয়াটাকে।

যা বলছিলাম, ভীমগিরি বললেন। বলছিলাম, গুরু বলেছিলেন, আগে মানুষে Barter System এ জিনিস দেওয়া-নেওয়া করত। Currency বা সোনা রুপো বা তামার মুদ্রাও ছিল না তখন। তাই

www.MurchOna.com

তো। ছিল কি ?

না। কিন্তু কি বলতে চাইছেন আপনি ?

চারণ বলল, একটু অধৈর্য হয়ে। হয়তো একটু বিরক্তিরও সঙ্গে।

বুঝলেন না, কি বলতে চাইছি ?

না।

সভ্যতার গোড়াতেও মানুষের দেনা-পাওনার জ্ঞানটা আজকের মতনই টনটনে ছিল। লেন-দেন এর। তুমি নুন দাও তো আমি বদলে চাল দেব। আমি হাঁসের ডিম দিচ্ছি তুমি খাম আলু দাও বদলে। তার মানে কি ? মানে, কোনও কিছুই আমরা দেওয়া-নেওয়া করতে শিখিনি নিজেদের স্বার্থ-ছাড়া। আর Barter ই বলুন, Shopping ই বলুন এই দেওয়া-নেওয়ার তাগিদই তো আমাদের চালিত করে ! আজকের পৃথিবীর যা-কিছু ক্রিয়া-কাণ্ড দৌড়ো-দৌড়ি দেখেন এর সবই তো এই দেওয়া-নেওয়া লেন-দেনে নিজে কতটা বেশি লাভবান হওয়া যায় এই জন্যেই। আমার কত বাড়ল Profit? এই তো এখন একমাত্র সাধনা। না কি ?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার গুরু প্রথম দিনে, যেদিন আমাকে চেলা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আমাকে বলেছিলেন, তুই যে আমার সেবা করতে এসেছিস ? কি জন্যে ? কিসের লোভে ? কী পাবি তুই ?

আত্মার শান্তির জন্যে, উন্নতির জন্যে।

আমি বলেছিলাম।

তোর মাথা।

গুরু বলেছিলেন।

তারপর বলেছিলেন, এ সংসারে কেউ কারওকে কিছুই শেখাতে পারে না। যারা বলে যে পারে, তাদের ঘামণ্ড যায়নি এখনও। আর যারা বলে যে, তারা অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারে, তাদেরও ঘামণ্ড সবে তৈরি হচ্ছে। কান খুলে শুনে রাখ যে, আমি তোকে কিছুই শেখাব না, কোনও জ্ঞানই দেব না। কারওকে বিলি করার মতন জ্ঞান নেইও আমার। অন্য দশজন মানুষেরই মতন তোর ভিতরে যে এঞ্জিনটা আছে, যা নিরন্তর জ্ঞান তৈরি করে জনমাবধি নিজের ভেতরে, সে যদি তা তৈরি করে নিতে পারল তো পারল, নইলে অন্যে কেউই তোকে কিছুই দিতে পারবে না। তুই শুধু দিয়েই যাবি, পদসেবা করবি, গাঁজা সেজে দিবি, অসুস্থ হলে আমার শুশ্রূষা করবি। হাঁসের ডিম দিবি, খাম আলু দিবি, নুন দিবি, চাল দিবি কিন্তু বদলে চাইবি না কিছুমাত্রই। চাইলেও, পাবি না আদৌ। কিছু দিয়ে, বদলে যদি কিছুমাত্রও চাস তাহলে তোর দেওয়াটা দান আর রইবে না, বিনিময় হয়ে যাবে। 'Barter', 'Exchange', 'বাণিজ্য'। হৃদয়ের গোড়া থেকে এই লেনদেন এর ব্যাপারটা, সংজ্ঞাটাকেই তোর একেবারে নির্মূল করে মুছে ফেলতে হবে। বদলে কিছুমাত্রই না চেয়ে।

এতকথা যে ভীমগিরি একনাগাড়ে বলে গেলেন ঠিক তা না। ধীরে ধীরে, ধুনির আগুনের কাঠের অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস, কাঠের জ্বলে-ওঠার অস্ফুট শব্দ, আগুনের ফুলকির ঊর্ধ্বপানে উঠে নিঃশব্দে মিলিয়ে যাওয়ারই মতন করে বললেন, আলতো করে। আমাকে শোনাবার জন্যেও নয়, যেন স্বগোতোক্তিই করছেন, এমনইভাবে।

ভারী ভাল লাগল চারণের। Shopping এর জীবন যে জীবন নয়, Barter এর জীবনও যে জীবন নয়, জীবনের এই এক সম্পূর্ণ অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য নতুন ব্যাখ্যা ওকে বুঝতে শেখাল, ঠিক বুঝতে নয়, অনুভব করতে শেখাল, কেন এত আধন্যাংটো মানুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ও শিক্ষিত, ভারতের বিভিন্ন জায়গার সব মানুষ, সারা দেশের এই ত্রিবেণী ঘাটেরই মতন অগণ্য ঘাটে, দুর্গম অরণ্যে, পর্বতে, কন্দরে, গিরি গাত্রে, মরুভূমিতে, নির্জন নদীর মধ্যের নির্জনতম দ্বীপে, বছরের পর বছর এমন কি সারা জীবনও অবহেলে কাটিয়ে দেন, কারও কাছে কিছুই বিন্দুমাত্র না চেয়েও।

এমন সময়ে হঠাৎই দূরের এক শেঠের বাড়ির কোনও আলোকোজ্জ্বল উৎসবের প্রাঙ্গন থেকে অ্যামপ্লিফায়ারে জোরে ভেসে এল মাধুরী দীক্ষিতের লিপ-দেওয়া সেই গান : টুক টুক টুক টুক টুক

www.MurchOna.com

টুক, চোলি কা পিছে ক্যা হ্যায় ? মেরী চুনরী কি পিছে কেয়া হ্যায় ?"

দ্য সঙ অফ দ্য টাইম।

এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল চারণ চাটুজ্যের মুখে।

"চোলিকে পিছে ক্যা হ্যায়" তা যেন এই প্রথমবার বুঝতে পারল ও। সাচমুচ। শুধু পৃথিবী-বিখ্যাত আর্টিস্ট এম এফ হুসেইন এর বন্দিত সুন্দরী নায়িকার চোলিকা পিছেই নয় শুধু এই পৃথিবীর আপামর নারী এবং নারীর হৃদয় আর মস্তিষ্ককে আড়াল করে যা-কিছুই আছে, তার সব কিছুরই অপার অসারতা তাকে আবিষ্ট করে ফেলল যেন।

সে রাতে মন্দাকিনী হোটেলের দিকে ঠাণ্ডার মধ্যে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিল যে, ভীমগিরিও নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষিত। পূর্বাশ্রমের কাহিনী তিনি মিথ্যে করে বলেছিলেন সম্ভবত চারণকে। মহারাষ্ট্রের এক গ্রামের স্কুলের ছাত্রর পক্ষে Barter, Currency এবং অর্থনীতির গোড়ার এসব কথা, ডিম্যান্ড-সাপ্লাই এবং লেনদেনের ব্যাপার-স্যাপার এমন প্রাঞ্জলভাবে শুধু নিজেই বোঝা নয়, অন্যকেও বোঝানো বড় সহজ কথা নয়।

অনেকের উপরেই অনেক রাগ এবং অভিমান নিয়ে চারণ পথে বেরিয়েছিল। এখন দেখছে, সে ঠিক করেনি। না, পথে বেরোনোটা ঠিকই হয়েছিল কিন্তু দশজনের উপরে রাগ এবং অভিমান করাটা আদৌ ঠিক হয়নি। ও যেন হঠাৎই ক্ষমা করতে শিখছে এবং যেন পারছেও একটু একটু।

এই কথা ভেবেই ওর ভারী আনন্দ হল।

জয়িতাকে ও যতটুকু দিয়েছিল তার চেয়ে সম্ভবত অনেকই বেশি চেয়েছিল, আশা করেছিল, তার কাছ থেকে। Barter-এ সেই জিততে চেয়েছিল। পচা ডিম দিয়ে রক্ত গোলাপের গুচ্ছ পেতে চেয়েছিল। হয়তো।

তখন রাত ন-টা বেজে গেছে। দেখল, পান্ধীদের সেই পরিবার তখন ঘন হয়ে বসে, সামনে ধুনী নয়, কাঠকয়লার উনুন জ্বেলে রুটি বানাচ্ছে। এবং উনুনেরই তিন পাশে গোল হয়ে পরিবারের পাঁচজনই বসে আগুন পোয়াচ্ছে। খুবই গরিব ওরা, বড় হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় ওদের। কিন্তু মুখে হাসির অভাব নেই। দুটি ছিন্ন ও মলিন রাজস্থানি রাজাই চৌপায়ার উপরে বিছানো আছে। শীতের মোকাবিলা আসলে ওরা করবে একে অন্যের শরীরের উত্তাপ দিয়েই। এই রাজাই দুটি শীতের সঙ্গে লড়াইএর অস্ত্র নয়, অজুহাত মাত্র।

তখন হঠাৎই জয়িতার কথা মনে হয়েছিল চারণের। জয়িতাকে এমনি বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে, কবোষ্ণ কল্পনাতে কত শীতের রাতই না কাটিয়েছে ! শুধুই কল্পনাতে। একা একা। আজ রাতে এই পান্ধী বিবাহিত যুবতীর মধ্যে ও যেন হঠাৎই জয়িতাকেই আবিষ্কার করল। ওর সুখই যেন জয়িতার সুখ।

ও দাঁড়িয়ে পড়ে পান্ধী পরিবারকে উদ্দেশ্য করে বলল, দিনের কাজ শেষ হল ?

বুড়ো বলল, হুঁ।

যুবকটি আর যুবতীটি খুবই ক্লান্ত ছিল সম্ভবত। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না ওদের, তবুও ওরা হাসল।

বুড়ি, শিশু নাতিকে বলল, এই তো দাদু রুটি পাকাচ্ছি। হয়ে গেলেই খাবে আর শোবে।

চারণ লক্ষ করল, নদীর খাত বেয়ে কনকনে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে শরীরের হাড় হিম করে।

কত কামালে আজ সারাদিনে ?

চারণ শুধোল।

পন্দ্রঁরো রুপাইয়া।

বুড়ো বলল।

বাসস ?

ঔর ক্যা বাবু ?

www.MurchOna.com

এতে তোমাদের এতজনের ডাল-রুটি হবে ?

খুবই।

বলে, হুঁকোতে ভুড়ুক ভুড়ুক টান তুলে এই মস্ত ভারতবর্ষের, চারণের সুন্দর দেশের, চারণের ভাইবোন ভারতবাসীর প্রতিভূ সেই বুড়ো বলল, কত পরিবার আছে, দিনে মাত্র পাঁচ টাকা কামায়। আমরা তো বড়লোক।

বলেই হাসল। দুঃখের হাসি নয়, সুখের হাসি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল চারণ।

বলল, মিথ্যে কথা বলছ তোমরা। তোমাদের কষ্ট নেই ?

কষ্ট কি নেই বাবু ? কিন্তু ওপরের দিকে চাইবার কি শেষ আছে ? আমরা নীচের দিকে তাকাই। নিজেদের কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হয় না। সত্যিই কষ্ট নেই বাবু। কোমর-ভাঙা মেহনত করে যা কামাই তাতে রোটি-ডাল তো হয়ে যায়। হারামের পয়সাতে খাই না বাবু, চুরির পয়সা বা ঘুষের পয়সা বা অত্যাচারের পয়সাতেও খাই না। বড়ই আনন্দ আমাদের। উপরওয়ালা যা দেন, দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। তুমি দেখো আমার এই নাতি একজন ইমানদার দেশোয়ালি হবে। ভারতের মুখোজ্জ্বল করবে এ একদিন।

নিশ্চয়ই করবে।

চারণ বলল।

উপরওয়ালা যা দেন তাই যথেষ্ট। কোনও খেদ নেই।

বুড়ো বলল।

চারণ তার হিপ-পকেট থেকে একটি একশ টাকার নোট বের করে ওদের দিল।

যুবতী বৌটির মুখে একটু চকিত ভয় দেখতে পেল যেন। নৃত্যরতা আগুনের শিখাতে সারসার সোনার গরাদ নেচে গেল তার মুখে। যুবকটির মুখে রাগ ফুটল, যদিও ক্ষণিক। বুড়ো কিন্তু চারণের মুখের দিকে একমুহূর্ত চেয়েই, টাকাটা দুহাতের পাতা মেলে পরম সম্মান দিয়ে নিল।

বুড়ি বলল, তুমি বিকেলে যাওয়ার সময়েও দাঁড়িয়েছিলে এখানে। আমার বহু...। আমরা ভেবেছিলাম তুমি মানুষটা খারাপ।

ভুল ভাবনি একটুও।

চারণ বলল।

যুবকটির মুখের মাংস আবার শক্ত হয়ে এল। চিবুক, রাগের বাহক হয়ে আকাশ পানে উঠল উদ্ধত হয়ে।

বুড়ো বলল, তাহলে ?

তাহলে কিছু নয়। যে-মানুষটা তখন এ পথ দিয়ে গেছিল সে হয়তো খারাপ মানুষই ছিল। পুরোপুরি খারাপ না হলেও পুরোপুরি ভালও নয়। কিন্তু যে-মানুষটা এখন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে ভাল মানুষ। বলতে পার, পুরোপুরিই ভাল। আপাতত।

তুমি কোথায় থাক ?

ছেলেটি জেরা করার গলাতে বলল।

চারণ বলল, আমি পরদেশী।

তুমি কে ?

এবার যুবতী বধূটি বলল।

চারণ হেসে বলল, আমি উপরওয়ালার দূত। কিছু কি বুঝলে বহিন ?

মেয়েটি অবিশ্বাসী গলাতে হেসে বলল, ততক্ষণে তার ভয় কেটে গেছে, উপরওয়ালার দূত কখনও এমন পোশাক পরে ?

চারণ বলল, তোমাদের উপরওয়ালা কি কারওকে দেখা দিয়েছেন ? আমি ঈশ্বরের অগণ্য দূতের মধ্যে একজন। টাকাটা তোমরা হাসিমুখে নিলে আমার খুব আনন্দ হবে, রাতে ঘুম হবে।

www.MurchOna.com

উপরওয়ালাও খুবই খুশি হবেন। নেবে তো ?

ওদের সকলের মুখে অবিশ্বাস-মাখা আনন্দের হাসি ফুটে উঠল।

চারণও হাসল।

ওরা বলল, ভগবান আপ কি ভালা করে গা।

চারণ চমকে উঠল। ভাবল, এও তো Barter-ই !

তাড়াতাড়ি বলল, না, না, আমি তোমাদের ভগবানের কাছে কিছুমাত্রই চাই না। তোমরা খুশি হলেই আমি সুখি। বিশ্বাস করো।

ওরা বিশ্বাস করল কি করল না তাতে চারণের বিন্দুমাত্র যাবে আসবে না। তার মুখনিঃসৃত কথা কটিতে চারণ নিজে যে একশভাগ বিশ্বাস করল এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

বরফ গলতে শুরু করেছে হিমবাহর। এখন সে কোনও শীতার্ত বা উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ সাগরে ভেসে যাবে। পরিযায়ী দুধলি রাজহাঁসের মতন মসৃণ গতিতে ভেসে যাবে কি না তা ঈশ্বর নামক অস্তিত্বহীন এই পাঙ্কীদের উপরওয়ালাই জানেন অথবা ভীমগিরি বা ধিয়ানগিরি মহারাজদের ঈশ্বর। ঈশ্বর বলে কোনও ব্যাটা আদৌ আছে কি নেই তা জানতেই ওর কলকাতা ছেড়ে-ছুড়ে হঠাৎ আসা এই অশিক্ষিত সাধু সন্ন্যাসীদের denএ। ব্যাপারটার শেষ দেখতে চায় ও।

মানে, এই নিরবধি কালের বুজরুকির।

বেশ ঠাণ্ডা আছে। মাঝরাতে ঠাণ্ডাতে ঘুম ভেঙে গেল একবার ওর। বারান্দার পুরোটাই কাচের স্লাইডিং-ডোর। দুটো কম্বলেও শীত করছে। কম্বল দুটি দিয়ে ভাল করে গলা ও ঘাড় আর কাঁধ ঢেকে পাশ ফিরে শুতে শুতে ভারী এক আনন্দে চারণের মন ভরে উঠল। পাঙ্কী পরিবারটির কথা মনে পড়ল। এমন সংরক্ষিত ঘরে যদি ওর এত শীত করে তবে ঐ অরক্ষিত পথে ওদের কত না শীত করছে, কে জানে। ভাবল, প্রয়োজন, আরাম, বিলাস এসব বাড়ালেই বাড়ে।

আজ হোটেলে ফেরার পথে, জীবনে এই প্রথমবার, বদলে কিছুমাত্রই প্রত্যাশা না করে, কারও জন্যে সামান্য কিছু করল ও। এমন নিঃস্বার্থভাবে কারও জন্যে একতরফা কিছু করার মধ্যে যে এত আনন্দ, দেওয়া-নেওয়ার নয়, শুধুই দেওয়ার আনন্দ, আগে সত্যিই জানত না।

শেষ রাতে একবার টয়লেটে গেছিল। বেরিয়ে, উষ্ণ বিছানাতে জোড়া-কম্বলের নীচে যাওয়ার আগে কী মনে হওয়াতে একবার বারান্দাতে এসে দাঁড়াল চারণ।

ঝরনার মতন শব্দ করে শেষ রাতের হাওয়া বইছে তীব্রগতি অথচ আপাত-স্থির নদীর উপর দিয়ে। জল এদিকে গভীর। রাতের হাওয়া ওখানে উত্তরবাহিনী।

গতবছরের বইমেলাতে, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত শ্রী দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতের অনেকই নদনদী সম্বন্ধে ছোটদের জন্যে লেখা সুন্দর একটি বই কিনেছিল ও। বই যদি ভাল হয় ও তাতে জানার মতন কিছু থাকে তাহলে ছোটদের বই বড়রা এবং বড়দের বইও ছোটরা অনায়াসেই পড়তে পারেন। যত্ন করে পড়েছিল বইটি চারণ। না পড়লে, হয়তো গঙ্গা সম্বন্ধেও এত কিছু জানতে পারত না।

যে কোনও নদীই চারণকে অভিভূত করে। কোথায় যে চর ফেলে নদী, আর কোথায় যে পাড় ভাঙে, তা সেই জানে। কত জনপদ গড়ে ওঠে একটা নদীর দুদিকে এই নদীমাতৃক দেশে। মানুষ মরে যায়, গাছ পড়ে যায়, ঐরাবতের মতন অতিকায় প্রস্তরখণ্ড তার ঘর্ষণে-চূর্ণনে নুড়িতে পরিণত হয় কালের প্রবাহে। পরিবর্তিত, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার খাতের দুপাশের সব কিছু। কিন্তু নদী চলে নদীরই মনে। অবিরত, বাধাহীন।

উত্তরকাশী জেলায় গঙ্গোত্রী থেকেও প্রায় কুড়ি কিমি দূরের এক বরফের গুহা গোমুখ থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে গঙ্গা তারপর গঙ্গোত্রী হয়ে নেমে এসেছে হিমালয়ের গা বেয়ে। গোমুখের উচ্চতা সাত হাজার মিটার মতন। উত্তরকাশী শহর গঙ্গোত্রীর উজানে। অত্যন্ত প্রাচীন শহর।

www.MurchOna.com

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ স্কন্দপুরাণে এর নাম বর্ণিত আছে 'বারণাবর্ত'। চীনদেশী পর্যটক হিউয়েন সাঙ এই শহরের নাম অবশ্য ব্রজপুর বলে উল্লেখ করেছিলেন।

অনেকে এও বলেছেন যে, মহাভারতে-বর্ণিত জতুগৃহ নাকি এখানেই নির্মিত হয়েছিল।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, অন্য অধিকাংশ নদ নদীরই মতন গঙ্গার নাম কিন্তু উৎসমুখেও তো বটেই, তার অনেক নীচে পর্যন্তও গঙ্গা নয়। দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার সঙ্গে ভাগীরথীর সঙ্গমের পর থেকেই এর নাম গঙ্গা হয়েছে।

অলকানন্দার জন্ম গাড়োয়াল হিমালয় ও তিব্বতের সীমানাতে দুর্গম পার্বত্য এলাকাতে। সতোপন্থ হ্রদ আর ভগীরথ হিমবাহ থেকে জন্মেছে অলকানন্দা প্রায় আটহাজার মিটার মতন উচ্চতাতে। বেশ কিছুটা নেমে এসে সে মিলেছে মন্দাকিনীর সঙ্গে, রুদ্রপ্রয়াগে।

রুদ্রপ্রয়াগ অবশ্য চারণের কাছে বেশি জানা জিম করবেট এর বই-এর মাধ্যমেই। 'দ্য ম্যান-ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ'।

রুদ্রপ্রয়াগেই ওই দুই নদীর সঙ্গমের নীচে পথ-পাশের একটা আমগাছের ডালে বসে মেরেছিলেন ওই চিতাটিকে জিম করবেট সাহেব এক রাতে।

জয়িতার আর্ম-চেয়ার ওয়াইল্ড-লাইফ এন্থুজিয়াস্ট দাদার কাছে শুনেছিল চারণ যে, রুদ্রপ্রয়াগে যে জায়গাতে চিতাটাকে মারা হয়েছিল সেখানে একটি বোর্ড লাগানো আছে নাকি।

যদি কখনও রুদ্রপ্রয়াগে যায়, তবে সে ওই তীর্থ-দর্শনেই যাবে। মন্দির-মসজিদে তার কোনও মন নেই।

বদ্রীনাথ বা বদ্রীবিশাল অলকানন্দারই ঐ পারে। রুদ্রপ্রয়াগের ব্রিজ পেরিয়ে অলকানন্দা যে পারে, সেই পারের পাহাড় বেয়েই বদ্রীনাথের পথ চলে গেছে। আর নদী না পেরিয়ে সোজা চলে গেলে কেদারনাথের পথ।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে হৃষীকেশ অনেকখানি পথ। এখানে এসেই গঙ্গা সমতলভূমি পেয়ে বিস্তৃতিলাভ করেছে। তারপর হরিদ্বার হয়ে কানপুর। তারপর ইলাহাবাদ। যেখানে যমুনা ও প্রাচীনকালে সরস্বতীর মিলন ক্ষেত্র। সঙ্গম। এই শহরের নাম আর্যদের সময়ে ছিল প্রয়াগ। কিন্তু মুঘল বাদশা আকবর যমুনার তীরে একটা দুর্গ তৈরি করেন এবং শহরের নাম বদলে করেন ইলাহাবাদ। ইলাহাবাদ থেকে এলাহাবাদ। এলাহাবাদের থেকে প্রায় দেড়শ কিমি দূরে কাশী বা বারানসী। এখানেই উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম পারে বরুণা ও অসি নদীর সঙ্গমে বেড়ে উঠেছিল প্রাচীন জনপদ, হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ বারানসী।

এই কাশী শহর পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে একটি। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ উপনিষদ ও পুরাণেও কাশীর নাম রয়েছে। এখানে বিশ্বনাথের মন্দিরের এবং বিগ্রহের বর্ণনা চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতেও আছে। এর দশাশ্বমেধ ঘাটের কথাও সর্বজনবিদিত। আরও অনেক ঘাট আছে বারানসীতে।

কিংবদন্তী আছে যে, ব্রহ্মার আদেশে কাশীর রাজা দিব্যদাস নাকি দশটি অশ্ব দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন রুদ্র সরোবরের তীরে। সেই থেকেই নাম : দশাশ্বমেধ।

আরও অনেকই কথা জানা গেছিল এই নদী সম্বন্ধে দিলীপবাবুর বইটি পড়ে। সে-নদী যেখানে এসে সমতলবাসী হয়েছে সেখানে, সেই হৃষীকেশে দাঁড়িয়েই এই সব মনে পড়ছে চারণের।

গঙ্গা, পাটনা বা পাটলিপুত্রকে পাশে রেখে, পৌঁছেছে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুরে। সে সবও পেছনে রেখে রাজমহলের কাছে এসে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। আরও শ-খানেক কিমি নেমে এসে ভাগ হয়ে গেছে গঙ্গা দুভাগে। একটির নাম হয়েছে পদ্মা। সেটি চলে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলা হয়ে বাংলাদেশে আর অন্যটির নাম হয়েছে ভাগীরথী। তারপর আরও দক্ষিণে পৌঁছে ভাগীরথীর নাম হয়ে গেছে হুগলি।

চারণের ভাবনারই মতন সব মানুষেরই ভাবনা এইরকমই, নদীরই চালের মতন। কোথায় যে

www.MurchOna.com

তার উৎপত্তি, কোথায়, কোন নদীর সঙ্গে যে তার সঙ্গম আর কোথায় যে সে লীন হয়েছে মহত্তম সঙ্গমে সমুদ্রের সঙ্গে, তা তার উৎসে দাঁড়িয়ে বোঝা পর্যন্ত যায় না।

শেষ পর্যন্ত আসা হল কুঞ্জাপুরীতে।

প্রভাকর মার্কেটের কুমার ট্রাভেলস এর থেকে একটি অ্যাম্বাসাডার ভাড়া নিয়েছিল চারণ।

ওর সঙ্গে আলাপ হওয়ার দিনেই ভীমগিরি কুঞ্জাপুরীর কথা বলেছিলেন।

সত্যি সত্যি কোথাওই পৌঁছানো বড় সোজা কথা নয়। সে মনেই হোক, কী পাহাড়-বনে। হৃষীকেশে আসা অবধিই ভাবছিল যে আসবে, এই মন্দিরের কথা শোনার পর থেকেই, কিন্তু আসতে আসতে এতদিন লেগে গেল।

মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে, মন্দিরের চাতালে দাঁড়িয়ে পেছনে এবং ডানে হৃষীকেশ শহরটা চোখে পড়ে। ছড়ানো-ছিটোনো। খাত-এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার পুরোটাই যে এখান থেকে দেখা যায়, তা নয়। কিন্তু নদীর এ পারের তপোবন, মুণিকা-রেতি এবং ওপারের স্বর্গাশ্রম ইত্যাদির আভাস পাওয়া যায়।

চারণ বসেছিল, মন্দিরের পেছনে, চাতালের প্রাচীরের ওপর। রোদ পড়েছিল পিঠে। ভারী আরাম লাগছিল। চোখ বুঁজে আসছিল আরামে।

কুঞ্জাপুরী মন্দিরের পুরোহিত পণ্ডিত কুঁবারসিংজী তার পাশে দাঁড়িয়ে বহু দূরের বরফাবৃত শৃঙ্গগুলি চেনাচ্ছিলেন।

একদিকে উত্তুঙ্গ গিরিগাত্র এবং অন্যদিকে গভীর এবং প্রায় খাড়া নেমে-যাওয়া খাদ রেখে নাতিদূরের আঁকা বাঁকা এবং সর্পিল পথ দিয়ে বাস চলে যাচ্ছিল তেহরি-গাড়োয়ালের দিকে। কোনও বাস আসছে হৃষীকেশ হয়ে, কোনও বাস দেরাদুন থেকে। এই পথই চলে গেছে চাম্মাতে। কলুষহীন উঁচু শিবালিক পর্বতমালার গিরিগাত্র এবং খাদে রোদ ও ছায়ার মায়া রচিত হয়েছে। টেরাসিং-কালটিভেশান করা ক্ষেত-খামার, SURE-FOOTED গাই বলদ, খচ্চর, ছাগল-ভেড়া, পাহাড়ী কুকুর, গৃহকর্মে ব্যস্ত নারীর চিকন স্বরে ডাকাডাকি, ছাগলের দূরাগত ব্যাঁ ব্যাঁ রব, একঝাঁক Rock Pegion-এর ওড়াউড়ি শীতের ওম-ধরা রোদমাখা সুনীল আকাশে, সমস্ত কিছুর দিকেই চেয়ে থাকতে থাকতে চারণের ঘোর লেগে যাচ্ছিল। ওর কলেজের সহপাঠী অমলেশের কথা বারেবারে মনে পড়ে যাচ্ছিল ওর। অমলেশের পাহাড়ে ট্রেকিং করার নেশা ছিল।

চারণ ওকে বলত, কী যে দৌড়োস ছুটি পেলেই পাহাড়ে বার বার। পাহাড় ছাড়া পৃথিবীতে দ্রষ্টব্য কি আর কিছুই নেই?

অমলেশ হাসত। ঝকঝক করত ওর উজ্জ্বল কালো চোখের মণি দুটো। ও বলত, একবার চল আমার সঙ্গে, তখন বুঝবি, কেন যাই? একবার গেলেই ঘোর লেগে যাবে। বারেবারে আসতেই হবে।

একবার এসেই বুঝতে পারছে চারণ যে, তাকেও আসতে হবে বারে বারেই। কিছু আছে এইসব পর্বতরাজিতে, গাড়োয়াল এবং কুমায়ুঁ হিমালয়ে। হয়তো আছে এর চেয়ে কম উঁচু বিন্ধ্য ও মাইকাল পর্বতমালাতেও। কে জানে! পশ্চিমঘাটের পর্বতমালাতেও হয়তো আছে। পূর্ব-আফ্রিকার কিলিম্যানজারো বা পশ্চিম আফ্রিকার রুয়েনজোরি রেঞ্জ বা পশ্চিমী দুনিয়ার ইউরোপের আল্পস, পিরিনিজ, ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের এই সব নগাধিরাজদের কোনও তুলনাই চলে না। আমেরিকার রকি মাউনটেইনস রুক্ষ, দুর্দম যদিও কিন্তু এই দেবদুর্লভ মাহাত্ম্য তাদের একটুও নেই। নিজ চোখে

www.MurchOna.com

না দেখলে কুমায়ুঁ আর গাড়োয়াল হিমালয়কে, এসব কথা বোঝা যায় না আদৌ। এসব দেখে নিজের দেশ সম্বন্ধে গর্ব জাগে। কলকাতা দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই ভারতবর্ষ নয়। সে সব নগরের কোনও বিশেষ ভারতীয়ত্ব নেই। পশ্চিমী দুনিয়ার সস্তা, দৃষ্টিকটু নকল বলে মনে হয় সে সব শহর দেখলে। ভারতবর্ষকে জানতে হলে এই রকম সব জায়গাতেই আসতে হয়। নয়তো বনে-জঙ্গলে।

ভাবছিল, নিজের এই আশ্চর্য সুন্দর দেশের কতটুকুই বা দেখেছে! কী বিচিত্র দেশ তাদের। কত বিভিন্ন তার রূপ, কত বিচিত্র তার দেশবাসীর ভাষা, বেশবাস, আচার ব্যবহার। কিন্তু এই বৈচিত্র্যেরই মাঝে মূল সুরটি একই। ভারতের শাশ্বত সম্ভ্রান্ততাকে দারিদ্র কোনওদিনও মলিন করতে পারেনি, পারবে না। এই মূল সুর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বয়ে চলেছে একটি অবিরত প্রবহমাণ স্রোতেরই মতন, তাতে দুপাশে অববাহিকা থেকে অগণ্য উপস্রোত এসে মিশেছে একে একে। তাতে মূল স্রোতে বাধা পড়েনি। বরং তার জোর বেড়েছে, ভার বেড়েছে, সে বিস্তৃত হয়েছে আরও।

ভারী গর্ব হচ্ছিল চারণের এই প্রাচীন দেশে জন্মেছে বলে। এই ঐতিহ্যের দেশে, রামায়ণ, মহাভারতের দেশে। নিজের দেশকেই যে-মানুষ ভাল করে দেখেনি, জানেনি, তার পক্ষেই বিদেশের প্রশস্তিতে মুখর মতন পঞ্চমুখ হওয়া সম্ভব। নিজেকে যে জানে, শুধু সেই না পরের সঙ্গে তুলনা করতে পারে নিজের!

কুঞ্জাপুরীর পুরোহিত প্রথমে চারণের ওপরে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন। তার কারণও ছিল। চারণ গাড়ি করে উঁচু শৃঙ্গর ওপরে ওঠার পরও আরও তিনশ ষাটটি সিঁড়ি ভেঙে যখন এই ছোট্ট মন্দিরের চাতালে এসে পৌঁছেছিল তখন পুরোহিত সিঁড়িতে চারণের পদশব্দ পেয়ে নিজেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন চাতালের মুখে। চারণ তাকে নমস্কার করার আগেই তিনি তাকে নমস্কার করেছিলেন।

চারণ বলেছিল, আমি কিন্তু এখানে পুজো দিতে আসিনি।

তবে?

বলেছিলেন কুঁবারসিংজি, বংশানুক্রমে যিনি এই মন্দিরের পুরোহিত। গাড়োয়ালের রাজা যাঁর পূর্বপুরুষকে উত্তরপ্রদেশের সমতলভূমি থেকে এনে এই উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরের উচ্চতম চুড়োতে অধিষ্ঠিত শিব-কর্তৃক ছেদিত মহামায়ার পীঠের পূজারী করেছিলেন। জনশ্রুতি আছে, এখানে নাকি মহামায়ার স্তন পড়েছিল। জানে না চারণ। কুঁবারসিংজি যা কিছুই বলবেন তার সবকিছুই বিশ্বাস করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। তবে নারী শরীরের সবচেয়ে সুন্দর অংশ, চারণের মতে, তার স্তন এবং তলপেট। দেবীর শরীরেরও তাই হবে হয়তো।

ভাবল, নাস্তিক চারণ।

ভেবেই ভাবল, এই কুভাবনার কথা আর এস এস-রা বা শিবসেনারা জানতে পারলে হয়তো তার শিরশ্ছেদ করবে।

কুঁবারসিংজির 'তবে'র উত্তরে একটি লাল-রঙা পঞ্চাশ টাকার নোট তাঁকে দিয়ে চারণ বলেছিল, পুজো আপনি দিন কিন্তু আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকব না।

সে কি?

না। আমি কোনও মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি। কখনওই ঢুকবও না।

অজীব আদমী আপনি। তবে এলেন কেন কষ্ট করে এতদূরে? তারওপর ওই তিনশ ষাটটি সিঁড়ি চড়ে?

এলাম, মন্দির দেখতে। আপনাকে দেখতে। যে-কোনও মন্দিরের চাতালে এলেই আমার মনে এক ধরনের শান্তি আসে। ভাল লাগে।

শান্তি থাকে আপনার বুকেরই মধ্যে, কোনও মন্দির মসজিদ বা গির্জাতে নয় বাবুজি। তবে সেই শান্তি হয়তো ভ্রমরের মতন কৌটো বন্ধ থাকে। এমন এমন জায়গাতে এলে সেই কৌটোর ঢাকনি হয়তো খুলে যায়।

ভাল লাগল খুব চারণের, কুঁবারসিংজির এই কথাটি। ভাবল, আমাদের প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে অনেক কথাই থাকে, শান্তির ঐ ভ্রমরেরই মতন, যা আছে বলে আমরা জানি অথচ কী করে তাকে

www.MurchOna.com

বাইরে আনা যায় সুন্দরভাবে, পুরোহিত কুঁবারসিংজি এই মাত্র যেমনভাবে আনলেন, তা আমাদের জানা নেই।

ভাবছিল চারণ যে, লেখাপড়া শিখলেই যে, সকলেই শিক্ষিত হন এমন নয়, লেখালেখি করলেই যে সকলেই তাঁরা লেখক হয়ে ওঠেনই এমনও নয়, নিজের অথবা পাঠকের মনের ভিতরের গোপন কথাটিকে, ওই ভ্রমরেরই মতন, কৌটোর ঢাকনি খুলে বাইরে যিনি আনতে পারেন অবহেলে, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত, প্রকৃত লেখক!

ওই দেখুন! ডানদিকে, মানে, সবচেয়ে ডানদিকে যে তুষারাবৃত পর্বতটি দেখা যাচ্ছে, তা হল নন্দাদেবী। তার পাশে, বাঁ পাশে ঘণ্টাকর্ণ। দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ। চারণ বলল।

আরও একমাস পরে যদি এখানে আসতে পারেন একটি দুরবীণ সঙ্গে নিয়ে তবে এই কুঞ্জাপুরীর চাতালে বসেই বদ্রীবিশালের মন্দির দেখতে পাবেন। কুঞ্জাপুরী, হৃষীকেশের চারদিকে শিবালিক পর্বতমালাতে যতগুলি শৃঙ্গ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। অথচ লক্ষ লক্ষ ভ্রমণার্থী প্রতি বছরে বাবা কেদারনাথ এবং বদ্রীবিশাল দর্শনে, হৃষীকেশের উপর দিয়েই যান অথচ তাঁদের মধ্যে প্রায় কেউই কুঞ্জাপুরীতে আসেন না। খোঁজই রাখেন না অধিকাংশই এই পাহাড়চুড়োর মন্দিরের। নামও জানেন না। জিগ্যেস করে দেখবেন আপনি।

চারণ বলল, ভাগ্যিস!

কেন? একথা বলছেন কেন?

মন্দির মসজিদের বা অন্য সব ধর্মস্থানের মাধুর্য, মাহাত্ম্যর কথা আমি বলতে পারব না, তবে আমার কাছে সব ধর্মস্থানের মাহাত্ম্যই কিন্তু তার নির্জনতাতে, শান্তিতেই। যে মন্দিরে অতি কম মানুষ আসেন, যে মসজিদে বা গির্জাতে অতি কম মানুষে নামাজ পড়েন বা প্রার্থনা করেন, সেখানেই মনে হয় মানুষ মন্দিরে মসজিদে যা খুঁজতে আসে, তাই বেশি করে পেতে পারে। আমি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতাম তবে কোনও মন্দিরেই বা মন্দিরের কাছাকাছিও কোনও যানবাহনকে আসতেই দিতাম না।

তারপর থেমে বলল, আমি এখানে এসেছি অল্প কদিন। কিন্তু এখানের সাধুসন্তদের সঙ্গে মিশে এ কদিনে যতটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়, ঈশ্বর কখনওই মন্দিরের বিগ্রহ নন। ঈশ্বর থাকেন মন্দিরের পথের ধুলোতে, পথপাশের ফুলে-পাতায়, পথকষ্টে, সহযাত্রীর প্রতি সহমর্মিতা এবং দয়ামায়ারই মধ্যে। যদি তাঁর কোনও অবয়ব থাকেও তবুও তিনি পাথর বা রুপোর বা সোনার মূর্তিতে আদৌ বদ্ধ থাকবেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় না।

কুঁবারসিংজি বললেন, এমন সব কথা বলবেন না বাবুজি। অবিশ্বাসীরা মন্দিরের চাতালে তবে আসেনই বা কেন? আপনিই বা এলেন কেন? মা জানতে পারলে মুখে রক্ত উঠে মারা যাবেন আপনি।

চারণ হাসল, কুঁবারসিংজির কথাতে।

তাতে, মনে হল, পূজারী আরও চটলেন।

চারণ বলল, কুঁবারসিংজি আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। ঈশ্বর-বিশ্বাস আর মূর্তি-পুজো, আমার মনে হয় সমার্থক নয়। কেন নয়, তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। বরং একথা বলতে পারেন যে, এইসব কথা বোঝার জন্যেই হৃষীকেশে এসে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসেছি। দেখি, কিছু বুঝতে পারি কি পারি না।

কুঁবারসিংজি তখনও রেগেই ছিলেন।

পূজারী বললেন, আপনি কি জানেন যে, হিন্দুর দেবদেবীকে যে মানুষ নিজে হিন্দু হয়েও অপমান করেন, আপনারই মতন, তিনি মুখে রক্ত উঠে বা দুর্ঘটনাতে মারা যান। অন্য কারওকেই নিধন করতে হয় না তাকে। খুনোখুনি করার শিক্ষা হিন্দুধর্ম দেয় না। আমার ধর্মের সঙ্গে অন্য সব ধর্মেরই অনেক তফাৎ আছে।

www.MurchOna.com

চারণ, ঠাণ্ডা, নিস্পৃহ গলাতে বলল, এ প্রসঙ্গ বরং থাক এখন।

থাক তবে।

এখন বলুন, মানে, ওই বরফাবৃত চুড়োগুলো চিনিয়ে দিন আমাকে দয়া করে।

ঘণ্টাকর্ণ দেখেছেন ত, নন্দাদেবীর বাঁ পাশে ?

হ্যাঁ। ওই ঘণ্টাকর্ণর পায়ের কাছেই আছে চন্দ্রবদনী।

চন্দ্রবদনী ? কী চমৎকার নাম। কিন্তু কই ? দেখা যাচ্ছে না তো!

না। দেখা যায় না এখান থেকে। মধ্যে একটি অন্য পর্বত পড়ে গেছে। দেখছেন ? কালো, মানে, বরফ-ঢাকা নয়। ওই কালো পর্বতটি অনেকই কাছে এখান থেকে। তাই দূরের চন্দ্রবদনী তার পেছনে পড়ে যাওয়াতে আড়ালে পড়ে গেছে।

তাই ?

হ্যাঁ।

তেমনই বোধহয় ঘটে সবসময়ই। জড় তো বটেই, জীবন্তর বেলাতেও।

কি ? কুঁবারসিংজি বললেন।

যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন শুধুমাত্র কাছে আছে বলেই আমরা কেবল তাদেরই দেখতে পাই। তাদের প্রকৃত আকারের চেয়ে অনেক বড় দেখি তাদের আর তাদের আড়ালে যে কত সুন্দর এবং বড় কত কিছুই ঢাকা পড়ে গিয়ে আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যায় চিরদিন, তা আমরা জানতে পর্যন্ত পাই না।

কুঁবারসিংহজি কী যেন বললেন, অস্ফুটে। ঠিক বুঝতে পারল না চারণ। তবে বুঝল যে, অকবি চারণের মুখ নিঃসৃত এই আকস্মিক কাব্যিক মন্তব্যে পুরোহিত কিঞ্চিৎ প্রীত হয়েছেন।

আবার চারণ বলল, চন্দ্রবদনী ? বাঃ!

হুঁ।

কুঁবারসিংজি বললেন।

ভাবল চারণ যে, এ জীবনে এই নামের কোনও নারীর সঙ্গে যদি কখনওই দেখা হয় তবে শুধু নামমাহাত্ম্যরই কারণেই তাকে মন-প্রাণ সব দিয়ে দেবে। মানুষে যদি রূপ দেখেই মনপ্রাণ সঁপতে পারে, যদি পারে গুণ দেখে, তবে শুধু নাম শুনে তা পারতেই বা দোষ কোথায় ?

কুঁবারসিংজি বলে চললেন, তারপর দেখুন ঘণ্টাকর্ণর বাঁপাশে, মানে আমাদের বাঁপাশে চৌখাম্বা। দেখেছেন ? কেমন চৌকো মতো, বিরাট।

চৌখাম্বা দেখে চারণের মনে পড়ে গেল তার মেজমামার ছেলে পল্টুর কথায় কথায় 'আখাম্বা' বলে ওঠার কথা। ওই একটি শব্দ যে সে দিনের মধ্যে কতবার, কত অর্থে ব্যবহার করত।

পল্টু সঙ্গে থাকলে চৌখাম্বা দেখেও নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠত "আখাম্বা"।

পল্টু অবশ্য আর চারণের সঙ্গে কোথাওই যাবে না। কারণ, সে পৃথিবী থেকেই চলে গেছে মাত্র সাতাশ বছর বয়সেই। কোথায় গেছে, কে জানে।

মানুষ মরে কি কোথাওই যায় ?

হৃষীকেশে যে অগণ্য প্রশ্ন বুকের মধ্যে জড়ো করে নিয়ে চারণ এসেছিল তার একটিরও উত্তর এখন পর্যন্ত পায়নি। জানে না, পাবে কি না আদৌ। তবে এটা অবশ্যই বুঝতে পারছে যে এক অভিনব বাতাবরণের মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে, যা বাতানুকুল। যার মধ্যে বিশ্বাসের শিখা জ্বলে স্থির হয় সতত। নিবাত, নিষ্কম্প।

কুঁবারসিংজি বললেন, চৌখাম্বা থেকেই বেরিয়েছে অলকানন্দা আর মন্দাকিনী। চৌখাম্বার পায়ের কাছে এদিকে কেদারনাথের মন্দির আর উলটোদিকে বদ্রীবিশাল। অলকানন্দা বেরিয়ে উত্তরে গেছে, কেদারনাথের দিকে, তারপর সেখান থেকে নেমে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগে আর মন্দাকিনী দক্ষিণে বদ্রীবিশালের দিকে গিয়ে নেমে এসেছে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে এবং সেখানেই মিলন হয়েছে এই দুই নদীর।

www.MurchOna.com

তার পরের শৃঙ্গটির নাম কি ? চৌখাম্বার বাঁ পাশের ?

চারণ জিগ্যেস করল।

হ্যাঁ। ওটির নাম বান্দরপুঞ্ছ।

বান্দরপুঁঞ্ছ ? নাম ? পর্বত শৃঙ্গর ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তার একটা ইতিহাস আছে।

কি ইতিহাস ?

মহাপ্রস্থানের পথে বেরিয়ে যখন পাণ্ডবেরা ওই সব অঞ্চলে পৌঁছোন তখন সহোদর ভীমকে, যুধিষ্ঠির তাঁরই কোনও কাজে পাঠান। ভীম সে কার্যে যেতে গিয়ে দেখেন পথ জুড়ে আছে এক বিশাল বাঁদরের লেজ। পথ অবরুদ্ধ। তখন তিনি অনুরোধ করেন সেই বাঁদরকে তার লেজটি পথ থেকে সরাতে। তখন বাঁদর বলেন, 'আমি বুড়ো হয়েছি, গায়ে একটুও জোর নেই। আপনিই লেজটা সরিয়ে নিন বরং। রেখে দিন পথের একপাশে। আপনি তো মহাবলী ভীম।'

ভীম হেঁইও-হাঁইও করেও যখন লেজটা সরাতে পারলেন না পথ থেকে একচুলও তখনই তাঁর সন্দেহ হল। পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন যে, এই বাঁদর অন্য কেউই নন, সাক্ষাৎ পবননন্দন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নত হয়ে প্রণাম করে হনুমানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, হনুমানজি যেন তাঁকে মাফ করে দেন ?

তাই এই শৃঙ্গের নাম বান্দরপুঞ্ছ।

চারণ বলল, তাই ?

তারপর জিগ্যেস করল, বান্দরপুঞ্ছের বাঁ পাশের ওই শৃঙ্গগুলির নাম কি ? মানে, যেগুলি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

গোমুখ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, তারপরে সারকুণ্ডা, একেবারে শেষে। ওই বান্দরপুঞ্ছ থেকে নীলকণ্ঠ অবধি পর্বতগাত্রে স্ফটিক পাওয়া যায়। স্ফটিক ছাড়া অন্য সব গ্রহরত্নরাজি তো পাওয়া যায়ই।

নীলকণ্ঠ কোথায় ? দেখালেন না তো ? সেই শৃঙ্গও কি বরফাবৃত ?

না, না। নীলকণ্ঠ অত উঁচু নয়। নীলকণ্ঠ হৃষীকেশের উলটোদিকে। স্বর্গাশ্রমের পারে। পায়ে হেঁটে যাবার পথ আছে। খুব চড়াই। ঘণ্টা তিনেক লাগে। আজকাল গাড়িতেও যাওয়া যায়। গঙ্গাজির উপরের বারাজ পেরিয়ে রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক হয়েও যাওয়া যায়। নীলকণ্ঠের পাশে পাশে বয়ে গেছে সুন্দরী ইউওল নদী।

ইউওল ? বাঃ। সুন্দর নাম তো ! কোথায় গিয়ে পড়েছে সে নদী ?

ইউওল গিয়ে মিশেছে গঙ্গাজির সঙ্গে, ফুলচট্টির কাছে।

ফুলচট্টি কোথায় ?

কুঁবারসিংজি হাসলেন। বললেন, আগে তো কেদারবদ্রী যেতে হত লছমনঝুলার পায়ে হাঁটা ব্রিজ পেরিয়ে গঙ্গাজির ওপারে ওপারেই। পায়ে হেঁটে। পুণ্যার্থীদের প্রথম হল্টই ছিল ফুলচট্টি। নানা চট্টিতে থামতে থামতে রাত কাটাতে কাটাতে অনেকদিন হাঁটার পরই তখন পৌঁছনো যেত কেদারনাথ আর বদ্রীবিশালে। আজকাল তো গাড়িতে আর বাসে হুস-হাস করে বুড়ি ছুঁয়েই সকলে চলে আসে। এখন কি আর সেই তীর্থযাত্রা আছে ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমরা তো সব নিষ্কর্মা ছিলাম। এখনকার মানুষদের যে সময়ের দাম হয়ে গেছে ভারী। সময় নষ্ট করে মানুষ, এমন সময় এখন কোথায় ? কিন্তু যে-সময়টা তারা বাঁচাচ্ছে তা দিয়ে কী করে তা জানতে বড় ইচ্ছে করে। আরও টাকা রোজগার করে কি ? তাই মনে হয়। কথাটা কি জানেন বাবু, অনেক টাকা করার পরেই শুধু মানুষে বোঝে যে টাকা কাগজই মাত্র। তার নিজের নিজস্ব কোনও দাম নেই। কে কেমন ভাবে টাকাকে কাজে লাগায় তার উপরেই নির্ভর করে সব।

নীলকণ্ঠতে লোকে যায় কেন ?

চারণ জিগ্যেস করল।

www.MurchOna.com

নীলকণ্ঠর মন্দির আছে যে সেখানে। ওইখানে বসেই নাকি মহাদেব বিষপান করে নীলকণ্ঠ হন। এইরকমই জনশ্রুতি আছে।

তাই ?

এমন সময়ে মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। মন্দিরের পেছন দিকে বসে থাকায় সিঁড়ি বেয়ে কেউ উঠলে তা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে কলকাতার বা বাংলার মানুষেরা কাঁসর-ঘণ্টা বলতে যা বোঝেন তার কোনও মিল নেই। চারণ লক্ষ করেছিল যে, এদিকের প্রত্যেক মন্দিরের চারদিকেই প্যারাপেট থেকে অসংখ্য ঘণ্টা ঝোলানো থাকে। পুণ্যার্থীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করার সময়ে এবং মন্দিরে ঢোকা এবং বেরুবার সময়ে ওই ঘণ্টাগুলিকে নাড়িয়ে দিয়ে, বাজিয়ে দেন। তাতে দারুণ এক সুন্দর শব্দমালা তৈরি হয়। হাওয়ার বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন তরঙ্গ তুলে, বিভিন্ন স্বরগ্রামে সেই শব্দলহরী ফুলমঞ্জরীর মতন নিস্তব্ধ পাহাড়-উপত্যকাতে গড়িয়ে গিয়ে, ছড়িয়ে যায়। এই শব্দমালাকে যদি ছবিতে অনুবাদ করা যায়, তাহলে কর্বুর জলরঙে-আঁকা ACUQAর কোনও নিপুণ কাজ বলে মনে হবে।

কুঁবারসিংজি চলে গেলে চারণ একা হয়ে যেতেই ওই নিস্তব্ধ রৌদ্রস্নাত পর্বত ও উপত্যকারাজির সৌন্দর্য যেন হঠাৎই বাঙময় হয়ে, আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে।

কী একটা পাখি ডাকছে। কী পাখি, জানে না চারণ। পাখি চেনে না, ফুল চেনে না, ঘাস চেনে না। জীবনের প্রায় অর্ধেকটাই আনকুথ সব মানুষ চিনে, অকাজে অন্যের আরও আরও আরও অর্থোপার্জনে সাহায্য করেই কাটিয়ে দিল। মিছিমিছি। এই সত্য উপলব্ধি করেই মন খারাপ হয়ে গেল ওর। এবারে বাকি সময়টুকু কাজের কাজ করলে হয়। কাজের কাজ। ওরও যে মন বলে একটা পদার্থ ছিল, সেটার খোঁজ যে এতদিন করেনি কেন, তা ভেবেই বড় অবাক হয়। মনের দেরাজের গভীরে বহুবছর ধরে রেখে-দেওয়া অব্যবহৃত, স্বার্থগন্ধহীন, নিরাসক্ত মনটি হঠাৎ এই এক আকাশ রোদের মধ্যে, উত্তুরে হাওয়ার মধ্যে, যখন আচমকা বেরিয়েই পড়ল তখন খুবই অস্বস্তিতে পড়ল চারণ তাকে নিয়ে। কোথায় রাখবে, কী দিয়ে ঢাকবে, তা ভেবে পেল না।

নিজের ভাবনাতে নিজে বুঁদ হয়ে বসেছিল, কতক্ষণ যে, তার হুঁস নেই। একেকবার প্রশ্বাস নিচ্ছে আর মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন পাচ্ছে। "নূতন প্রাণ দাও, প্রাণ সখা" গানটির কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। প্রতি প্রশ্বাসেই নতুন প্রাণ।

ঠাণ্ডাতে নাকের পাটাটা ব্যথা ব্যথা করছে। কিন্তু ভাল লাগছে খুবই।

হঠাৎই পেছনে খটা-খট শব্দ শুনে ওর ঘোর ভেঙে গেল। চমকে চেয়ে দেখে পাকদণ্ডী পথ বেয়ে একটা গাড়োয়ালি ছেলে উঠে আসছে প্রায় নব্বই ডিগ্রি খাড়া পথ বেয়ে। তার হাতে এক গাছা দড়ি। দড়ির অপর প্রান্ত রয়েছে একটা খচ্চরের গলাতে বাঁধা। খচ্চরের পিঠে পাথরের চাঙর। এমনি পাথরের নয়। সবুজ রঙা গ্রানাইটের।

আশ্চর্য হয়ে গেল, এমন খাড়া পথে মানুষ অথবা জানোয়ার ভার বহন করে কি ভাবে উঠে আসে উপরে এই কথা ভেবে। তারপরই ভাবল, এখানে এই মন্দির এবং চাতাল যখন তৈরি হয়েছিল একদিন, তখনও গাড়োয়াল-রাজ এমনই প্রক্রিয়াতেই তো মানুষ, জানোয়ার, মালমশলা সব এই পর্বত চুড়োয় তুলেছিলেন !

নিজের নিবুদ্ধিতাতে নিজেই লজ্জিত হল।

খচ্চরটি ওই খাড়া পথ বেয়ে এসে যখন চাতালের বেঁটে পাঁচিলের ধার ঘেঁষে দাঁড়াল তখন যেন বাঁচল। তার বড় বড় কান সমেত খয়েরি-রঙা মুখটা চারণের মুখের থেকে মাত্র দুহাত মতন দূরে ছিল। এপর্যন্ত শান্তিনিকেতনি, কেষ্টলগর-সিটি, নানা বরেন্দ্রভূমি, বদ্যিবাটী ইত্যাদির জায়গার কিছু "খসসর" সে কলকাতাতে দেখেছে ওর কর্মজীবনে। এবং তার অফিসের টেবিলের উলটোদিকে তারা যখন বসেছে, তখন তাদের মুখগুলিও ওই দুহাত মতনই দূরে ছিল। কিন্তু এত বড় বড় কানওয়ালা রিয়্যাল খচ্চর, মানে, পেডিগ্রি-খচ্চর, এত কাছ থেকে আগে আর দেখেনি। হাত বাড়িয়ে, পরম শ্রদ্ধাতে, তার কান মুলে দিতে ইচ্ছা করল চারণের।

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

চারণ, লোকটির মুখের দিকে, খচ্চরটির মুখেরই দিকের মতন মনোযোগ সহকারে ভাল করে চেয়ে দেখে বুঝল যে, লোক নয়, ছেলে। মানে, সদ্য যুবক। সবে দাঁড়ি-গোঁফের রেখা উঠেছে।

আসছ কোথা থেকে ?

চারণ শুধোল।

বিরেডা।

গ্রাম ?

হ্যাঁ।

সেটা কোথায় ?

ওই নীচের নদী পারে।

কোন নদী ?

নদী নয়, ঝোরা।

নাম কি ঝোরার ?

গ্রামের নামে নাম, বিরেডা।

এই খচ্চর কি তোমার ?

প্রশ্নটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যেতেই নিজের ভুল বুঝতে পারল চারণ।

কোনও "খসসর" বা খচ্চরই কি কোনও কালেই কারও হয় ? সে বা তারা, না হয় মালিকের, না হয় স্ত্রীর, না হয় প্রেমিকার, না হয় জনগণের। এমন কি, না হয় নেতারও। খচ্চরদের সব খচরামিই এখানে। খচ্চর অথবা খসসর সর্বকালেই তার নিজেরই। অর্থাৎ, খচ্চর, খচ্চরেরই।

তোমাদের জমি-জমা নেই ?

আছে। অল্প।

ছেলেটা কতখানি চড়াই বেয়ে আসছে, তা কে জানে। পাহাড়িরা হাঁফায়-টাফায় না। অত সহজে হাঁফ-টাফ ওঠে না। তবে সামান্য পরিশ্রান্ত হয়েছে যে, তা মুখ দেখে বোঝা গেল। তার মাথার গোল টুপি খুলে তার ভেতর থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বের করে পকেট থেকে কেরোসিনের সস্তা লাইটার বের করে কুটুক আওয়াজ করে আগুন জ্বেলে একটা বিড়ি ধরাল। তারপর তাতে একটা টান লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গাল ফুলিয়ে থেকে পরম আরামে ধোঁয়া ছাড়ল।

কি চাষ কর সেখানে ?

কী আর করব, মক্কী, গেঁহু, মসুর এইসব।

এই গ্রানাইট পাথর এখানে বয়ে আনছ কেন ?

মন্দিরের মাথাতে চড়বে।

কেন ? কালো পাথরের মন্দির তো চমৎকার মজবুতই আছে।

কে জানে, কেন ? পুরোহিতজি জাদা যাত্রী লানেকো ফেরমে হ্যায় শায়েদ। মন্দির চকমকানেসে জাদা যাত্রী উপ্পর আয়েগা। দোনো সাইডসে ঔর দোনো মন্দিরভি বনে গা রামজি ঔর সীতাজিকি।

উসসে কুঁবারসিংজি কি ক্যা ফ্যায়দা ?

কামাই জাদা হোগা, ঔর ক্যা ?

তারপরে একটু থেমে বলল, আসতে তো অনেকই ঝকমারি এখানে, কী তেহরি থেকে বা দেরাদুন থেকে। হৃষীকেশ থেকেও তেহরি রোড ধরে গাড়োয়ালের পুরনো রাজধানী নরেন্দ্রনগর ছাড়িয়ে এসে বাস থেকে নেমে বহুৎ চড়াই উঠে, তারপর আবার তিনশ ষাট সিঁড়ি। গাড়িতে আর কজন আসতে পারে। তবে অবশ্য উপরে একবার উঠে আসতে পারলে ভারী আরাম।

বলেই বলল, এখানের জল খেয়েছেন ?

জল ? এখানে ?

হ্যাঁ। কল আছে তো সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁদিকে। বৃষ্টির জল ট্যাঙ্কিতে জমা হয়। তারপর পাম্প করে তা উঠিয়ে ফিল্টার করিয়ে তারপর দেওয়া হয়। জল খেলে দিল খুশ হয়ে যাবে।

www.MurchOna.com

আবার একটু থেমে বলল, ফেরার পথে তেহরির দিকে একটু গেলেই যা রাবড়ি পাওয়া যায়, তা বলার নয়। পুরো গাড়োয়ালে এর জবাব নেই।

তাই ?

তারপর চারণ বলল, উনি ঈশ্বরের সেবক, কামাইএর ধান্দা কেন ?

হাঃ। ঈশ্বরের সেবা আজকাল আর কজন করেন বাবু ?

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, সবাই নিজের নিজের পেটেরই সেবা করে। ডাক্তারও কী রোগীর সেবা করে আজকাল ? না, উকিল মোক্তারের ? জমানাই বদল গ্যায়া।

তাই ?

এই সত্য কথনে আহত হল চারণ।

ওঁর ছেলে মেয়ে নেই ? সংসার ?

আছে না ! উনি তপোবনে থাকেন। ওঁর ছেলে ভারী চাকরি করে। এক ছেলে ব্যবসা। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ভারী-ভারী সব অফসারদের সঙ্গে।

ছেলেরা কেউ পুজো করে না ? মানে, পুরোহিত হয়নি ?

নাঃ। এখন প্রত্যেকেরই অনেক টাকার দরকার। এই টঙে সারাদিনে কজন যাত্রীই বা আসে।

ধূপ-ধুনো, ফুল, মন্দিরের গা-থেকে ঝোলানো ঘণ্টার মন্দ্রস্বর এই কলুষহীন উত্তুরে বাতাস, পাখির ডাকে নিজের মনটাতে বেশ একটু নিরাসক্তি এসেছিল, ধার্মিক-ধার্মিক ভাব। আর ঠিক সেই সময়েই এই খচ্চরওয়ালা উলটো বকে এই শান্তির বাতাবরণ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিল। চটকে দিল শ্রদ্ধা।

খচ্চরের মালিকও কি খসসর হয় ? কে জানে।

এসব কথা তো সে জানেই। রোজই শুনে শুনে ক্লান্ত। আর ক্লান্ত বলেই তো এতদূরে এসেছে অন্য কিছু শুনবে বলে। তবে কি এসব চারণের উইশফুল থিংকিং ? সকলেরই কি ভেক আছে ? সব সাধুর ? সব পুরোহিতের ?

না, না, তা হতেই পারে না। এই পুরোহিতের ত এই পেশা। ওঁর সঙ্গে ত্রিবেণী ঘাটের ভীমগিরির ধিয়ানগিরিদের কোনওই মিল নেই। ওঁরা প্রকৃতই সাধু। সন্ত আদমি। মাধুকরী করে খাওয়া সহজ মানুষ সব।

আবারও মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল। চারণ বুঝল যে, আবারও যাত্রী এল তিনশ ষাটটি সিঁড়ি ভেঙে, পাহাড়ের চুড়োতে ওঠার পর। আরও কামাই হবে কুঁবারসিংজির।

মনটা খারাপ হয়ে গেল চারণের। ও তো কোনও মন্দিরে ঢোকেই না। মন্দিরের বাইরেটাই ওর কাছে সব। এই পাহাড়-চুড়োর কালো পাথরের চাতালটির প্রেমে পড়ে গেছিল ও। মন্দিরটিও ছোট চাতালের একেবারে মধ্যিখানে বানানো আর পর্বত-শীর্ষের পুরোটা নিয়ে পাঁচিল-ঘেরা চাতাল। পৌঁছে, ভারী শান্তি পেয়েছিল।

তারপর ভাবল, এঁদেরই বা দোষ কি ? সারা দেশই যখন লুঠমার এ মেতেছে, সব পেশারই মানুষ, রাজনীতিক, চাকুরিজীবীরা, পঞ্চায়েতের মাথা থেকে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেকেরই যখন আরও টাকার, অনেক টাকার দরকার, গণ্ডা-গণ্ডা অপোগণ্ড ছেলেদের হিল্লে করা দরকার, তখন কুঁবারসিংজি বেচারি, দেবতার সেবা করেন বলেই কি আর দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন ?

থাকবেন, কি করে ?

ভাবছিল চারণ যে, হৃষীকেশের দুপাশে স্বর্গাশ্রম এবং তপোবনেও টিভি-র ডিশ-অ্যান্টেনাতে ভরে গেছে। এই আপদের হাত থেকে, সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে বাঁচতে হলে, হয় ত্রিবেণী ঘাটের মতন কোনও উদোম ঘাটে নয়তো কোনও গুহাতে কন্দরে না গেলে উপায় নেই। একদিন বিদ্যুৎ স্বাগতম ছিল। কারণ, অন্ধকারকে তা আলোকিত করত। আজকে, চারণের মনে হয় যে বিদ্যুৎ চরম অন্ধকারের বাহন হয়ে এসেছে। তার নানা-রঙা আলোর ঝলকানির আড়ালে অন্ধকারের সর্বনাশা বীজকে সাধারণে দেখতে পায় না, পাবে না আরও কিছুদিন।

কিন্তু...।

www.MurchOna.com

কে জানে ! হয়তো কেদারনাথ ও বদ্রীবিশালেও ডিশ-অ্যান্টেনা পৌঁছে গেছে।

হৃষীকেশ শহরে ঢোকার মুখেই রুদ্রপ্রয়াগের একটি হোটেলের বিজ্ঞাপন দেখেছিল। হোটেল পুষ্পদীপ। 'অল কমফর্টস ! টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রানিং হট অ্যান্ড কোল্ড ওয়াটার। কেবল টিভি ইত্যাদি।'

ভাবতেও খারাপ লাগছিল ওর। আজ থেকে বছর ষাটেক আগে, যখন অলকানন্দার পারে একটি আমগাছের উপরে বসে মহান ভারতপ্রেমী জিম করবেট রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ খেকো চিতাবাঘটিকে মেরে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর এবং এইসব অঞ্চলের বাসিন্দাদের অলিখিত, অঘোষিত কিন্তু 'DEFACTO' কার্ফু থেকে মুক্ত করেছিলেন, যখন টর্চের ড্রাইসেলের ব্যাটারি পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি, তাই অন্ধকারেই নিশানা নিয়ে গুলি করতে হয়েছিল তাঁকে। তখন উনি কি ভেবেছিলেন যে, সেই গাছটির অনতিদূরের একটি হোটেলে এবং রুদ্রপ্রয়াগের অন্য জায়গাতেও কেবল টিভি এসে যাবে।

কী উদ্ভাবন বিজ্ঞানের ! অভাবনীয়। ড্রাইসেলের টর্চ ছিল না মাত্র ষাট বছর আগে আর এখন বিদ্যুতে আর কৃত্রিম উপগ্রহে কি না করছে ? নিজে আর দাঁত মাজছে না মানুষ, কোমর টিপছে না, দাড়ি কামাচ্ছে না, ফলের রস করছে না, গাড়ি চালাবার সময়ে অ্যাকসিলেটরে পা দিয়ে চাপ দিতে হচ্ছে না, গিয়ার দিতে হচ্ছে না, শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে বোমা ফেলতে হলে বম্বার প্লেনে পাইলট লাগছে না। যে-মরুভূমিতে, ইংরেজ জেনারাল মন্টাগোমারি আর জার্মান জেনারাল রোমেল ঢোলা খাকি হাফ-প্যান্ট আর বুশ শার্ট পরে ট্যাঙ্কের যুদ্ধ করেছেন সেই মরুভূমিতেই সেদিন যুদ্ধ করল অ্যামেরিকান সৈন্যরা এয়াকন্ডিশনড ফাইটিং-স্যুট পরে। মেয়ে 'সৈন্য'রা গর্ভবতী হয়ে পড়ল সারেসার, রাতারাতি, যুদ্ধ করতে 'হবে না' বলে। মিসিল ছুটল, মৃত্যুর দূত। কোনওরকম তর্জনগর্জন ছাড়াই। নিছক তর্জনী হেলনে। বোতাম টিপে। মানুষের শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব, ত্যাগ, দয়া, মায়া, সংযম, মনুষ্যত্ব এ সব কিছুরই আর কোনও দাম রইল না।

পৃথিবী দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে গত ষাটবছরে। অভাবনীয় ভাবে। জয় ! বিজ্ঞানের জয় ! আরাম-আয়েসের জয় ! ভোগের জয় ! মৃত্যুর জয়।

চারণ ভাবছিল, এই যে সব হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদের 'উদ্ভাবন' করা যন্ত্র মানুষের সময় বাঁচিয়ে দিল, দিনের কয়েকঘণ্টা, ভিডিও, ক্যাসেট রেকর্ডার, কেবল টিভি-র মাধ্যমে জ্ঞানী করে তুলল মানুষকে, পেজার এবং মোবাইল ফোন দিয়ে সব মানুষকেই 'গম্য' এবং 'লভ্য' করে তুলল, তার পরিণাম কি ?

কি হবে ?

এই বেঁচে-যাওয়া সময় নিয়ে মানুষ কি করল ? মানুষ ? বিধাতার সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ?

বান্দরপুঞ্ছ-র দূরের আকাশ-জোড়া বরফাবৃত পর্বতশৃঙ্গরাজির দিকে চেয়ে চারণ ভাবছিল, মানুষ যাকে অগ্রগতি ভাবছে, যাকে ভাবছে উদ্ভাবন, যাকে ভাবছে বিজ্ঞানের জয়জয়কার, তা কি মানুষকে আবার বাঁদরত্বেই ফিরিয়ে আনছে ? আমাদের সকলেরই কি বান্দরপুঞ্ছ-রই মতন লেজ গজাবে আবারও ? বিজ্ঞান কি সত্যি সত্যিই কিছুমাত্রই উদ্ভাবন করেছে ? এ সব কি নিছকই আবিষ্কার নয় ?

অনেকক্ষণ বান্দরপুঞ্ছ-র দিকে চেয়ে চারণ বসে রইল চুপ করে। ভাবছিল, ওর লেখাপড়া শেখা কি বিফলেই গেল ? এই প্রচণ্ড বিজ্ঞানমনস্কতার দিনে মানুষের মগজ কম্প্যুটারকে দাদন দিয়ে, মানুষে যখন পরমানন্দে ওয়েফার-চিপস আর আইসক্রিম খেতে খেতে সোপ-অপেরা দেখছে এই বাঁচানো-সময়ের সদ্ব্যবহার করে, নয়তো সকালে উঠে রেসের ঘোড়ার বা কেনেল ক্লাবের প্রতিযোগিতাতে সামিল হওয়া কুকুরেরই মতন ফিজিক্যাল ফিটনেসের ক্রেজে সামিল হয়েছে, তখন চারণ একা এত বিজ্ঞান-বিরোধী কেন ?

প্রকৃতই অশিক্ষিত বলে কি ?

মুঝে মাফ কর দিজিয়ে। ম্যায় জারা বীজী হো গ্যায়া থা।

কুঁবারসিংজি এসে বললেন ।

চারণ উঠে পড়ল।

www.MurchOna.com

মনে মনে বলল, মাফ করা গেল না এই সুন্দর চাতাল আর মন্দিরকে কদর্য করে তোলার পরিকল্পনার জন্যে।

মুখে বলল, আজকে যাচ্ছি। আসব আবার কখনও।

নিশ্চয়ই আসবেন।

পকেট থেকে বের করে আরও একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিল ওঁকে চারণ। দেখেও না দেখে, উনি সেটা নিলেন।

চারণ ভাবল, অনেক সময় তো নষ্ট করেছে ও কুঁবারসিংজির। প্রত্যেক মানুষেরই সময়ের দাম থাকে। কিন্তু কে কার সময়কে কী ভাবে ব্যয় করল তার ওপরেই একজন মানুষের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য।

কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের তিনশ ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে চারণ যখন নেমে আসছে নীচে, তখন দেখল একটি সাদা মারুতি এস্টিম গাড়ি উপরে উঠে আসছে নীচ থেকে।

তবে যে খচ্চরওয়ালা বলল, পুণ্যার্থীরা আসেন না এখানে!

ও যখন উপরে উঠছিল মন্দিরের পথের চড়াই খাড়া ফার্স্ট গিয়ারে ঠেঙিয়ে, তখন অত্যন্তই বিপজ্জনকভাবে দুটি গাড়িকে উপর থেকে নামতে দেখেছিল। নেশাগ্রস্তর মতন এদিক-ওদিক করতে করতে আসছিল গাড়িগুলো খাড়া উতরাইয়ে। কিসের নেশা করেছিল ড্রাইভারেরা কে জানে!

সত্যি! নিরামিষ—পুরী হৃষীকেশে না এলে নিজের দেশের নিরামিষ-নেশার জগতের অলিগলিও অজানাই থেকে যেত হয়তো। কতরকম বৈচিত্র্য! আহা রে! এ সবের সামনে হুইস্কি-রাম-জিন-ভডকা এসব কোনও নেশাই নয়। অথচ ওই সবই এখানে Tabool। যদিও এসবের প্রত্যেকটিই মাছ-মাংস নয়, ফল-ফুল ধান্য-শস্য থেকেই তৈরি হয়। তারাও নিরামিষই। অথচ এখানে সম্পূর্ণই বর্জ্য। ও সব নাকি বিজাতীয়, উত্তেজক নেশা। একশো ভাগ দিশি হলেও কারণ-বারিরও চল নেই এখানে। মনে হয়, রাগটা, জলীয় পদার্থের উপরেই। কারণটা অবশ্য অজানাই। এখানের নেশা হল সিদ্ধির নেশা, গাঁজার নেশা, চণ্ডুচরসের নেশা, আসলি কেন্দুপাতাতে মোড়া আসলি তামাকের এক আঙুল লম্বা বিড়ির নেশা, রুখা-শুখা, রুখা-প্রকৃতির নেশা, শুখা-ভৈরবীর নেশা, এত সব নেশার কথাও তো আগে জানত না চারণ। আস্তে আস্তে জানছে। খচ্চরের নেশার কথাও।

খচ্চরের নেশাটা অবশ্য ঠিক কী বস্তু তা ও নিজেই ভাল করে জানে না। তবে, নাকে এখনও খচ্চরের গন্ধটা, তীব্র এবং টাটকা আছে। নাকে নিয়েই চারণ বুঝতে পেরেছে এই গন্ধ যে, খচ্চরেরও মানুষকে ইনটক্সিকেট করার ক্ষমতা আছে।

গরুর গায়ের গন্ধ, কুকুরের গায়ের গন্ধ, ঘোড়ার গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে ও অভিজ্ঞ ছিলই। কিন্তু তাদের গায়ের গন্ধে এমন kick নেই, যে kick, সব নেশারই মূলে। তার সঙ্গে আজ যোগ হল গাড়োয়াল রেঞ্জের বিরেডা গ্রামের 'থারো-ব্রেড' খচ্চরের গায়ের গন্ধ।

বৃষ্টিতে ভিজলে মোটা-মোটা রোমওয়ালা চতুষ্পদ জন্তুদের গায়ের গন্ধ ভুরভুরায়। তা তারা বন্যই হোক কী গৃহপালিত।

চারণ জানে।

চারণের মা বলতেন, ও যখন ছোট ছিল তখন ওর মাথাতে উড়ন-চাঁটি মেরে বলতেন, তুই একটা গন্ধ-গোকুল, বলতেন, "ছুছুন্দরকী শর পর চামেলিকি তেল।"

কেন বলতেন, তা জানে না। খচ্চরের গায়ের গন্ধটা কিন্তু তীব্র হলেও বেশ বন্ধুভাবাপন্ন। চারপেয়ে প্রাণী বলেই এই প্রজাতিকে গন্ধ দিয়েই দূর থেকে চেনা যায়। এদের চেনা, দুপেয়ে 'খসসরদের' মতন কঠিন নয়। 'খসসরদের' গায়ে নিজস্ব কোনও গন্ধ নেই। যে-ধান্দা নিয়ে তারা যখন ঘোরে তাদের গা থেকে তখন সেই ধান্দার গন্ধ ছাড়া অন্য সব ধান্দার গন্ধই ওড়ে।

এও 'খসসরদের' এক ধরনের 'খসরামি'।

চারণও নীচে পৌঁছেছে আর সাদা মারুতি এস্টিমটাও এসে পৌঁছল।

www.MurchOna.com

চারণ, কুমার ট্রাভেলস-এর ভাড়া গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে এক বামাকণ্ঠ ওই গাড়ির দরজা খুলে নেমেই ইংরেজিতে বলল, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। ইন দিস আউট অফ দ্য ওয়ার্লড প্লেস! চারণদা-দা+আ+আ+আ!

চারণ, বিষম খাওয়ার মতন চমকে উঠে দেখল, মিলি!

তুমি!

দক্ষিণ কলকাতার সোসাইটি-গার্ল, ক্লাব-পার্টি করা, রেসের মাঠে যাওয়া সুন্দরী মিলিকে এখানে দেখে অবাক হল চারণ।

মিলি একটা কমলা-রঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। সাদা সিল্কের ব্লাউজ। কপালে কমলারঙা বিন্দি, পায়ে চামড়ার কমলা-রঙা চটি। হাতে, এক্সপোর্ট-লেদারের নরম কমলা-রঙা ব্যাগ, কোমরে রুপোর পৈঁছা আর এক বিঘৎ অনাবৃত ফরসা মসৃণ পেট-দেখানো কোমর থেকে গোঁজা কমলা-রঙা রুমাল। পেটটা এমন করে দেখায় ও, যেন পেট দেখলেই পেটের নীচে কি আছে তা দেখতে ইচ্ছে যায় দেখ-ভাল করণেওয়ালা পুরুষদের।

চারণদা! আপনি এখানে? অফ অল প্লেসেস, এই গড-ফরসেকেন কুঞ্জাপুরীতে?

হু সেইড সো? দিস প্লেস, আই অ্যাম টোল্ড, ইজ ভেরি মাচ অ্যান অ্যাবোড অফ গড। আই মীন, গডেস।

তা বলতে পারেন। আপনি যেখান থেকে নেমে এলেন সেখানে আর কোনও ভগবান থাকেন তা আমি জানি না, কিন্তু আমার ভগবান অবশ্যই থাকেন।

ভয়ে চারণের পেট গুড়গুড়িয়ে উঠল।

মিলিটা তো ফার্স্ট-রেট-ফ্লার্ট হয়ে উঠেছে। ভাবল, চারণ।

তারপর তুতলে বলল ই-ই-ইয়ার্কি কোরো না। তুমিই বা কোত্থেকে? পথ ভুলে?

ওপাশের দরজা খুলে কাৎলা মাছের মতন লাল-চোখো এবং বোয়াল মাছের মতন মুখশ্রীর বেঁটে-বাঁটকুল ফেডেড-জিনস আর 'ওয়্যারহাউসের' ক্যাজুয়াল-ওয়্যার একটা খাকি জামা পরে নামলেন একজন। তিনি ডান হাতের আড়াইখানা আঙুল তুলে শিঙ্গিমাছের লেজেরই মতন দ্রুত নাড়িয়ে বললেন, হাই!

চারণও যন্ত্রচালিতের মতন বলল, হাই!

এ. কে. ফর্টিসেভেনের গুলির মতন এফর্টলেসলি বেরিয়ে গেল শব্দটা।

তারপরে চারণ বলল, ইনি?

ও, আই অ্যাম সরি। ইনি গবেশ গুহ।

চারণ ভাবল, 'শ'টি কর্তন করে 'ট' বসিয়ে দেওয়া উচিত অবিলম্বে।

আর এই যে!

যে ডিমিন্যুটিভ ভদ্রমহিলা গাড়ির পেছনের সিট থেকে নামলেন, শুশুকের মতন, কিন্তু সাদা শুশুক, তাঁর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল মিলি, এই যে, আমাদের চামচুমা বৌদি।

নমস্কার!

বলল, চারণ।

মিলি বলল, হরিদ্বারে ফ্ল্যাট কিনেছেন গবেশদা। ওঁরা বিষনই ভালবাসেন হারডয়ার।

চারণের ইচ্ছে হল বলে, যে কোনও HARDWAREই ওঁদের অবশ্যই ভালবাসেন! ভালবাসাবাসিতে মিউচুয়ালিটিই হল প্রধান শর্ত।

কেমন দেখলেন মন্দিরের বিগ্রহ? দেবা, না দেবী?

আমি মন্দিরের ভিতরে ঢুকিনি।

মাই গুডনেস। হোয়াই?

আমি ঢুকি না কোনও মন্দিরেই।

সিলি! হাইট অফ স্টুপিডিটি চারণদা-আ+আ।

www.MurchOna.com

ফোর-প্লে করার পরেও প্রবেশ না করে চলে যাওয়া। হাউ মরবিড।

বলেই, গবেশ হাসল।

খিঃ খিঃ। করে, হাসল মিলি।

চারণ অফেন্ডেড হল। মিলির বাবা পর্যন্ত তাকে সম্মানের চোখে দেখতেন আর মেয়েটার কোনও পাত্র-জ্ঞান নেই।

বিরেডা গ্রামের নাম না জানা ছেলেটার ইনোসেন্ট খচ্চরটার গন্ধ ফিরে এল ওর নাকে। তার পরেই এই দুপেয়ে মেয়ে খসসর-এর। এটা নতুন খসসর। এখনও গন্ধ ক্যামোফ্ল্যাজ করা শেখেনি।

ভাবল, চারণ।

চামচুম বৌদির মাথার উপর দিয়ে মিলির স্থূল রসিকতা এবং ইংরেজি ভাষা, বাউন্সার এর মতন বেরিয়ে গেল। চার হাত পা এবং তাঁর তাবৎ বুদ্ধির বেঁটে ব্যাট ঘুরিয়েও তিনি খেলতে পারলেন না মিলিকে।

পরক্ষণেই চারণের মনে হল, গবেশ কোনও অশিক্ষিত বড়লোকের মেয়েকে ফাঁসিয়েছে অথবা তার বাবাই গবেশকে ফাঁসিয়েছে। বড়লোকদের মধ্যে অধিকাংশই অবশ্য অশিক্ষিত। কিছু ক্ষমতান্ধ শিক্ষিতর মধ্যে শিক্ষার গুমোর অবশ্য থাকে। প্রকৃত শিক্ষিত নন বলেই থাকে।

মোটা চামচুম বৌদি ফুলে ফুলে হাসলেন। হুঃ হুঃ হাঃ হাঃ।

অবভিয়াসলি-মোটা, রসিকতার বিন্দুমাত্রই না বুঝে।

চারণের ভাল লাগল চামচুম বৌদিকে। কোনও প্রিটেনশানস নেই। অ্যাজ পিওর অ্যাজ ছ-মাসের গান্দাগোব্দা ছাগলছানা। মানে, মানসিকভাবে, যদিও শরীরে তিনি জলে-ঢেউতোলা শুশুক।

আপনি কোতায় উটেচেন ?

মন্দাকিনী হোটেলে।

ও+ও+ও ম+অ+আ+আ। আমরাও তো সেকানেই চেক-ইন করে সোজা একানে আসচি। কাল সকালে পাহাড় চড়ব। মানে, গাড়িতে। আপনার ঘরের নাম্বার কত ?

আমি আজ বিকেলেই চেক-আউট করে চলে যাব।

চারণ মিথ্যে বলল।

যাবেন কোতায় ?

চারণের ইচ্ছে হল যে বলে, জাহান্নামে। কিন্তু বলল, কিছু না ভেবেই, চাম্মাতে।

সেটা কোথায় ? বাট হোয়াই ? নো-ও-ও। ড্যু কান্ট। রাতে আমরা ডিনার খাব একসঙ্গে।

চারণ বলল, মিলির মানসিকতার স্তরে নিজেকে অদৃশ্য প্যারাসুট দিয়ে নামিয়ে এনে, মাই ফুট! ডিনার! রুটি-তড়কা না রুটি পালক-পনির ? ডিনার ? আর তার পর ? নাচবে কোথায় ? তোমার তো শুনেছি ডিনারের পর না নাচলে ডিনার হজম হয় না। তা, এ কি তাজবেঙ্গল পেয়েছ ? 'ইনকগনিটো' আছে এখানে ভেবেছ বুঝি ?

গবেশ মধ্যে পড়ে এবারে খাটাশের মতন হাসল, খোঃ। খোঃ।

মিলি বলল, আপনিই তো আচেন। আপনিই আমার তাজ বেঙ্গলের 'ইনকগনিটো', এবং ওবেরয় গ্রান্ডের 'পিংক-এলিফেন্ট।'

চামচুম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তাকে দেখলে মনে হচ্ছে, দাঁড়াতেও ভারী কষ্ট তার। তাকে শুইয়ে দিলেই আরামে থাকে। এতই মোটা সে মহিলা!

চারণ মনে মনে বলল, মিলিকে, পেঁচি, ক্ষ্যামা দে।

চুপ করে আচেন কেন চারণদাদা ?

মিলি অধৈর্য গলাতে বলল।

www.MurchOna.com

চারণভূমিতে যেতে হবে আমার।
সেটা কি জিনিস আবার।
সংসদের অভিধান দেখে নিও।
সেটাই বা কি ? কী যে কুইজ করো না তুমি।
গবেশ শব্দের মানে কি স্যার ?
গবেশের দিকে ফিরে হঠাৎই জিজ্ঞেস করল চারণ। কথা ঘুরিয়ে।
ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং, গলাটা একটু খাঁকরে নিয়ে গবেশ বলল, আমি জানি না স্যার।
সে কি ! নিজের নামের মানে জানেন না ?
না চারণদা।
চারণ মনে মনে গায়ে-পড়া, বোয়াল-মুখো, কাৎলা-চোখো লোকটার উপরে চটলো।
চেনা নেই শোনা নেই, দাদা ! বঙ্গভূমের এই এক কাদা !
নাম দিয়েছিলেন কে ?
বাবা-মায়ের দেওয়া নাম তো ছিল প্রাণধন। তা চামচুম আমার সঙ্গে বিয়ের পরে বলল, তুমি প্রাণ তো নয়ই, ধনও নয় !
চামচুম ডলফিনের মতন শব্দ করে হাসল।
ধনও নয় কেন ? বাংলার সব ছেলেই ধন। 'ধন ধন ধন, আমার সো-না-র খো-ও-কন।'
শোনেননি ?
চারণ বলল।
না, তা নয়, চারণদা। আমি আমার স্ত্রীকে খুব বালবাসি। তাই, অ্যাফিডেভিট করে নামটা বদলে নিলাম।
গবেশ নামটা ঠিক করেছিলেন কে ? এরই বা মানে কি ?
নাম ঠিক করে দিয়েছিল চামচুমই। তবে মানে, ওও জানে না।
সে কী।
আজ্ঞে।
এ নামটা বুদ্ধদেব গুহর কোনও উপন্যাসের নায়কের নাম। এমন সব উদ্ভট উদ্ভট নাম দেন না ভদ্রলোক !
আপনার স্ত্রী বুঝি বুদ্ধদেব গুহর ভক্ত ?
না, না, আমার স্ত্রী নন। আমার মেয়েকে যিনি বাংলা পড়ান, সেই দিদিমণি।
মিলি ফুট কাটল, হ্যাঁ। সে বিষনই বক্ত।
বাংলা তো আমার মেয়ে পড়তেই চায় না অনেক আধুনিক 'শিক্ষিত' বাঙালির মতন।
গর্বিত গলাতে বললেন গবেশ অথবা গবেট,
তা, উনি নামের মানেটা বলেননি ? মানে, মেয়ের বাংলা দিদিমণি ? নামটা তো ওঁরই দেওয়া ?
না, না। নাম আমিই দিয়েছি।
এবারে চামচুম বললেন।
তারপর বললেন, রিনা বলল, একটা উদ্ভট নাম দিয়ে দাও। বুদ্ধদেব গুহ ঠিক একটা মানে বের করে দেবেন।
চারণ হেসে বলল, তাই ? বাঃ দ্য জোক অফ দ্য ইয়ার। গ্রেট লেখক তো !
ভাবল, এদের জন্যেই বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থা। ঘিলু বলতে কিছু নেই, বাবরির বাহার।
মিলি বলল, কতবার বললুম। তোমার নাম রাখো গলিয়াথ, গবেশ বদলে, তা শোনে কই ?
গলিয়াথ ?
স্তম্ভিত হয়ে বলল, চারণ।
হ্যাঁ গলিয়াথ ! হোয়াই নট ?

www.MurchOna.com

মিলি যেন চারণের মনের কথাই আঁচ করে বলল, আমি কিন্তু ওইসব ট্র্যাশ পড়ি না। আমি কোনও বাংলা বই-ই পড়ি না।

পড়বেই বা কেন ? তুমি তো মেমসাহেব।

ওয়েল, উ্য ন্যো চারণদা, আই অ্যাম।

বলেই বলল, তুমি কি নীচে নামছ ?

চারণ হেসে বলল, নীচেই তো নামছি সারাটা জীবন। নীচে নামা তো চিরকালই সহজ মিলি। তুমি তারাশংকরের 'দুই পুরুষের' সুশোভনের ডায়ালগটি জানো না বুঝি ? নাটকের রেকর্ডও ছিল। জহর গাঙ্গুলি অভিনয় করতেন ওই চরিত্রে, আর ছবি বিশ্বাস, নুটুবিহারী। পড়েছ কি দুই পুরুষ ?

না। পড়িনি। বললামই তো যে, বাংলা পড়িনি। বলো না, কী ডায়ালগ ?

নুটুবিহারী মোক্তার, মাতাল সুশোভনকে বললেন, 'তোমার এত বড় অধঃপতন হয়েছে সুশোভন ?'

জবাবে সুশোভন বললে, জড়ানো গলাতে, 'পতন তো চিরকাল অধঃলোকেই হয় নুটুদা। কে আর কবে উর্ধ্বলোকে পড়েছে বল ?'

খোঃ খোঃ করে গবেশ হেসে উঠল।

মিলি বলল, ওয়ান্ডারফুল।

তারপর বলল জানো, মাঝে মাঝে মনটা খারাপ লাগে, নিজে বাঙালি হয়েও বাংলা সাহিত্য পড়িনি, পড়িনা বলে। কিন্তু এত প্যানপ্যানে, ম্যাদামারা না, যে পড়তে ইচ্ছেই করে না। তবে বাঙালি লেখকদের জন্যে আমার ফিলিং আছে। মাই। মাই। হাউ পুওর দে আর। দে লিভ লাইক দ্যা ব্ল্যাকস লিভিং ইন ন্যু ইয়র্কর্স ঘেট্টো। বিক্রম শেঠ, দুধের শিশু, একখানা 'দ্য স্যুটেবল বয়' লিখেও মাল্টি-মিলিয়েনিয়র হয়ে গেল। আর বাংলাতে যাঁরা লেখে ? খেতে পায় না চারণদাদা, খেতেই পায় না। ওয়াট আ পিটি।

সে কথা অবশ্য বেঠিক নয়।

মিলি বলল, তবে খবর-কাগজের সঙ্গে যাঁরা আছেন, মানে চাকরি করে, বা না-করেও চাকর এবং সেখানে নিয়মিত লেখেন তাঁরা সকলেই ওয়েল-অফফ বলে শুনেছি। ফ্ল্যাট আছে, গাড়ি আছে।

তেমনই শুনেছি অবশ্য। চারণ বলল।

দ্যাটস রাইট। অনেকই করেছে খবর কাগজেরা, হা-ভাতে লেখকদের জন্যে, কবিদের জন্যে।

গবেশ বলল। মানে, তাঁদের ভাত-কাপড়ের জন্যে।

আপনি এত জানলেন কি করে ?

চারণ শুধোল।

আমার আপন মাসতুতো ভাইয়ের আপন সেজ ভায়রাভাই-এর মেজ ভগ্নীপতি যে জার্নালিস্ট।

ও। তবে তো জানতেই পারেন। অবশ্যই পারেন।

চারণ বলল।

তারপর বলল, বাংলা সাহিত্য পড়েন না অথচ বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি যে আপনার এতখানি কনসার্ন তা তাঁরা জানতে পেলে প্রীত হতেন। খবর-কাগজেরাও হয়তো খুশি হতেন তাদের পুণ্যকর্মর অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্যে।

মিলি হঠাৎই বলল, বাঈ। পুণ্য করতে যাই।

চারণ, যেন শুনল, "উঠল বাই তো কটক যাই।"

মিলি বলল, আমরা কিন্তু দেবভূমিতে এক-ক্রেট হুইস্কি স্মাগল করে নিয়ে এসেছি। রাতে জমে যাবে। হিঃ হিঃ।

শুকনো থাকতে পারি না মা শ্যামা, আমার কারণ বারি চাই।

কাৎলা-চোখো বোয়াল-মুখো গবেশ বলল।

তারপর হাসল, খিঃ খিঃ।

www.MurchOna.com

চামচুম আশ্রম-মৃগীর মতন ড্যাবা-ড্যাবা চোখে চেয়ে রইল তার স্বামীর দিকে। মৃগীরা ছাগীদের কাজিনস।

মনে পড়ল চারণের।

চারণের চিন্তা হল চামচুমের জন্যে। যে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই পারছে না, সে ওই তিনশ ষাটটি সিঁড়ি উঠবে কি করে!

মিলি এগিয়ে যেতে যেতে বলল, বাঈ। আজ রাতে যাবেন না প্লিজ। এই মরুভূমিতে আপনিই ওয়েসিস।

চারণ দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওরা উঠতে লাগল উপরে।

গবেশ রেলিং ধরে কচ্ছপের মতন উঠছিল আর চামচুম নীলগিরি হিলস-এর স্লো-লরিস বাঁদরির মতন, ভূকম্পন তুলে, ছেদড়ে ছেদড়ে। আর মিলি উঠছিল ক্যাট-ওয়াকিং করে। যেন কুঞ্জাপুরীতে আজ দুপুরে কোনও অ্যাড-এজেন্সি আয়োজিত ফ্যাশান-প্যারেড আছে।

গাড়িতে বসে, ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট করতে বলে, ও ভাবছিল, ওর মুক্তি নেই, মুক্তি হবে না। যে-অনুষঙ্গ ওকে ঘিরে ছিল, যে কালিমা, যে কলুষ, যে সস্তা বিত্তবেষ্টিত সাধারণ্য ওর পা দুটিকে, বাদার দলদলিরই মতন জড়িয়ে ছিল, তা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করা হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

মিলির মতন, গবেশের মতন, চামচুমের মতন অগভীর মানুষেরা কুঞ্জাপুরীর মন্দিরে এত কষ্ট করে উঠে কী খুঁজবে কে জানে! হয়তো কলকাতাতে ফিরে ঝলমলে ড্রয়িংরুমে বা ক্যালকাটা ক্লাবের লেডিজ কফি-মিট এ কুঞ্জাপুরী দেখার রোমহর্ষক গল্প করবে, যেমন ভাবে রাজস্থানের রানথামবোর স্যাংচুয়ারিতে বাঘ দেখার গল্প করে।

কিছু মানুষ সংসারে চিরদিনই ছিল, আছে এবং থাকবে, যারা চিরটা জীবন অন্যকে ইমপ্রেস করার জন্যেই বেঁচে থাকে। মৃত্যুর ক্ষণ অবধি। যখন যম ডাকে, শুধু তখনই বুঝতে পারে, এ জন্মটা বৃথাই গেল। নিজের জন্যে কিছুমাত্রই করা হল না। মিলিরও এই জন্মটাও হয়তো তেমনভাবেই যাবে। তবে গবেশ আর চামচুমের কথা বলতে পারে না চারণ। অত অল্প সময়ে দেখে কোনও মানুষকেই বিচার কথা উচিত নয়। বাইরে থেকে, কচ্ছপদের, খোলার জন্যে সঠিক দেখা যায় না। তাদের চিৎ করিয়ে ফেলতে হয়। তাতে, সময় লাগে। এমনও হতে পারে যে, গবেশের মধ্যে হয়তো খুবই গভীরতা আছে। সেও মিলিকে ইমপ্রেস করারই জন্যে এই মূর্খর মুখোশ পরে আছে। এমন অনেক মানুষ ও মোসাহেব দেখেছে তার পেশার জীবনে। কারোকেই বহিরঙ্গ রূপ দেখে বিচার করতে নেই তড়িঘড়ি। ঠকতে হয় তাতে।

ভাবছিল চারণ, তার পেশাতে সে সমাজের এমনই Cross-section নিজ চোখে দেখেছে, দূরে এসে সেই অভিজ্ঞতার গভীরতা এখন বুঝতে পারে। এবং পেরে, চমৎকৃত হয়।

পেশা থেকে অর্থ যা পেয়েছে! মান যা পেয়েছে তা তো পেয়েছেই। মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মেছে, সেও তো ফ্যালনা নয়।

মিলিও তার এক মক্কেলেরই কন্যা। যেমন ছিলেন পাটনের বাবাও। দুজনের বাবারই একটাই অসুখ। সে অসুখের নাম টাকা। লক্ষ্মীদেবীর মতন ছিন্নমতি দেবী বোধহয় বেশি নেই। দশটির মধ্যে নটি ক্ষেত্রেই তিনি গিয়ে ভুল বাড়িতে ঢোকেন কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তরা প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁকে পুজো করে, লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে যারা দরজার বাইরে থেকে সিন্দুক বা আলমারি পর্যন্ত লক্ষ্মীর পা আলপনায় আঁকে, পরম যত্নে চালের গুঁড়ো আর ময়দার পিটুলি দিয়ে, তাদের বাড়িতে না গিয়ে, যাদের বাড়িতে তাঁর আরাধনা আদৌ হয় না, তাঁদের বাড়িতেই গিয়ে ওঠেন তিনি।

অর্থর মতন অনর্থ যে আর দ্বিতীয় নেই, গোবরের মধ্যে, পুরীষের মধ্যে, পচা-কাঠের মধ্যে, ঝুরো-মাটির নীচের অর্থবানদের, পোকামাকড়েরই মতন তার নৈর্ব্যক্তিক পেশাদারি দৃষ্টি, এবং পর্যবেক্ষণের কাঠি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে এই সিদ্ধান্তেই এসেছে চারণ।

এই প্রেক্ষিতে চারণ অবশ্যই বলবে যে, পাটন ছেলেটা তাকে একেবারেই বুদ্ধু বানিয়ে দিয়েছে।

www.MurchOna.com

বুদ্ধ সিংকে সঙ্গে নিয়ে, একদিন ভিয়াসির কাছে পাটনের ভোঁদাইবাবার আশ্রমে তাকে যেতেই হবে। পাটনের বাবার মতন এমন একজন ছোট মনের, নিষ্ঠুর, স্বার্থমগ্ন ধনকুবের বেশি দেখেনি চারণ। তাঁদের ছেলেমেয়েরা সাধারণত মিলির মতনই হয়। পাটনের মতন নয়।

মিলি বিবাহিত। তার স্বামী ঘরজামাই। হাবা-গোবা, একজন অতি সাধারণ ঘরের, বি এ পাশ, উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন ছেলের সঙ্গে মিলির বিয়ে দিয়েছিলেন মিলির বাবা, নাতি-নাতনি নিয়ে খেলা করবেন বলে, যেমন করে তিনি তার জার্মান স্পিৎজদের নিয়ে খেলেন। কিন্তু বিধি বাম। চারণ জানে না, মিলি আদৌ তার স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেছে কি না! বিয়ে অবশ্য হয়েছে মাত্র তিন বছর। তবে সহবাস করার মানুষের অবশ্য মিলির অভাব নেই। এখনও মনে সন্তানের ইচ্ছা জাগেনি হয়তো, তাই সন্তান আসেনি। তবে যখনই আসুক, মিলির সন্তান সম্ভবত কানীনই হবে। জীবনকে তার মতন করে উপভোগ করার সাধ আছে মিলির। সাধ্যও আছে। কিন্তু সাহস নেই। ও যদি কোনও মনোমতো পুরুষ সঙ্গীকে একা নিয়ে আসত এখানে, তাও বুঝত চারণ। কিন্তু এই গবেশ আর চামচুমের গুণগত মান সম্বন্ধে আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেনি ও। অবশ্য ওর সন্তুষ্টি নিয়ে মাথাই বা কে ঘামাচ্ছে! এইসব অশিক্ষিত অর্থবানদের প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা জিনিস দেখেছে ও, যা কমোন। তা হচ্ছে, এঁরা কেউই কোনও স্বার্থ যেখানে নেই, সেখানে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন না। মোসাহেব ও চাকর-বাকর ছাড়া, এঁরা কারও সঙ্গেই মিশতে পারেন না।

মিলির বাবা হরিচরণবাবু হাওড়াতে থাকতেন এখনও। মিলিই একমাত্র সন্তান। হরিচরণবাবুর স্ত্রী মিলির বিয়ের আগেই গত হয়েছিলেন। হরিচরণবাবুও গত হয়েছেন বছর দুয়েক হল। তারপরই মিলি এই মিলি হয়েছে। বাড়িতে তার স্বামী জনার্দন কুকুরদের দেখাশোনা করে, খরচের হিসাব রাখে, তিনখানা গাড়ি সার্ভিস করায়, মেরামত করায়, ফার্নিচার ঝাড়পোঁছ করায়, ঝাড়গ্রামের বাগানবাড়ির দেখাশোনা করে। জনার্দন ছেলেটা খুব শান্ত। এবং ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি এ পাশ করেছিল। ভাল ছেলে। বেচারি। ও যদি জানত যে, ওর জীবদ্দশাতেই ও নিজেই ইতিহাস হয়ে যাবে তবে কী করত কে জানে! সবচেয়ে বড় কথা, নিম্নবিত্ত গরিব মা নিজের এবং ওর সুরাহার জন্যে কোটিপতির একমাত্র সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ আসাতে গদগদ হয়ে রাজি হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন যে, ওঁর হাওড়ার কদমতলা লেন থেকে বেরোনো সরু গলির মধ্যে তাঁর ভাড়া বাড়িতে এসে মিলি ঘর আলো করবে। ওঁর সব স্বপ্নই বিফল হয়ে ছিল। একাই থাকেন সেখানে। একটা মেয়ে রেখে দিয়েছে জনার্দন তার হাতখরচের টাকা থেকে।

এই জনার্দন ছেলেটা চারণের কাছে এক বিস্ময়। কোনওরকম জাগতিক চাহিদা শূন্য ছেলেটা। ইতিহাসে বি এ-র চাকরি হয় না সহজে। হলেও, মাকে ছেড়ে সে যেতে পারত না, যেতও না। তাই ভাগ্যের হাতে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। আজকের দিনেও লক্ষ লক্ষ বাঙালি ছেলে যা করে।

চারণ এতদিন জানত 'পুত্রার্থে ভার্যা'। কিন্তু জনার্দন 'পুত্রার্থে স্বামী'। অথচ সেই কাজটাও মিলি ওকে দিয়ে করাল না। কিন্তু আশ্চর্য! হরিচরণবাবু বা মিলির এত বৈভবের মধ্যে বাস করেও বড়লোকদের কোনওরকম দোষ ছুঁতে পারেনি জনার্দনকে। ও জানে, ও সব ওর নয়, ও সবে ওর অধিকারও নেই। প্রয়োজনও নেই। সংসারে থেকেও যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তা কুঁবারসিংজিরাও শিখতে পারতেন জনার্দন দলুই এর কাছ থেকে।

জনার্দনের সব দুঃখের কথা চারণ জানে, কিন্তু তা শোধন করার কোনও ক্ষমতাই ওর নেই।

হরিচরণবাবু জনার্দনকে কিছুমাত্রই দিয়ে যাননি তাঁর উইলে। বাড়ির ভিতরের একজোড়া স্পিৎজ কুকুর, বাইরে জোড়া অ্যালসেশিয়ান এবং একটি গ্রেটডেন এবং বাগানের আধডজন ম্যাকাও যেমন খেতে পায় দুবেলা, দানা এবং পানি, জনার্দনের অধিকার তাদের চেয়ে একটুও বেশি নয় এ সংসারে।

জনার্দন দুপুরে একবার মায়ের কাছে যায়। সেই তার জীবনের একমাত্র সুখ।

কত মানুষের কত রকম দুঃখ থাকে এ সংসারে তার কতটুকুই বা অন্যে লাঘব করতে পারে!

www.MurchOna.com

অন্যের কষ্ট চারণকে চিরদিনই মথিত করেছে। আজও করে। চারণ যে হরিচরণবাবুর মতন মানুষদের, পাটন-এর বাবার মতন মানুষদের সেবা করেই জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ কাটিয়ে দিয়েছে, এটা ভেবে, নিজের প্রতি অনুকম্পা হয়। আবার কখনও ভাবে, যা কিছুই ঘটে, তার পেছনে হয়তো কোনও গূঢ় কারণও থাকে, যা আদৌ আপাত-দৃষ্টিগোচর নয়।

আপশোষ হচ্ছিল, মিলিকে জনার্দনের কথা জিজ্ঞেস করা হল না বলে।

মিলি লা-মার্টিস-এ পড়েছিল নাইন্থ ক্লাস অবধি। তাই যথেষ্ট। ফটফট করে ইংরেজি বলতে পারা আর কী করে, কোথায়, মুঠো-মুঠো পরার্জিত টাকা অবহেলে খরচ করা যায়, তা জানলেই ঐ সমাজে সহজেই 'শিক্ষিত' এবং 'সপ্রতিভ' বলে মান্য হওয়া যায়। শিক্ষা আর ঔদ্ধত্য ঐ সমাজে সমার্থক। ঔদ্ধত্য বা দম্ভর আবার রকমভেদ আছে। হরিচরণবাবুদের মধ্যে কেউ কেউ রক্তকরবীর রাজার মতনই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকেন। তাঁদের বড় একটা দেখা যায় না। শোনা যায় শুধু। তাও, তাঁদের নিজের কণ্ঠস্বরেও নয়। তাঁদের চাকরবাকরেরই কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে। তাঁরা কারওকে তোলেন, কারওকে ফেলেন। অবলীলায়, অবহেলে।

লক্ষ্ণৌ-এর নবাবেরা যেমন বটেরের বা উটের দৌড় দেখতেন খেলা হিসেবে, তেমনই এই তোলা-ফেলার খেলাটাই তাঁদের একমাত্র খেলা। সাধারণত এই শ্রেণীর অর্থবানেরা কান-পাতলা হন। ফলে, অন্যদের উপরে নির্ভর করতে করতে একটা সময় আসেই, যখন একটা চক্রর শিকার হতে হয় তাঁদের প্রত্যেককেই। হিতার্থীর মুখোশ-পরা একদল চাকরই যে তাঁদের অজ্ঞাতে কখন তাঁদের মালিক হয়ে ওঠেন, তাদের পূর্ণ অনবধানে এবং মৌন-সম্মতিতে, তা বুঝতে পর্যন্ত পারেন না তাঁরা। এই দল, 'খসসর' বড়লোকদের মধ্যে হিমবাহ। তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডর সামান্যই দেখা যায়। যতখানি না বড়লোক তাঁরা, দেখান তার চেয়ে বেশি। দুহাতে টাকা খরচ করেন।

আবার আরেকদল বড়লোক আছেন, যাঁরা চেঁচান, মাথা গরম করেন, টাকার গরম দেখান। আসল ক্লাস ওয়ান গ্রেড ওয়ান বড়লোকেরা কিন্তু নিজে হাতে টাকা ধরেন না, নিজে হাতে টাকা খরচও করেন না। আয়ের টাকাও নিজে হাতে ছোঁন না, নিঃশব্দে আয় হয়, ব্যয়ও হয়, নিঃশব্দেই। তার জন্যেও মাইনে করা লোক আছে। তাঁরা কখনওই রাগ দেখান না। নিজে হাতে রেগে গিয়ে চড়চাপড়ও মারেন না, নিজ-মুখে বকেন না। তাঁরা খুন করিয়ে দেন অন্যদের দিয়ে অপছন্দর মানুষকে। আয় করার, ব্যয় করারও জন্যে তাঁদের যেমন চাকর থাকে, খুন করার জন্যে, চরিত্র-হননের জন্যেও বিভিন্নরকমের চাকরের চাষ করেন তাঁরা।

কুঞ্জাপুরীর মন্দিরের খাড়া উতরাই নেমে এসে গাড়িটা এবারে তেহরি-গাড়োয়ালের পথে নেমে বাঁদিকে মোড় নিল। পাহাড় নামার টেনশন থেকে মুক্ত হল চারণ। ড্রাইভারকে বলল, ফেরার সময়ে নরেন্দ্রনগরের ভিতরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে হবে ভাই। গাড়োয়ালের রাজারা আগে থাকতেন তো এখানে!

ড্রাইভারও গাড়োয়ালি। নাম কেশর সিং। তার বাড়ি দেবপ্রয়াগে। সে বলল, দেখাবে।

এতদিন চারণ তার পরতের পর পরত অতীতকে, তার নানা অনুষঙ্গকে ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে তোলার মতন যে তুলছিল, সেই process-টা পুরোপুরি Retarded হয়ে গেল মিলির সঙ্গে দেখা হয়ে। যে-অতীতকে সে ছোট-হয়ে-যাওয়া জামার মতন ছুঁড়ে ফেলতে চায়, ছেড়ে ফেলতে চায়, সেই অতীতই, গন্ধ-শোঁকা গন্ধগোকুল কুকুরেরই মতো মিলির মাধ্যমে তার খোঁজ পেয়ে গেল। হয়তো তার পিছু ছাড়বে না।

চারণকে পালাতে হবে আজই। পালাতেই হবে। ভাবল, মিথ্যাচার যদি ভাল কাজের জন্যে করতে হয়, তবে সেটা দোষের মধ্যে গণ্য নয়। ঠিক করল, আজই হোটেলে ফিরে ম্যানেজারকে বলে, সে চলে যাবে কেশর সিংকে নিয়ে ভিয়াসি। বুদ্ধু সিংকে পথ থেকে তুলতে পারলে তুলবে, নইলে একাই কেশর সিংকে নিয়ে চলে যাবে ভোঁদাইবাবার আশ্রমের সন্ধানে।

মিলিকে দেখার পর থেকে পাটনের কথা খুবই মনে পড়ছিল চারণের। ভাবছিল, এই মেকীর দুনিয়াতে পাটন একটি অরিজিনাল ছেলে। হাইলি ইন্টারেস্টিং। ওর কোনও প্রোটোটাইপ নেই।

www.MurchOna.com

রাবড়ি খাওয়া আর হল না। কেশর সিং বাঁয়ে মোড় নিয়ে নিয়েছিল। রাবড়ি খেতে হলে, তেহরির দিকে আরও একটু যেতে হত ডাইনে।

যাকগে।

ভাবল, চারণ। একা একা কোনও বিলাসই করতে ইচ্ছে হয় না। সেই জন্যেই হয়তো সন্ন্যাসের গোড়ার কথা 'ভেড়চাল'-এর ভিড় এড়িয়ে একা হয়ে যাওয়া।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্রনগরে পৌঁছনো গেল। হৃষীকেশ-এর পথ ছেড়ে শহরের ভেতরে ঢুকল কেশর সিং। বাজারটা প্রধান পথের উপরেই পড়ে। অনেকটা মোগলদের হাভেলি এবং হারেমের মধ্যে যে বাজার থাকত তেমন। দুপাশে সার সার দোকান, মধ্যে দিয়ে পথ। এখনও দিল্লির লালকেল্লাতে যেমন আছে। যাওয়ার সময়ে দ্রুত চলে গেছিল, ভাল করে দেখেনি।

একটু পরেই নির্জনে পৌঁছে রাজার প্রাসাদ দেখা গেল। এখন হৃত-গৌরব, ভাগ্য-হত, অস্তমিত-সূর্য কিন্তু এক সময়ের প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজা, মহারাজা, শিল্পপতি, রাজনীতিক এবং মিডিয়া-মালিকদের নরেন্দ্রপুরে একবার আসা দরকার। আসা দরকার এই সরল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে এই প্রাসাদ দেখে যে, কোনও রাজত্বই চিরকালীন নয়, কোনওরকম অন্যায়কারীর রাজত্ব তো নয়ই! যতদিন অর্থ, বাহুবল এবং নানাবিধ ক্ষমতা থাকে, ততদিন তাতে "অন্ধ" না-হয়ে ঐ সবের অনিত্যতার কথা মনে রেখে মানুষের সঙ্গে মানুষের মতন ব্যবহার করা যে উচিত ছিল, এই কথা, এই সব করুণ ছবি, হয়তো তাঁদের মনে করিয়ে দিতেও পারে। অবশ্য যদি মনুষ্যত্ব তাঁদের মধ্যে তখনও বিন্দুমাত্র বেঁচে থাকে।

গাড়োয়াল রাজের রাজধানীর মূল রাজবাড়িতে এখন কেউই থাকেন না। তা, ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখার মতন রেস্তও আজকের রাজার নেই বলে মনে হল। নইলে, বহুবর্ণ লম্বকর্ণদের মিটিং বসত না সুউচ্চ, চওড়া, অগণ্য ধাপ-সম্বলিত সিঁড়িতে।

রাজা কোথায় থাকেন?

জিগ্যেস করাতে, কেশর সিং চারণকে বলল, পেছনের দিকের একটা অংশে। রাজবাড়ির পেছন দিকের গেট দিয়ে ঢুকতে হয়। তবে গেট-এ তালা দেওয়া থাকে। একজন মাত্র দারোয়ান আছে। ভারী পর্দা ঝোলে একতলার স্বল্পকটি ঘরের বড় বড় জানালা থেকে দিনের বেলাতেও। এই জন্যে যে, যদি কেউ ভেতরে ঢুকেও আসে, তবেও যেন কিছুই দেখতে না পায়। রাজা নাকি দিন-রাত মদ খান।

কেশর সিং তারপরে বলল, ভিতরে কি যাবেন পেছন দিক দিয়ে?

চারণ বলল, না, না। ঠিক আছে।

তারপর চারণ নিজেকে বলল, সব জিনিসই নিজে চোখে দেখার উদ্‌গ্র বাসনার মধ্যে একধরনের অশিক্ষা আছে। অবশ্যই আছে। চানঘরে না-বলে ঢুকে পড়ে কোনও স্নানরতাকে দেখতে, আর হৃত-রাজ্য, হৃত-দৌলত কোনও রাজার অ-সুরক্ষিত বাসস্থানে অমন ঢুকে পড়তে, তার রুচিতে বাধে। তাছাড়া, অনেক কিছুই না-দেখেই দেখা যায়। কল্পনা দিয়ে। মানুষ হয়ে জন্মানো বড় সৌভাগ্যের কথা। এই কল্পনার দান কি বিধাতা অন্য প্রাণীকে দিয়েছেন?

জানা নেই।

থাকুন রাজা, আহত-বাঘের মতো তাঁর নিভৃতির আড়ালে, ক্ষতস্থানের রক্ত জিভ দিয়ে, আক্ষেপ আর ক্ষোভের লালার সঙ্গে চাটুন তিনি সকল দুঃখহারী মদের সঙ্গে। তাঁর নিভৃতি তাঁরই থাকুক। ভাগ্যহতকে যদি গলা-খাঁকারি দিয়ে জানান দেওয়া যায় যে, তিনি ভাগ্যহত, তাতে আর যাই হোক, যিনি জানান দেন, তাঁর মানও যেমন বাড়ে না, তেমনই ভাগ্যহতর দুঃখও কমে না। প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই সম্ভবত উচিত, এই শিক্ষাতে শিক্ষিত হওয়া। কতটুকু চোখে দেখবেন আর কতটুকুকে দূর থেকে কল্পনা দিয়েই ভরিয়ে নেবেন, অন্যকে কোনওরকম অস্বস্তিতে না ফেলে, সেই discretion-এর ব্যবহার জানাটা শিক্ষার অঙ্গ অবশ্যই!

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল চারণ, কেশর সিংকে।

www.MurchOna.com

তেহরি-গাড়োয়ালের পথ ছেড়ে দেরাদুন রোডে পড়ে যখন হৃষীকেশের দিকে বাঁয়ে ঘুরল গাড়িটা তখন চারণ কেশর সিংকে বলল, ওর কোম্পানিতেই যেতে। মানে, কুমার ট্র্যাভেলস-এ। হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ রোডের উপরে।

সেখানে যখন পৌঁছল তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। ওখান থেকেই মন্দাকিনী হোটেলে ফোন করে বলল যে, যদি কেউই ওর খোঁজ করে, তাহলে বলতে যে ও চাম্মাতে চলে গেছে।

সেখান থেকে হয়তো মুসৌরি হয়ে, দিল্লি হয়ে কলকাতাতে ফিরে যাবে। এবং এও বলতে বলল যে, হোটেল থেকে চেক-আউট করে চলে গেছে চারণ।

ম্যানেজার উত্তরপ্রদেশের মানুষ। জিন্দা-দিল।

বললেন, কিঁউ সাহাব, মার্ডার-উর্ডার তো কিয়া নেই না ? ম্যায় কোই লাফরামে তো নেহি ফাঁসে গা ?

নেহি নেহি জি ! ম্যায় মার্ডার নেহি কিয়া মগর খুদকো মার্ডার হোনেকা ডর হ্যায়। উসী কারণমেই ঝুট বোলনে পড়েগি আপকি।

ম্যানেজার রসিক লোক। বললেন, ঠিক হ্যায়। হররোজ সুবে সে সামতক তো আপনা আপনা রোটি-ডালকে ফিক্করমে বহুতই ঝুট সবহিকা বোলনাহি পড়তা, কিসিকো জান বাঁচানে কো লিয়ে এক ঔরভি ঝুট বোল দেগা। আপ বেফিক্কর রহিয়ে।

তারপর বলল, রাতমে খনাত লিজিয়েগা না ?

চারণ বলল, কুছ কহ নেহি শকতা। ভিয়াসিকি তরফ যানেকা বিচার হ্যায়। খয়ের, হুঁয়া রোক গিয়া তো রাতমে লওটনে নেহিভি শকতা।

ভিয়াসিমে ?

বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, ম্যানেজার।

তারপর বললেন, অজীব বাত। হুঁয়া আভ্‌ভি হ্যায় কেয়া ? হামারা কোঈ ভি যাত্রী তো হুঁয়া যাতে নেহি। মগর হাঁ। পাস কর যাতা হ্যায় জরুর। দেওপ্রয়াগ যানেকি রাস্তেমেহিতো পড়তা না ভিয়াসি !

হ্যাঁ। ম্যায় জানতা হুঁ।

তব ঠিক হ্যায় সাহাব। রুম বেয়ারাকো বোল দুংগা ম্যায়, কামরা ঠিক-ঠাক করকে রাখে গা।

সুক্রিয়া।

বলল, চারণ।

চারণ, গাড়ি ওখানেই ছেড়ে দিল। তবে কুমার ট্র্যাভেলস-এর মালিককে বলল যে, তিনটে-চারটের সময় ফিরে ও বেরোতে পারে। ঠিক নেই। কেশর সিং তখন থাকলে ভাল হয়।

মালিক বললেন, গাড়ি দেব ঠিকই সাব কিন্তু কোন ড্রাইভার আর কোন গাড়ি তা আগে থাকতে বলা শক্ত। আপনি যদি সকাল থেকে পুরোদিনের জন্যে নিতেন তো কথা অন্য ছিল।

ও বলল, ঠিক আছে।

তারপর ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোল। ঠিক করল আজ ওই ঘাটেরই কাছাকাছি কোনও দোকানে কিছু খেয়ে নেবে।

হাঁটতে হাঁটতে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে যেতে যেতে ভাবছিল ও, কে জানে। এখন ভীমগিরিকে পাবে কি না ঘাটে।

না পেলে ?

এই কদিনে ও যে এতখানি ভীমগিরি-নির্ভর হয়ে উঠেছে এই সত্যটা বারে বারে উপলব্ধি করে ভীষণই বিরক্ত হল। একা থাকতে পারে, একা ভাবতে পারে, এই গুণ ওর আছে বলেই একধরনের শ্লাঘা জন্মে গেছিল মনে কিন্তু এই হৃষীকেশের ভীমগিরি সন্নিসী তাকে পুরোপুরি পর-নির্ভর করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে ক্রমশই। এমন মুক্তি তো ওর আদৌ প্রত্যাশিত ছিল না।

ঘাটে যখন পৌঁছল তখন ভিড় পাতলা হয়ে গেছে। নিত্যই যাঁদের যাতায়াত, তারা ঘরে গেছেন

www.MurchOna.com

খাওয়া-দাওয়া করতে কিন্তু ভ্রমণার্থী যাঁরা, বহু দূর দূর দেশ থেকে যাঁরা আসছেন, কেউ বা কেদার-বদ্রী যাবার পথে ঢুঁ মেরে যাচ্ছেন, তাঁদের ভিড় সবসময়ই লেগে থাকে ত্রিবেণী ঘাটে। এবং আছে।

ভীমগিরিকে দেখা গেল না। কিন্তু তাঁর গুরু ধিয়ানগিরি যথারীতি লুঙির মতন করে ধুতি আর গায়ে একটা হাতওয়ালা সাদা গেঞ্জি পরে সামনে ঝুঁকে তাঁর কোণটিতে বসে আছেন। গায়ের উপরে আড়াআড়ি করে একটা নস্যি-রঙা বহু-ব্যবহৃত গরম চাদর ফেলা। উনি মনোযোগ দিয়ে এবং তাঁর চারপাশের প্রতিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে কী একটা তারের বাজনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন।

দেখল বটে চারণ, কিন্তু কাছে গেল না। ভাবল, কী দরকার।

ওর কারওকেই দরকার নেই। ও নিজেতে নিজেই সম্পূর্ণ। ভীমগিরিকেও দরকার নেই চারণের, তার গুরুকেও নয়। ধিয়ানগিরি হঠাৎ মুখ তুললেন। এবং চারণকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। আশ্চর্য এক হাসি। চারণ অভিভূত হয়ে গেল সেই হাসি দেখে। সেই হাসির মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। না, নিজেকে কৃতার্থ-করা সেই হাসি, না, পরকে। সেই হাসি যেন কোনও বনফুলের হাসির মতন, বুদ্ধু সিং এর বাড়ি থেকে উতরাইতে-নামা পথের দুপাশে ফুটে-থাকা "লালটায়েন" ফুলেরই মতন, পার্বত্য ঝরনারই মতন। হাসলেন, কোনওরকম আদেশ-নির্দেশ-প্রত্যাশা না রেখে। যেন না হেসে পারেন না, তাই হাসলেন। কিন্তু হাসলেনই শুধু।

কাছে আসতে বললেন না তাকে। দূরে যেতেও নয়।

সেই হাসি দেখে চারণের মনে এক আশ্চর্য ভাবের সৃষ্টি হল। ও চাতালের এক প্রান্তে গাছতলিতে বসে পড়ল ওই নদীতীরের মধ্যাহ্ন-প্রকৃতিরই অঙ্গ হয়ে গিয়ে। ত্রিবেণী ঘাটের পটভূমির এক আঙ্গিকই হয়ে গেল যেন। ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে নদীতীরের সিমেন্ট-বাঁধানো ঠাণ্ডা চাতালে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে, ধিয়ানগিরির দিকে চেয়ে চারণের মিলন কুন্দেরার THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING বইটির কথা মনে পড়ে গেল। বইটি এমন কিছুই নয়। ইংরেজি বই হলেই বা পুরস্কৃত বই হলেই যে সুপাঠ্য অথবা ভাল বই হবে তার কোনও মানে নেই। মিলন কুন্দেরা শোভা দে-র চেয়ে একটু অন্যরকম হলেও, ওই একই পদের। প্রায় শ-খানেক অর্ধমনস্ক রতিক্রিয়ার অনুপুঙ্খ বর্ণনাই যদি সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুলতে পারে কোনও লেখাকে তবে তো কথাই ছিল না। কুন্দেরা, নিজস্ব কারণেই কম্যুনিস্ট-বিরোধী। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই যদি আমেরিকান-লবি তাকে মহৎ-সাহিত্যিক বলে ঠাউরে বসেন তাহলে বলার কিছুই নেই। তাছাড়া, মিলন কুন্দেরার লেখাতে মহৎ কোনও ব্যাপার নেই, যেমন বরিস পাস্টারনাকের লেখাতে আছে। তবে একথা ঠিক যে, কুন্দেরার বইয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পংক্তি আছে, কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যা মহৎ সাহিত্যের চৌকাঠে পৌঁছেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চৌকাঠে এসেই ফিরে গেছে। মহত্ত্বর নির্জন ঘরে প্রবেশ করতে পারেনি।

মিলন কুন্দেরার ঐ বইটির এক জায়গায় উনি লিখেছেন যে, কেউ আমাদের দিকে চেয়ে দেখুক অথবা মনোযোগী হোক, এটা আমরা সব মানুষই আশা করি, প্রত্যেকেই চাই। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, আমরা প্রত্যেকেই ইম্পট্যান্ট হতে চাই, অন্যের দ্রষ্টব্য, মনোযোগের পাত্র হতে চাই। এই ইম্পর্ট্যান্স-প্রত্যাশী আমাদের মধ্যে, কুন্দেরার মতে, আবার নানা ভাগ আছে। একদল চাই অগণ্য অচেনা অজানা মানুষ আমাদের দেখুন। অর্থাৎ, সেই দল, জনগণের মনোযোগ এবং চোখ চান, জনগণের দেওয়া অসাধারণত্বে সম্পৃক্ত, সিঞ্চিত হতে চান।

আরেকদল আছেন আমাদের মধ্যে, যাঁদের পক্ষে নিছক বেঁচে থাকার জন্যেই অগণ্য পরিচিত মানুষদের মনোযোগের তীব্র চাহিদা থাকে। তাঁদের পরিচিতির গণ্ডীর মধ্যে তাঁরা প্রত্যেকের চোখে ইম্পট্যান্ট হয়ে উঠতে চান এবং থাকতে চান। এই সব মানুষেরাই প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ককটেল-পার্টি আর ডিনারে নেমতন্ন করেন পরিচিতদের এবং অপরিচিত, অর্ধ-পরিচিতদেরও। যাতে পরিচিতির বৃত্তর মধ্যে তাঁদের এনে ফেলা যায়। সেই চেষ্টাতেই প্রতিমুহূর্তে সচেষ্ট থাকেন।

www.MurchOna.com

আর তৃতীয় দল হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা অনুক্ষণ তাঁদের এক বা একাধিক ভালবাসার জনের চোখের মণি হয়ে বেঁচে থাকতে চান।

শুধু এই তিন শ্রেণীই নয়, তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থলের মতন একটি চতুর্থ শ্রেণীও আছে। চলিতার্থে নয় যদিও। সেই শ্রেণীর মানুষেরা খুবই বিরল। তাঁদের কোনও মানুষকেই শারীরিকভাবে প্রয়োজন হয় না। মানে, কারওই শারীরিক নৈকট্যর প্রয়োজন হয় না। হয় না, কারও চোখের চাওয়ারও। তাঁরা তাঁদের কল্পনায় অগণ্য অনুপস্থিত এমন কি অস্তিত্বহীন মানুষেরও চোখের সামনে থাকেন অথবা তাঁদের চোখের সামনে রাখেন। এঁরা হলেন স্বপ্ন-দেখা মানুষ। 'DREAMERS'।

কে জানে! ভাবছিল চারণ, মহারাজ ধিয়ানগিরিও হয়তো এই চতুর্থ শ্রেণীতেই পড়েন। পড়েন, অনেক সাধু-সন্নিসী, লেখক, গায়ক, চিত্রকর, যাঁরা সাধরণের শ্রেণীভুক্ত নন বলেই তাঁদের চাওয়া-পাওয়ার রকমসকমও পুরোপুরি আলাদা হয়। এবং হয় বলেই হয়তো ধিয়ানগিরিও চারণকে দেখেও দেখলেন না, হেসেও হাসলেন না।

চারণ ভাবছিল যে, অগণ্য নারী-পুরুষের পরিবেষ্টনে, প্রতিবেষ্টনে, প্রতিবেশে বাস করেও ওই মানুষেরা একেবারেই একা। তীব্র কল্পনা এবং ইচ্ছা শক্তি দিয়েই শুধুমাত্র তাঁরা নিজেদের নিজস্ব জগত গড়ে নিতে জানেন। গড়ে নেন ইমারত, খাট-পালঙ্ক, মালঞ্চ, তড়াগ। কোনও নারী-শরীরের কাছে না গিয়েও অনায়াসে সম্ভোগ করেন তাকে কল্পনাতে। কোনও পুরুষের কাছেও না এসে তাকে, তাদের স্তুতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন চুম্বকের মতন।

মিলন কুন্দেরা হয়তো জানেনও না যে, এই শ্রেণীর মানুষকেই, ভারতীয়রা 'সাধক' বলে থাকেন। সব জাগতিক সাধ-আহ্লাদকেই যাঁরা অবহেলে পায়ে মাড়িয়ে যান অন্য কিছুর, অনেক বড় কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায়, সে সব প্রাপ্তি সম্বন্ধে পশ্চিমী ভোগবাদের দুনিয়ার কোনও ধারণাই নেই। তাদের জগতের, তাদের মানসিকতার, তাদের ভাবনা-চিন্তার স্তরের ভাষাভাষী কোনও মানুষের পক্ষে এই ভীমগিরি-ধিয়ানগিরিদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করাও হয়তো সম্ভব নয়।

চারণের চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ভীমগিরির গলার স্বরে।

নমস্কার চারণবাবু।

চমকে উঠে বলল চারণ, নমস্কার।

এই অসময়ে?

সকালে কুঞ্জাপুরীতে গেছিলাম যে!

তাই? তা লাগল কেমন?

ভাল। তবে পরে গেলে হয়তো আর ভাল লাগবে না। শুনলাম, চাতালের উপরে দুটি ছোট মন্দির বানাচ্ছেন কুঁবারসিংজি।

তাই? সত্যিই তো খারাপ খবর তাহলে।

তারপরে বললেন, ভগবানেরা তো আর শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করেন না, মানুষদের মতন যে, এজমালি বাড়িতে তাদের ঠাঁই-এর অকুলান হবে। চাতালটিই তো কুঞ্জাপুরীর সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ছিল। আশ্চর্য!

আমারও তাই মনে হয়। চারণ বলল। মন্দিরে-মসজিদে মানুষ তো যায়ই সেই জন্যে। পরিবেশে যদি শান্তিই না থাকল, না থাকল space, আক্ষরিকার্থে এবং মানসিকার্থে, তাহলে মন্দিরের অন্ধকারের মধ্যে বসিয়ে-রাখা বিগ্রহ কি শান্তি দিতে পারে কারওকে।

সাহী বাত।

বললেন, ভীমগিরি মহারাজ।

চারণ বলল, আজ এখানেই কোথাও খেয়ে নেব।

কেন?

কারণ আছে।

ও। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই। কুঞ্জাপুরীর তিনশো ষাটটি সিঁড়ি চড়া তো সোজা কথা

www.MurchOna.com

নয়।

চারণ হেসে বলল, তা একটু পেয়েছে।

বলেই বলল, আপনি খাবেন না ? আপনার খাওয়া কি হয়ে গেছে ?

ভীমগিরি বললেন, গতকাল থেকে উপোস আছি। পরশু আবার খাব।

সে কি ? কষ্ট হচ্ছে না ?

ভীমগিরি হাসলেন।

বললেন, দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ?

না, তা মনে হচ্ছে না। হাসছেন তো কথায় কথায়ই।

হাঃ। হাসির সঙ্গে খাওয়ার কি ? খেতে সময় তো নষ্ট হয়ই, খেলে নানারকম ঝামেলাও হয়।

খেলে ঝামেলা ? কী রকম ?

খেলেই তা হজম করানোর ঝামেলা তো আছেই। তার উপরে আবার খাওয়ার ইচ্ছেও জাগে। সবচেয়ে বড় ঝামেলা সেটা। তবে শরীর বহুতই বেশরম জানোয়ার হলেও তার একটা মস্ত গুণ হল এই যে, সে নিজেকে খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে অনেকদিন। যে গুণ, মনের নেই। মন কেবলি অন্য মনের ফসল খেতে চায়।

ভীমগিরি উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, চলুন দেখিয়ে দিই আপনাকে। এই দোকানের বয়স সত্তর বছরের উপরে। এখন নাতি মালিক। ইমানদার ইনসান সে। এত সস্তাতে এত আড়ম্বরহীন ভেজালহীন খাবার এখানে আর কোথাও পাবেন না।

ভীমগিরি মহারাজ, নদীর সমান্তরালে যে পথটি গেছে দুধারের নানান দোকানের মধ্যে দিয়ে, সেই পথে কিছুটা হেঁটে গিয়ে ডানদিকে একটি ছোট্ট দোকানের সামনে দাঁড়ালেন।

দোকানের সামনেটা হবে বারো থেকে পনেরো ফিট। ভেতরে গভীর। তবে সেই গভীরতা যে কতটা তা পথে দাঁড়িয়ে বোঝা গেল না। ডানদিকে ছোট ছোট গোটা চারেক পেরেক-ওঠা কিন্তু ব্যবহারে ব্যবহারে মসৃণ হয়ে যাওয়া কাঠের সরু বেঞ্চ ও টেবিল। একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ফর্সা ছোটখাটো হাসিখুশি ছেলে বাঁদিকের খাদ্য-সম্ভারের মধ্যে বসে আছে।

ভীমগিরিকে দেখেই ছেলেটি বলল, জয় রামজি কি !

জয় রামজি কি।

ভীমগিরি বললেন।

যে রামের নাম ইংরেজি শিক্ষিত চারণের এবং চারণের মতন কলকাতার সর্বজ্ঞ মানুষদের কাছে বিন্দুমাত্র তাৎপর্যহীন, এমনকি তাচ্ছিল্য এবং উপহাসের বিষয়, সেই নামটিই যে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে এখানে আপামর জনসাধারণ উচ্চারণ করেন, তা দেখে আশ্চর্য হল চারণ।

তারপর ভাবল, উচ্চারিত হলে আশ্চর্য হওয়ার বা উপহাস করারই বা কি আছে ? জ্ঞানের সীমা তো চিরদিনই ছিল, অজ্ঞতারই সীমা ছিল না কোনওদিন। মুসলমানেরা যদি কথায় কথায়, আল্লা রসুলের নাম বলতে পারেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, যদি বলতে পারেন ইনসা আল্লা, বলতে পারেন খুদাহ হাফিজ, যদি খ্রিস্টানেরা বলতে পারেন, ওহ লর্ড, গুড গ্রেশাস, বলতে পারেন খ্রিস্টর প্রতি গভীর স্তুতিতে 'মে গড গিভ উ্য পিস' ইত্যাদি তাহলে ভীমগিরি আর এই হালুইকরের নাতি 'জয় রামজি কি' বললে দোষের বা উপহাসের কিছু আছে এমন তো মনে হল না চারণের। ও বুঝতে পারল যে, ও নিজে ধর্ম মানুক আর নাই মানুক ওর দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ ধর্ম মানে। সে ধর্ম হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্ট, শিখ, জৈন, যাই হোক না কেন। নিজ নিজ ধর্ম মেনে তারা যদি খুশি হয়, আনন্দে থাকে, তাহলে সে তার কলকাত্তাইয়া বুদ্ধিজীবীর মানদণ্ড দিয়ে এঁদের বিচার করার কে ? সে এখানে না এলে হয়তো বুঝতেই পারত না যে, এই কোটি-কোটি মানুষের মান্য ধর্মকে চারপাতা ইংরেজি পড়ে সর্বজ্ঞ হয়ে বাতিল করার আগে তার এই সর্বজনমান্যতার প্রকৃতিকে একজন যুক্তিবাদী হিসেবে যাচাই করা অবশ্যই প্রয়োজন।

www.MurchOna.com

ভোজন কিজিয়েগা মহারাজ ?

ছেলেটি বলল।

নেহি যুগলপ্রসাদ। ইনকো আচ্ছাসে ভোজন করাও।

বলে, চারণকে ভিতরে এগিয়ে দিয়ে নিজে পেছন পেছন গিয়ে একটি বেঞ্চে তাকে বসিয়ে নিজে উলটোদিকে বসলেন।

যুগলপ্রসাদ নামক ছেলেটি বলল, বলিয়ে বাবু, কেয়া দুঁ ? চাওল ইয়া রোটি ?

চারণ বলল, চাওল।

ভীমগিরি বললেন, তুমহারা যো যো চিজ আজ বন চুকে হ্যায়, ঔর আচ্ছা হ্যায়, উও সব দো বাবুকো। ম্যায় চল রহা হ্যায়।

আপনি খাবেন না কিছু ? এক গ্লাস দুধ অন্তত খান।

ছেলেটি বলল।

নেহি বেটা। কুছ নেহি। ভগওয়ান তেরা ভালা করে গা।

কোথায় যাবেন এখন ?

চারণ শুধোল।

শ্মশানে।

কেন ?

সেই সন্নিসীকে মনে আছে আপনার ? কাঁধের ওপরে হরিণের ছাল জড়ানো কম্বল নিয়ে এক সন্ধের মুখে এসে পৌঁছেছিলেন গুরুজির আখড়াতে ? আমি কালিকমলি বাবার আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে এলাম যাঁকে ? পদসেবা করলাম···

হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে আছে বইকী !

উনকি দেহান্ত হো গ্যয়া।

ইসস।

দুঃখের সঙ্গে বলল, চারণ।

মৃত্যুর মধ্যে দুঃখের কি আছে বাবুজি ? আর সেই সন্ত তো তাঁর গুরুর সাধন-ক্ষেত্রে দেহ রাখবার জন্যেই হৃষীকেশে এসেছিলেন। এবং আসার পর অতি স্বল্পদিনের মধ্যেই দেহ রেখেছেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে !

যুগলপ্রসাদ একতলার গভীরের অন্ধকারে চলে গেল চারণের খাবারের তদ্বির করতে। মনে হল ছেলেটির বাসস্থান এটি। একতলাতে খাওয়া-দাওয়া, দোতলাতে থাকা-শোওয়া। তারপরই বুঝল যে ওর বাবা এবং ঠাকুর্দা চটিওয়ালা ছিলেন। যখন পুণ্যার্থীরা পদব্রজে যেতেন সব ধর্মস্থানে, পুণ্য যখন ক্যাপসুলের মধ্যে, প্যাকেজ ট্যুরের মাধ্যমে পণ্যর মতন বিক্রি হত না, তীর্থযাত্রীর সব পুণ্য ছিল তার যাত্রাপথেরই মধ্যে, সাধুসন্ত এবং ভাল-মন্দ মেশানো গৃহী মানুষের সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতারই মধ্যে, তখন এই সব চটিওয়ালারই তাঁদের খাদ্য-পানীয় এবং রাতের আশ্রয় দিতেন।

আমি যাই।

বললেন, ভীমগিরি।

ভীমগিরি বললেন, আমরা আজ সকলে আনন্দ করব। পউরি থেকে নেমে-আসা সেই সন্ত তাঁর প্রয়াত গুরুজির পদপ্রান্তে গিয়ে মিলিত হয়েছেন বলে। মৃত্যু, গৃহীদের দুঃখ দেয়। অজ্ঞদের। জ্ঞানীর কাছে মৃত্যু বলে কিছু নেই। আমাদের গীতাতে আছে আত্মা অবিনশ্বর। আগুন তাকে পোড়াতে পারে না, হাওয়া তাকে শুকোতে পারে না, জল তাকে ভেজাতে পারে না। আত্মার বিনাশ নেই। তার আধারেরই পরিবর্তন হয় শুধু।

চারণের খাবার এসে গেল। কানা-তোলা একটা পেতলের থালাতে। গরম ধুঁয়ো-ওঠা ভাত। অড়হরের ডাল। রাইতা। আলুর চোকা। তার মধ্যে আবার দই দেওয়া। মুলো, ফিনফিনে করে কেটে তার স্যালাড। খিচুড়ির সঙ্গে যেমন কড়কড়ে আলুভাজা খায়, তেমন আলুভাজা। পেঠার

www.MurchOna.com

মিষ্টি তরকারি। চমৎকার। সঙ্গে কটি গরম গরম আটার ফুলকা। দেশি ঘি-এ ভাজা।

কেমন ? ভাল ?

চমৎকার।

চারণ বলল।

মনে মনে বলল, এখানেই এসে খাবে দুবেলা।

ভীমগিরি বললেন, আমি এবারে চললাম।

আপনি নিজে কাল থেকে খাননি আর আমি খাচ্ছি দেখেও খিদে পাচ্ছে না আপনার ?

শব্দ করে হাসলেন ভীমগিরি।

বললেন, পাচ্ছে আবার না ? খুবই পাচ্ছে।

চারণ বোকার মতন বলল, তাহলে ?

তাহলে কি ? ওইটাই তো পরীক্ষা !

কিসের পরীক্ষা ?

নিজেকে বঞ্চিত করতে পারার পরীক্ষা। এই বঞ্চনার আনন্দ বড় গভীর চারণবাবু। এই আনন্দর কাছে পৃথিবীর তাবৎ সুস্বাদু খাবার খাওয়ার আনন্দও কিছুই নয়।

এই পরীক্ষার পরীক্ষক কে ?

আবার হাসলেন, ভীমগিরি। বললেন, আমিই পরীক্ষক, আমিই পরীক্ষার্থী।

তারপরই, উঠে চলে গেলেন।

পেট ভরে তৃপ্তি করে খেয়ে উঠল চারণ। আট টাকায় মধ্যাহ্নভোজ !

যুগলপ্রসাদ হেসে বলল, আবার আসবেন বাবু। এই দোকানের বয়স সত্তর বছর। আমার বাবা বলতেন, মুসাফিরদের যত্ন করে খাওয়াবি তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুজো। তোর মন্দিরে যেতে হবে না বেটা। তোর আত্মা এমনিতেই মুক্ত হয়ে যাবে।

বলে, যুগলপ্রসাদ চারণের হাতে এবার মৌরি দিল।

আসব যুগলপ্রসাদ।

বলে, পথে নামল ও।

তারপরই ফিরে, জিগ্যেস করল, শ্মশানটা কোন দিকে ?

চন্দ্রভাগাতে। শুখা নদী আছে না ?

যে নদী এসে পড়েছে গঙ্গানদীতে ?

হ্যাঁ। সেখানে। সোজা চলে যান ভিয়াসির পথে। একটা অটো নিয়ে নেবেন। পথটা যেখানে চন্দ্রভাগার উপরের ব্রিজটা পেরিয়েছে সেখানে অটো ছেড়ে নদীতে নেমে গেলেই হবে। না বুঝতে পারলে, সেখানে কারওকে জিগ্যেস করবেন।

সুক্রিয়া, ভাই।

'ভাই' শব্দটা বলতে পেরে বড় খুশি হল চারণ। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ে গেল। এই 'ভ্রাতৃত্ব' বড় উদ্দীপক ভ্রাতৃত্ব। মুসলমানেরা একেই বলে 'বিরাদরী'। মস্ত বড় গুণ এ তাদের।

বড় রাস্তার দিকে হেঁটে যেতে যেতে চারণ ভাবছিল, ভীমগিরি এবং এখানের আরও কত অগণ্য মানুষ, শিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত, এবং অশিক্ষিতও কত সহজ দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস করে যে, আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যু শুধু পরিবর্তনের। তার আধার পরিবর্তনেরই দ্যোতক।

ভাবছিল যে, বা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা বোধহয় এমনই অনড় পাথরের মতন বিশ্বাসকে বহন করেন। এইসব ব্যাপার তর্কের নয়। এই জন্যেই বোধহয় কথাতে বলে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর।' কিন্তু সত্যিই কি পরজন্ম আছে ? পূর্বজন্ম ?

চারণের মনে পড়ে গেল যে, জার্মানেরা একটা বাক্য বলেন প্রায়ই। সেটা একটি জার্মান ADAGE।

www.MurchOna.com

ওঁরা বলেন WHAT HAPPENS BUT ONCE, MIGHT AS WELL NOT HAVE HAPPENNED AT ALL.

LIVING ONLY ONE LIFE. WE CAN NEITHER COMPARE IT WITH OUR PRIOR LIVES NOR PERFECT IT IN OUR FUTURE LIVES.

সত্যিই কি আমাদের একটামাত্রই জীবন ? নাকি পরজন্ম আছে ? আমাদের গীতা যা শেখায়, উপনিষদ, বেদ, বেদান্ত, কোরান, হাদিস, এসবই কি মিথ্যে ? যে কোটি-কোটি মানুষে মন্দিরে-মসজিদে-গুরদোয়ারাতে মন-প্রাণ নিবেদন করে পুজো করেন, তাঁরা কি সকলেই নির্বুদ্ধি ? অজ্ঞ ? তাঁদের মধ্যে তো চারণের চেয়ে সবদিক দিয়েই বড় এমন অগণ্য মানুষও আছেন।

তবে ?

ঈশ্বরবাবু বলে কি আদৌ কেউ আছেন ? নাকি কলকাতার সর্বজ্ঞ আঁতেল চূড়ামণিরাই ঠিক। ওই জার্মান ADAGE টিই ঠিক ? "EINMAL IST KEINMAL"?

মোড় থেকে একটা অটো নিয়ে চারণ যখন ব্রিজের কাছে অটো ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়ল তখন দুপুরের আর খুব বেশি বাকি নেই।

ব্রিজ বানানো হচ্ছে নতুন এবং চওড়া। বর্তমানে যে ব্রিজটা আছে তা বহু পুরনো ও সরু। তাছাড়া, বদ্রীনাথ-কেদারনাথের পঞ্চাশ মাইল ওপাশেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর পার্বত্য রেজিমেন্ট ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে নেহরু সাহেবের আমলের 'হিন্দি-চীনি-ভাই-ভাই'-এর পিণ্ডি-চটকানো তেলাপোকা-খাওয়া চিনেদের হামলার প্রতিষেধক হিসেবে। আধুনিক সেনাবাহিনীর ভারী ও বড় মেকানাইজড যানবাহন চলাচলের পক্ষে এই রকম ব্রিজ তাই একেবারেই অচল। ভাগীরথীর উপরে দেবপ্রয়াগে বা অলকানন্দার উপরে রুদ্রপ্রয়াগে এবং অন্যত্রও যে সব নতুন সেতু হয়েছে এইসব অঞ্চলে, যার জন্যে এখন গঙ্গার বাঁ পাড়ের চওড়া পিচ রাস্তা বেয়ে কেদারনাথ ও বদ্রীবিশালের পুণ্যার্থীরা বাসে বা গাড়িতে সহজেই প্যাকেজ-ট্যুরে তীর্থ করতে যেতে পারছেন, সেই সব পথও সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়াররাই বানিয়েছেন।

ব্রিজ-বানানো একজন মিস্ত্রিকেই শুধোলো চারণ, শ্মশানটা কোথায় ? জানেন ?

লোকটি স্থানীয় নয় বোধহয়। হাতের কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণ চারণের মুখের দিকে চেয়ে থেকেই হঠাৎ বলল, সে তো আপনার বুকের মধ্যেই আছে।

চমকে উঠল চারণ।

এই দেবভূমিতে এসে পৌঁছলে কি সকলেই দার্শনিক অথবা খসসর হয়ে যায় ?

ভাবল ও।

লোকটি তারপর ডানহাত প্রসারিত করে দূরে দেখাল।

তার হাতের প্রসার ও হাতটিকে চকিতে ওঠানো দেখে মনে হল যে, সেও হয়তো সেনাবাহিনীরই লোক।

হয়তো।

চারণ শুকনো, দুর্গন্ধ চন্দ্রভাগাতে নামল। পুণ্যতোয়া গঙ্গা, যে-গঙ্গাতে এত সহস্র পুণ্যার্থী, সাধু-সন্ত দুবেলা ভক্তিভরে চান করেন, আচমন করেন, সেই গঙ্গারই সঙ্গে মিলিত-হওয়া এই শুকনো চন্দ্রভাগা বহু স্থানীয় মানুষের উন্মুক্ত শৌচাগার যে, একথা ভেবেই বড় খারাপ লাগল চারণের। হিন্দুদের অধিকাংশ ধর্মস্থানই বড় নোংরা। কেন ? কে জানে ! বালি আর নুড়ির উপর দিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে যাওয়ার পরে হঠাৎ এক দৃশ্যে চোখ পড়াতে ও থেমে গেল। গঙ্গার একাংশের তীর ধরে বহমান এক শোভাযাত্রা চোখে পড়ল। সেই শোভাযাত্রা তখন অনেকই দূরে ছিল। এই শব যাত্রীরা কোথা থেকে আসছেন কে জানে ! হয়তো কালিকমলি বাবার আশ্রম থেকেই। একটি রক্তবর্ণ, নতুন কম্বলে জড়ানো শবকে স্কন্ধারূঢ় করে হেঁটে আসছেন শবযাত্রীরা সেনাবাহিনীর "SINGLE FORMATION"এ। দীর্ঘ শোভাযাত্রা।

পউরি থেকে, তাঁর গুরুদর্শনে নেমে-আসা শক্তসমর্থ সেই পরবাসী আগন্তুক সন্নিসীর হৃষীকেশে

www.MurchOna.com

যে এত আপনজন ছিল, তা সেই সঙ্কেতে তাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে দেখে অনুমানও করতে পারেনি চারণ। তাছাড়া, তাঁর গুরুরও তো দেহান্ত হয়ে গেছে বহুদিনই হল। তবুও!

ওর মনে হল, সংসারে যাঁর আপনজন বলতে কেউই নেই, যাঁর পূর্বাশ্রমের পরিচয় যিনি নিজে হাতেই মুছে ফেলেন, রক্তের আত্মীয়দের পরিচয় যাঁর কাছে পুরোপুরি অবলুপ্ত নিজেরই ইচ্ছাতে, সেই নিরুদ্দিষ্টই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পরিবৃত থাকেন আত্মার-আত্মীয়দের দ্বারা। অবাক হল নিজ চোখে দেখে, শবকে ওঁরা কোনও চারপাইতে বহন করছেন না। বহন করছেন, কোন শিশুর শবের মতন নিজেদের কোলে-কাঁখে। আর সেই কম্বলের ঘোর লাল রং, শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশের ঘন অরণ্যানীর গাঢ় সবুজ, গঙ্গার সাদা এবং শুকনো চন্দ্রভাগার ছাই-রং-এর পটভূমিতে যেন সেই চলমান শবযাত্রার সঙ্গে আন্দোলিত, বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মাথার উপরে পাহাড়ি শঙ্খচিলেরা উড়ছে ঘুরে ঘুরে যেন শব-হয়ে-যাওয়া সন্নিসীর চলমান মাথার উপরে চামর বুলোচ্ছে তারা নরম, আঁশটে গন্ধ পালকের।

চারণ কিছুটা এগিয়ে গেল ওই শববাহী শোভাযাত্রার দিকে। আশ্চর্য! এত আপনজন মানুষটার কোথায় ছিল! যারা 'পরকে আপন করে, আপনারে পর' তাদের পরম্পরা সম্বন্ধে এক গভীর ঔৎসুক্য জাগছিল ওর মনে। বিলক্ষণ বুঝতে পারছিল যে, গোলমেলে সুকঠিন মামলার নথিপত্র ও যত সহজে বুঝতে পারার বিদ্যা করায়ত্ত করেছিল, এই আপাত-সাধারণ, জীর্ণ-শীর্ণ ভীমগিরি-ধিয়ানগিরিদের অত সহজে আয়ত্ত করার নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি 'কুইজ'। তাঁদের চাউনি আর হাসির সারাৎসার বুঝতেই তার এক জীবন কেটে যাবে। এই অতি সাধারণ, 'মাধুকরী' করে দিন-গুজরানো, আপাত-ফোর-টোয়েন্টি, আপাত-ভগবান, বৃক্ষছায়ার চাতাল-নিবাসী অথবা নানা নদীর ঘাটবাসী বা গুহা-কন্দরবাসী, নানা আশ্রমবাসী অগণ্য সাধু-সন্তদের সঠিকভাবে বোঝা সহজকর্ম নয়। অর্থকরী বিদ্যা শিখে, অর্থোপার্জনের অন্ধ আঁধিতে এতদিন ঘূর্ণিত-চূর্ণিত হয়ে ওর দৃষ্টিই পুরোপুরি আবিল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পড়েছিল 'সহজ হবি, সহজ হবি'। আসলে, সহজ হবার মতন কঠিন কাজ সম্ভবত আর দ্বিতীয় নেই।

ভাবছিল, চারণ।

শবযাত্রা আরও এগিয়ে এসেছে। এই উঁচু জনহীন চন্দ্রভাগা নদীর কোন জায়গাতে যে শ্মশানটা অবস্থিত তা সঠিক বুঝতে পারছিল না চারণ। সম্ভবত মোহনার কাছেই হবে। এখন দূরাগত শবযাত্রীদের মুখ-নিঃসৃত মন্ত্রোচ্চারণেরই মতন ওর কানে আসছে 'রাম নাম সত হ্যায়, রাম নাম সত হ্যায়, রাম নাম সত হ্যায়' ধ্বনি, যে ধ্বনি, ভারতের অধিকাংশ স্থানেই শবযাত্রীরা মন্ত্রোচ্চারণেরই মতন উচ্চারণ করে। চারণেরা নিজেরা বাংলাতে বলে 'বল হরি হরি বল, বল হরি হরি বল'।

হরি আর রাম তাহলে কি এক? এই রামায়ণের রাম মানুষটি কি একটি Myth? চারণের কলকাতার আঁতেল-চূড়ামণিরা যেমন বলেন? অথবা, বিভিন্ন দলের মুসলমান-তোষণকারী রাজনীতিকরা?

কারওকেই তোষণ করার বরাবরই বিদ্বেষী চারণ। তিনি যেই হন না কেন। তাঁদের আসল প্রেম তো ভোটের প্রতি। মুসলমানদের জন্যে তাঁরা করেছেনটা কি এতবছর? এখন আর মুসলমানেরা ভারতীয় কোনও দলের অনুগ্রহের প্রত্যাশাতে বসেও নেই।

রাম যে অযোধ্যাতে জন্মেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ কারও কাছেই নাকি নেই। যিশুখ্রিস্ট যে জন্মেছিলেন জেরুজালেমে সেই প্রমাণ আছে কি কারও কাছে? মহম্মদের জন্মের এবং জন্মস্থানের প্রমাণ? তাই যদি হয়, তবে নিজেরা ভারতবাসী হয়েও, ভারতের সন্তান হয়েও, শুধুমাত্র রামকেই উড়িয়ে দেবার এমন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কেন ভারতে? আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, খুব কম ভারতীয়ই, প্রকৃত ভারতবর্ষকে জানেন, তার অন্তর্প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন। শহরবাসী ইংরেজিনবীশরা তো নন্নই। তাই অনেক সহজ ব্যাপারই তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে।

এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময় বোধহয় হয়েছে।

সেদিন হরিণের চামড়া গোল করে পাকিয়ে ঘাড়ের উপর নিয়ে, দেবপ্রয়াগ থেকে যে সন্ন্যাসী

Security Page@MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

পদব্রজে নেমে এলেন হৃষীকেশে বাসভাড়া না থাকাতে, তাঁর সঙ্গে এই লালকম্বলে মোড়া শবের কি সম্পর্ক ? সেই মানুষটি কতখানি ছিলেন তাঁর জীবন্ত সত্তায় আর কতখানি আছেন তাঁর মৃত সত্তার মধ্যে ?

কে চারণকে বলে দেবে এই তত্ত্ব। তবে এটুকু বুঝেছে চারণ যে, বোঝা অত সোজা নয়। সেইসব মানুষদের আপাত-সপ্রতিভতা এবং অগভীর ইংরেজিনবিশীই শেষ কথা নয়। অনাদিকাল ধরে যা-কিছু ভারতীয় পরম্পরাতে মানুষে বিশ্বাস করে এসেছে তার সবটাই 'কিসসুই' নয় বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার পেছনে অশিক্ষাজনিত হামবড়াই যতটুকু আছে, জিগীষা তার তুলনাতে ছিটে-ফোঁটাও নেই। কিছু সবজান্তা ভুঁইফোঁড়, গূঢ় নিজ-স্বার্থপরায়ণ মানুষে সাম্প্রতিক অতীত থেকে উঠে পড়ে লেগেছেন ঈশ্বর নেই তার প্রমাণ দেবার জন্যে। চারণ, সেইসব প্রগাঢ় পণ্ডিত, খল, ইতর, প্রাইজ ও যশ এবং অর্থ-প্রত্যাশী উদ্বায়ু সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিকদের মধ্যে কারও কারওকে ব্যক্তিগতভাবেও চেনে। তাঁরা যে প্রণিধানযোগ্য, তা আদৌ নন। কিন্তু ওইসব জীবনের রঙ্গমঞ্চের বালখিল্য অভিনেতারাই চারণকে এমন করে ঘর থেকে বাইরে এনেছে, যেমন এনেছে, তার অর্থপাগল মক্কেলরা। তারা সকলেই তাদের যূথবদ্ধতায়, একদেশদর্শিতাতেই চারণের মধ্যে নিজের চোখ, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করার এক তাগিদ সঞ্চারিত করেছে। কী জানবে, তা ও আদৌ জানে না। তবে অন্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের প্রতি ওর যেমন অনুকম্পা আছে অন্ধ ঈশ্বর-অবিশ্বাসীদের প্রতিও তার চেয়ে কিছু কম অনুকম্পা নেই। দুদলকেই সে অনুকম্পারই সঙ্গে বাতিল করে মুক্ত মনে, মুক্ত চোখে এই দেশের কোটি কোটি মানুষের মনের মর্মস্থলে পৌঁছে গন্ধমাদন পর্বত উথাল-পাথাল করে বিশল্যকরণী খুঁজতে এসেছে।

চারণ, মহাবীরের চেয়ে সামান্য বেশি বুদ্ধি ধরে। গন্ধমাদন পর্বত উপড়ে নিয়ে যাওয়ার মতন মোটাবুদ্ধি তার নয়। সে বিশল্যকরণীই খুঁজে বের করবে এবং যে সব মূর্খর মুখামির এবং ঔদ্ধত্যর কোনও সীমা-পরিসীমা নেই, তাদের মুখামির নাকে সেই বিশল্যকরণী ঘষে দেবে। জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কোনওদিনই ছিল না। এবং ছিল না বলেই, অজ্ঞ এবং গর্দভ প্রবরেরা অনুক্ষণ এত লম্ফ-ঝম্ফ করে।

আবারও মূল ভাবনাতে ফিরে এল চারণ। ওই লালকম্বল মোড়া সন্ন্যাসীর শবের মধ্যে ওই ঘরছাড়া মানুষটি কতটুকু আছেন আর যে জীবন্ত মানুষকে সে সেদিন অর্ধমা-লগ্নে ত্রিবেণীঘাটে দেখেছিল তাঁর মধ্যে তিনি কতটুকু ছিলেন, তা জানার এক তীব্র আগ্রহ ওর মধ্যে জাগরূক হয়েছে।

এবারে দাঁড়িয়ে পড়ল চারণ। ভাবল, ও তো সন্ন্যাসী নয়। ও তো ঘোর গৃহী। জয়িতার ভাবনা সে এখনও ভাবে। এতদূরে এসেও মিলি আর তার বাবা হরিচরণবাবুর ছায়া তার এই পরিযানকে গ্রাস করতে সতঃই উদ্যত। তার মুক্তি তো দূরস্থান, মুক্তি-প্রত্যাশাও দূর অস্ত। তার কোনও অধিকারই নেই একজন সন্ন্যাসীর শবযাত্রাতে যোগ দেওয়ার। সেই শবযাত্রাকে সে যে চাক্ষুষ করেছে, এই যথেষ্ট।

মৃতর আত্মার প্রতি তার শ্রদ্ধা জানাল চারণ বহু দূর থেকে নমস্কার করে। এই অভ্যেসটি তার বহুদিনের। কোনও মৃতদেহ দেখলেই সে নমস্কার করে, খ্রিশ্চানেরা যেমন আঙুল দিয়ে ক্রশ চিহ্ন দেন নিজের বুকে শব বা কফিন চাক্ষুষ করলেই, মুসলমানেরা যেমন মাথা নোয়ান।

চারণ ফিরে চলল। একটি শেয়ার-অটোতে চড়ে বসল ও। তারপর দেরাদুন রোডের মোড় আর তার পরের মোড়েও না নেমে আরও একটু এগিয়ে কুমার ট্র্যাভেলস-এর দপ্তরের সামনে নেমে পড়ল।

দোকানে ঢুকতেই মালিক বললেন, লিজিয়ে। কেশার সিংভি মজুদ। যাইয়ে আপ, যাঁহা যানা হ্যায় আপকি।

কেশর সিং বেঞ্চে বসেছিল। সিগারেট খাচ্ছিল। মধ্যমা আর বুড়ো আঙুলের মধ্যে ধরে। সেটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল, বলল, চালিয়ে সাহাব।

চারণ বাইরে এসে সামনের সিটে কেশর সিং-এর পাশে বসল।

www.MurchOna.com

যানা কাঁহা হ্যায় সাব ?

ভিয়াসি ।

সাত বাজে গেট বন্ধ হো যায়েগা পাহাড়পর । ভিয়াসিকি উসপার তো নেহি না যানা ?

কাহে ?

চারণ শুধালো ।

কিঁউ ক্যা, লওটনা পড়েগী সাত বাজেকি পহিলেই ভিয়াসি ।

চারণ বলল, ভিয়াসি পর্যন্ত যাব না । তার আগেই ভোঁদাইবাবা বা গাড্ডুবাবার আশ্রম । সেই অবধি গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবে ।

তারপর জিগগেস করল, গয়া কভভি ?

নেহি সাব । ভোঁদাইবাবা ইয়া গাড্ডুবাবাকি নামভি নেহি শুনা । ঔর ভিয়াসিকি পহিলে কৌঈ আশ্রমভিত নজারমে আয়া নেহি আজতক । হোনেসে, ট্যুরিস্ট লোগোঁনে কভভি কভভি তো জরুর যাতে থে ।

চারণ বলল, কুঞ্জাপুরীর কথাই বা কজন ট্যুরিস্ট জানে বাবা ?

তারপরে না-বলে বলল, সবাই তো প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে কেদার-বদ্রীর বুড়ি ছুঁয়েই ফিরে যায় । তীর্থ করতে তারা আসে যে কেন । তীর্থ করা কাকে বলে, তা জানার মতো মানসিকতাই তাদের নেই । সর্বক্ষণ কলকল-খলখল করে । বাসের বা গাড়ির জানালার পাশে বসে দুধারে তাকিয়ে, অহো ! কী অপূর্ব । কী অপূর্ব ! করে । যাদের পূর্বাপর জ্ঞানই নেই তাদের আবার অপূর্ব ! হাঃ ।

'পূর্বাপরের' সঙ্গে 'অপূর্ব' শব্দটাকে মনের মধ্যে একই শিলে বাটনা-বেঁটে ভারী মজা পেল চারণ । এই শব্দজব্দর মতো একা একা খেলার মতো বেশি খেলা নেই ।

বুদ্ধু সিংকে ডাকতে পাঠাল কেশর সিংকে চারণ, খাড়া চড়াই উঠতে বলে । সেই কালো বড় পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে কয়েকবার হাঁকাহাঁকি করার পরেও বুদ্ধু সিং-এর সাড়া পেল না ।

কেশর সিং মানুষটির বয়স হবে মধ্য তিরিশ । খুব ছটফটে । হাসিখুশি । পরনে একটি নোংরা পাজামা আর ফুল হাতা শার্ট । সেটাও নোংরা । পকেটে চারমিনারের প্যাকেট আর দেশলাই । খুবই ঘন ঘন সিগারেট খায় । ওর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিল চারণ যে, ওর বাবা নেই । মারা গেছেন লাঙ্গ-ক্যানসারে । প্রচুর বিড়ি খেতেন নাকি তিনিও ।

তারপরও ? তুমি ?

হাঃ ।

হেসে বলেছিল, কেশর সিং ।

তারপর বলেছিল, ইয়ে জিন্দেগী ক্যা হামারা বাপকি জমিনদারী হ্যায় সাব ? মওত যব আয়েগা তব যানাতো পড়েহি পড়েগা । কাহে আয়েগা ? কব আয়েগা ? ইয়ে সব ফজুল বাঁতে যো শোচতা হ্যায়, উ বিলকুলই বুদ্ধু হ্যায় । সাচমুচ বুদ্ধু । যো দিল চাহে করো, ঔর ভগয়ানকো ইয়াদ রাখখো । কোঈভি দুখ নেহি পৌঁছেগা । প্যায়দা যব হুয়া, মরণা ত পড়েহি পড়েগা । মওত কিসিকো ছোড়েগি থোড়ি ! উস বারেমে ইতনা শোচনেকি হ্যায় ক্যা ?

বুদ্ধু সিংকে যখন ডাকবার জন্যে খাড়া পাহাড়ের চড়াই এর পাকদণ্ডী বেয়ে গান গাইতে গাইতে উঠে গেল কেশর সিং তখন চারণ গাড়ি থেকে নেমে নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল হু হু হাওয়ার মধ্যে ।

ছেলেবেলাতে পড়া প্রাচীন আমেরিকান কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'Leaves of Grass'-এর কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ে গেল চারণের, পউরি থেকে আসা সন্ন্যাসীর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে হঠাৎই ।

"Great is life...and real and mystical...
Wherever and whenever, great is death...
Sure as life holds all parts together death holds
All parts together;

www.MurchOna.com

Sure as the stars return again after they
Merge in the light, death is
great as life."

ভাবছিল চারণ, কী আশ্চর্য। এই গাড়োয়ালী মানুষটি, পেশাতে গাড়িচালক কেশর সিংও হুইটম্যানের মতনই জ্ঞানী। ইংরেজি না জেনে, না পড়েও জ্ঞানী। আসলে জ্ঞান, সম্ভবত মানুষের একধরনের সহজাত সম্পত্তি। একধরনের তরবারির মতন বোধ। এই বৃত্তি বা সম্পত্তিকে যে নিয়ত শাণিত করে, শুধুমাত্র তারই হেপাজতে তা ক্ষুরধার থাকে। এই সহজাত সম্পত্তি অনেকেরই থেকেও না-থাকারই সমান।

কেশর সিং ফিরে এল। বলল, বুদ্ধু সিং বাড়িতে নেই। তার বাবা আছেন। বুদ্ধু সিং চাম্মাতে গেছে তার এক নানার কাছে। আগামীকাল ফিরবে।

চারণ বলল, চল, তাহলে আমরা যাই।

কেশর সিং হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বলল, আশ্রমটা ভিয়াসির কতখানি আগে, জানেন কি ?

না। শুনেছি অল্প একটু আগে।

ঠিক আছে। আমি তো কখনওই দেখিনি বা শুনিনি। চলুন।

পাটন কি তার সঙ্গে রসিকতা করল ?

ভাবছিল চারণ।

হতেও পারে। হি পুলড আ ফাস্ট ওয়ান অন হিম।

কেশর সিং কথা বলছিল না। পুরোটাই চড়াই। ফার্স্ট গিয়ারে বেশি না দিতে হলেও অধিকাংশ সময়ই গাড়িকে সেকেণ্ড-থার্ডেই চলতে হচ্ছে। গাড়ি ক্রমশ গরমও হচ্ছে। সামনের সিটে বসে আছে বলেই বুঝতে পারছে সে কথা। উপর থেকে আর্মির ট্রাক, জিপ, বাস, প্রাইভেট ট্রাক নামছিল ঘন ঘন। রাত নামলেই যানবাহনের যাতায়াত কমে যাবে। সাধারণ মানুষে রাতের বেলা এই সব দেবভূমিকে, এই ভূমে যাঁদের আবাস তাঁদেরই হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় হয়তো।

চারণ চুপ করেই ছিল। মনের মধ্যে নানা কথা মাথা তুলছিল। তুলেই, ডুবে যাচ্ছিল। দিশি, বারোমেসে জংলি-হাঁস ড্যাবচিকদেরই মতন। যাদের আরেক নাম, ডুবডুবা।

হঠাৎই কেশর সিং বলল, ভিয়াসি ঔর দো মিল হ্যায় হিঁয়াসে।

একটু দাঁড় করাও তো গাড়িটা।

গাড়ি দাঁড় করাল সে।

চারণ নেমে দেখল যতদূর চোখ যায় কোথাওই কিছু নেই। জনমানবও নেই।

কেশর সিং বলল, চালিয়ে ভিয়াসি তক চলকে হুঁয়াই পুছপাছ কিয়া যায়গা।

চারণ বলল, তাই ভাল।

আবার গাড়িতে উঠে বসল দুজনে।

ভিয়াসিতে পৌঁছে দেখল ছোট্ট একটু জায়গা। দুএকটি দোকান-টোকান। কেশর সিং সব দোকানে গিয়েই ভোঁদাই বাবা বা গাড্ডুবাবার আশ্রমের খোঁজ করল। চারণও করল। ইতিমধ্যে দেবপ্রয়াগ থেকে একটি বাস এসে দাঁড়াল ভিয়াসিতে। সেই বাসের ড্রাইভার—কন্ডাক্টরের কাছেও খোঁজ করল কেশর সিং। সকলেই একমত হলেন যে, ভিয়াসি আর লছমনঝোলার মধ্যে পথের উপরে ভিয়াসির আগে, ওই নামের কোনও সাধু থাকেন না যে শুধু তাই নয়, গত দশবছরের মধ্যেও কেউই অমন সাধুর নামও শোনেনি এ অঞ্চলে।

বাস ড্রাইভার, মুখে ঠেসে খৈনি মেরে বলল, কোঈ সাধু-সন্তকি নাম ক্যা ভোঁদাই ইয়া গাড্ডু হোনে শকতা ? কোঈ জরুর মজাক কিয়া হোগা।

চারণ যেন তার দুকানের পাশে পাটনের অট্টহাস্য শুনতে পেল। কল্পনাতে দেখতে পেল যে, জিনস-পরা পাটন কোমরে হাত দিয়ে ফুলে ফুলে হাসছে দুলে দুলে আর বলছে, 'কেমন দিলাম

www.MurchOna.com

স্যার ! কেমন দিলাম আপনাকে ? দ্য গ্রেট মিস্টার, চারণ চ্যাটার্জিকে ?'

আভ্‌ভি করনা ক্যা সাহাব ?

কেশর সিং জানতে চাইল।

চারণ বলল, চায়ে পিনা। ঔর ক্যা ?

বহুত আচ্ছা। সাহী বাত।

বলেই, পায়জামার দুটি পাই, রোগা কিন্তু রোমশ হাঁটুর উপরে তুলে চায়ের দোকানের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল ও।

চারণও তার পাশে বসে চা আর পকৌড়ার অর্ডার দিয়ে পাটনের কথাই ভাবছিল। 'মজাক'-ই করেছে যে পাটন তার সঙ্গে, তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। পাটন যে হৃষীকেশের কাছাকাছিই কোথাও রয়েছে অথবা হয়তো হৃষীকেশেই, সে সম্বন্ধেও এখন আর ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে আছেও, মনে হয়, কোনও আশ্রম-টাশ্রমেই। তাকে বুদ্ধু বানাবার জন্যেই হয়তো অমন মিথ্যাচার সে করেছিল। অথবা এও হতে পারে যে, তার গুরুদেবের নাম গোপন রাখবার জন্যেই সে মিথ্যাচার করেছিল। প্রকৃতই যে কেন করেছিল তা শুধু সে নিজেই জানে। তবে চারণকে বুদ্ধু বানালেও চারণ পাটনকে অ্যাপ্রিসিয়েট করল।

দোকানি রেকাবিতে করে পকৌড়া দিল।

চারণ বলল, এক চায়েমে শক্কর ঔর মালাই কমতি দেনা।

জি হাঁ।

বলল, দোকানি।

বেলা পড়ে গেছে। একটু পরেই সূর্য হারিয়ে যাবে পশ্চিমের শিবালিক পর্বতমালার আড়ালে। তবে মেঘহীন কলুষহীন আকাশে আলো থাকবে অনেকক্ষণ।

পাটনকে খুঁজে বের করা যায় কি ভাবে, মনে মনে যখন তাই ভাবছিল চারণ, তখনই কেশর সিং বলল, উও ভোঁদাই বাবাকি ইসপিশালিটি ক্যা হ্যায় ?

ম্যায় কৈইসি জানু ? ম্যায় দিখা থোড়ি !

বিরক্ত ও বিব্রত চারণ বলল।

খ্যয়ের, শুনাতো হোগা জরুর, নেহিত উনকি তালাসমে ইতনা দূর আয়া হি আপনে কাহে ?

বাবাকে জানি না। তবে তাঁর এক চেলার কাছেই শুনেছিলাম তাঁর কথা। চেলাকে খুঁজতেই আসা।

কেশর সিং দার্শনিকের মতো বলল, কিতনা কিসিমকি চেলা হোতা হ্যায় ইস দুনিয়ামে। কহতা তো হ্যায় 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে এক' মগর ম্যায় বহুত চেলাভি দেখা যো চিনি বন গ্যয়ে।

মানে কি হল ? চিনি ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ।

কেশর সিং পকৌড়া মুখে গবগব করে বলে উঠল, অজীব বাত সাব। 'গুরু গুড়, চেলা চিনি' আপ কভভি শুনাহি নেহি ?

নেহি তো।

কেশর সিং বলল, 'গুরু গুড় চেলা চিনি' মানে গুরু গুড়ই রয়ে গেলেন আর চেলা চিনি হয়ে বেরিয়ে গেল। মানে, গুরুর চেয়েও সরেস হল আর কী।

চারণ হেসে উঠল, তাকে পাটন বুদ্ধু বানানো সত্ত্বেও।

কেশর সিং বলল, দেবপ্রয়াগে গেছেন আপনি সাহাব ?

না। এখনও যাইনি।

বদ্রীনাথের বিগ্রহের যাঁরা বংশানুক্রমে পুরোহিত, সেই 'রাওয়ালেরা' তো ওই দেবপ্রয়াগেই থাকেন শীতের সময়ে, মন্দির বন্ধ হয়ে গেলে। দেবপ্রয়াগেই তাঁদের মূল বাস।

www.MurchOna.com

তাই ?

হ্যাঁ।

সেখানে এক বাবা আছেন, নাম অনন্তানন্দ বাবা। ঠিক দেবপ্রয়াগ বাজারে থাকেন না তিনি। যেখানে অলকানন্দা আর ভাগীরথীর সঙ্গম তারই উপরে পাহাড়ের এক গুহাতে থাকেন। তাঁর দর্শন পাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। যাকে তাকে তিনি দর্শন দেনও না। দূর থেকেই তিনি মানুষ চেনেন। মুখও দেখতে হয় না। গন্ধ পান বাতাসে। তেমন উচ্চকোটির কোনও আগন্তুক এলে তবেই দেখা দেন। নইলে দেখা আদৌ দেন না। তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশ দিনই মৌনী থাকেন। কত মানুষই যে তাঁর দর্শনলাভের জন্যে যান সেখানে। কিন্তু উনি দু একজনকেই দেখা দেন শুধু। তাও রাতের বেলা।

বলেই বলল, যাবেন আপনি সাহাব ?

চারণ বলল, নাঃ।

'নাঃ' শব্দটির মধ্যে একটু বিরক্তিও জড়িয়ে ছিল সম্ভবত। সেটা লক্ষ করেই কেশর সিং বলল, না কেন ?

আমি তো মানুষও খুন করিনি, চুরিও করিনি। কোনও বাবা দর্শন করেই বা গো-ব্রাহ্মণ পুজো করেই মুক্তি পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

ভাল মানুষ যাঁরা, তাঁরা তো আরও ভালও হতে পারেন সজ্জনের কাছে এলে।

হয়তো। ওসব নিয়ে ভাবিনি। তুমি বরং ভোঁদাইবাবা বা গাড্ডুবাবার একটু খোঁজখবর কোরো। হয়তো এখানেই থাকতেন, চলে গেছেন হয়তো এক দুদিন হল এমনও তো হতে পারে।

কেশর সিং হাসল। বলল, শুনলেন তো যে, দশ বছরের মধ্যে ভিয়াসির এদিকে কেউ কোনও বাবার কথা শোনেইনি।

তা ঠিক।

পকৌড়া আর চা খেয়ে ওরা যখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে হৃষীকেশের দিকে ফিরে চলল তখন সূর্য পশ্চিমের পাহাড়শ্রেণীর ঠিক উপরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল। পাহাড়ের পেছনে ডুবে যাবে আর দুএক মিনিটের মধ্যে।

উতরাইয়ে পথে নামছে গাড়ি এবারে দ্রুত। গাড়ি অবশ্য কেশর সিং গিয়ারেই রেখেছে। দ্রুত আলো কমে আসছে। রাইট-হ্যান্ড-ড্রাইভ গাড়ি। সামনের বাঁদিকের সিটে বসেছিল চারণ। সেদিকেই গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা, হৃষীকেশের সমতলের দিকে। ঝরঝর করে হাওয়া আর জলের শব্দ আসছে নীচ থেকে। চলন্ত যানে বসে কখনওই প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা যায় না, পাওয়া যায় না তার শব্দ ও গন্ধ, দেখা যায় না তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে।

চারণ বলল, গাড়ি জারা রোক্কো তো কেশর সিং।

পোরসাব কিজিয়েগা ক্যা ?

নেহি নেহি। এ্যাইসেহি রোক্কো।

কেশর সিং এর অত্যাধিক ঔৎসুক্যে বিরক্ত হয়ে বলল চারণ। ভাবল, দোষটা তারই। সকলকেই মাথায় চড়ায় ও। অনেকেই চড়ে পড়ার পর আর নামতে চায় না।

রাস্তা যেখানে যথেষ্ট চওড়া তেমন জায়গা দেখে গাড়িটা বাঁয়ে দাঁড় করাল একটু পরেই কেশর সিং।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে লম্বা শ্বাস নিয়ে স্বগতোক্তি করল সে, বাঃ।

কেশর সিং বলল, কুছ বোলেঁ আপ ?

নেহি।

আরও বিরক্ত হয়ে বলল, চারণ।

ভাবল, এসব জায়গাতে নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসতে হয়। এত কথা বলা, অকারণ কথা

www.MurchOna.com

অসহ্য। ওর ঘাসফড়িং মনের প্রকৃতি বুঝে চলার মতো মানসিকতাসম্পন্ন সঙ্গী আর কোথায় পাবে। এখন সব মানুষেরই যেন শুধু একটাই ধান্দা। কী করে দুটো পয়সা বেশি পাওয়া যায়। পকেট মারবার জন্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরিব-বড়লোক সকলেই যেন ধার-দেওয়া ব্লেড পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই যে প্রকৃতির মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া, এটা যেন চুক্তির মধ্যে ছিল না কুমার ট্র্যাভেলস-এর সঙ্গে, তাই তাদের প্রতিভূ কেশর সিং এত বিরক্ত চারণের এই হঠাৎ-থামাতে।

বিরক্ত তো বিরক্ত! ভাবল, চারণ।

সূর্যটা ডুবছে শিবালিক পর্বতমালার আড়ালে কিন্তু পর্বতমালার ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে লালিমা তখনও লেগে রয়েছে আর সেই লালিমার ছোঁয়া লেগেছে নীচের নদীর জলেও। ভারী শান্তি এখানে। নীচে হাওয়া আর দ্রুতধাবমানা জল যেন ঝরঝরানির শব্দের প্রতিযোগিতাতে নেমেছে একে অন্যের সঙ্গে। যদিও সেই জায়গাতে পর্বতমালা প্রায় ঊষর, কিন্তু বড় গাছপালা আছে ওপারে। তাড় গাছ দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মাথা উঁচোনো। এপারে শুধুই ঝোপঝাড়ের সবুজের প্রলেপ। তারা হাওয়ায় হেলছে দুলছে। দুলছে ঘাস, ঘাসফুল, লালটায়েন। নীচের খাড়া নেমে-যাওয়া গিরিখন্দ থেকে দিনকে বিদায় জানানোর জন্যে পুরবীতে গলা বেঁধেছে রেড-ওয়াটেল্ড ল্যাপউইগ আর তিতিরেরা, চকোর, বটের আর ব্রেইনফিভার।

নীচের গভীর গিরিখাত দিয়ে বয়েযাওয়া গঙ্গার দিকে চেয়ে, নামতে নামতে হঠাৎই খেয়াল হল যে, জলে যে লালিমার আভা ছিল তা পুরোপুরি মুছে গেছে। কালিমাতে ঢেকে গেছে তখন পর্বতরাজি, নদী। এখন চোখ চলে না আর কোথাওই। এখন শুধু কানে শোনার বেলা। আজ কৃষ্ণা দ্বাদশী। অমাবস্যা সামনেই। দিওয়ালি। তবে শুনেছে, এই দিওয়ালি সিনিবালি। অর্থাৎ, কৃষ্ণা চতুর্দশীর দিনেই পড়েছে দিওয়ালি। চাঁদ যে উঠবে না আজ তা নয়, তবে উঠবে শেষ রাতে। ফালি চাঁদ।

কত বিচিত্র ফুল আর পাতার গন্ধ বয়ে নিয়ে বেগে বইছে গাঢ় অন্ধকারে, ঝরনার মতো অবুঝ হাওয়া। গাছে ঘাসে ফুলে কানাকানি উঠছে সেই হাওয়াতে। তার খসস-খসস ফিসস-ফিসস শব্দ আসছে কানে। অন্ধকারের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপ যেন আরও বেশি করে প্রতিভাত হচ্ছে সেই দ্রুতগতি পার্বত্য হাওয়ার অদৃশ্যমান ব্যক্তিত্বর বিচিত্র গা-শিউরানো শব্দে।

চারণ ভাবছিল, যাঁরা ঈশ্বর দেখতে মন্দিরের অন্দরে, পাহাড়ে-কন্দরে যান, তাঁরা তা যান। চারণের ঈশ্বর এমন এমন জায়গাতে এমন এমন মুহূর্তেই দেখা না-দিয়েও দেখা দেন চারণকে। অবয়বহীন, প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত, কিন্তু অন্তরের অন্তরতমে অন্তরময় অন্তর্যামীর প্রাণস্বরূপ হয়ে।

কেশর সিং হঠাৎই বলে উঠল, কভভি কভভি ভাল আ যাতা হ্যায় হিঁয়া উপ্পরসে উত্তারকে। জানোয়ারসে এলাওয়া ঔর বহুত কিসিমকি ডরভি হোতে হ্যায় ইয়ে সব জাগেমে সাহাব, সুরজ অস্ত হো যানে কি বাদহিমে। আইয়ে সাহাব, অব চলা যায়।

ঘোর ভেঙে গেল চারণের। চমকে উঠে অন্ধকারে মুখ ঘোরাতেই দেখল কেশর সিং-এর অনির্বাণ সিগারেটের আগুন সেই নিঃসীম অন্ধকারে বাঘের চোখের মতনই জ্বলছে। সাদা অ্যাম্বাসারডাটাও যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। এমনই নিকষ কালো অন্ধকার। তবে আর একটু পরেই যখন তারারা আকাশময় এক এক করে ফুটে উঠবে, হাস্যময়ী সদ্য-যুবতীর মুখের মতন টলটলে, নীলাভ সবুজাভ কমলাভ দ্যুতিসমৃদ্ধ হয়ে, তখন এই অন্ধকারও আর অন্ধকার থাকবে না হয়তো।

এখন উঠেছে শুধুমাত্র সন্ধ্যাতারা।

কেশর সিং-এর কথায় সায় দিল না ও, কোনও প্রতিবাদও করল না। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে গাড়ির সামনের বাঁদিকের দরজাটা খুলল। খুলতেই, গাড়ির ভিতরের জ্বলে ওঠা আলো সেই অন্ধকারের নিভৃতি আর আশ্লেষকে ছিন্নভিন্ন করে দিল।

আশ্চর্য! গাড়ির ব্যাটারির ওই অতটুকু সামান্য আলোই ছিন্নভিন্ন করল এই আদিগন্ত অসামান্য অন্ধকারকে! মানুষ বড় ছিন্নমতি প্রাণ। বড়ই ছিন্নমতি!

ভাবল, চারণ।

www.MurchOna.com

হৃষীকেশে পৌঁছে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি অবধি না গিয়ে দেরাদুন রোডের ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোল শ্লথ পায়ে। এখানে কত মানুষ, কত রকমের মানুষ, দোকান, বাজার, চোখ-ধাঁধানো আলো, চিৎকার, দর কষাকষি, সারা ভারতের মানুষের ভিড় অথচ এখান থেকে পনের মিনিট দূরেই কী নিস্তব্ধ আশ্চর্য সুন্দর এক পৃথিবী, যে, সেই পৃথিবীর বাসিন্দা হতে চায়, তার জন্যে প্রায় নীরবেই অপেক্ষা করছে যুগযুগান্ত ধরে। মানুষের মতন Paradox সম্ভবত দ্বিতীয় নেই। এমন স্ব-বিরোধী প্রাণী বিধাতা আর সৃষ্টি করেননি।

কেন জানে না চারণ, আজ গাড়ি থেকে নেমে ত্রিবেণী ঘাটের দিকে এগোতে এগোতেই ওর মন ধিয়ানগিরি মহারাজের কাছে যাবার জন্যে উচাটন হয়েছিল। অথচ এতদিন কাছে গিয়েও তাঁকে উপেক্ষা করেছে। এতদিনে কি তার মনের গুমোর কাটল ? তার ইগোর আবরণ কি ছিন্ন হল কেদার আর বদ্রীনাথের পথে ভিয়াসি অবধি গিয়েই ? ভাবছিল ও।

মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয়। বড় বিচিত্র সৃষ্টি সে বিধাতার। গিয়ে হয়তো পৌঁছেও যেত সোজা ধিয়ানগিরির কাছে আজ কিন্তু বাদ সাধলেন তাঁর চার পাঁচজন সাদা চামড়ার চেলা-চামুণ্ডা। তাঁরা ঘিরে ছিলেন ধিয়ানগিরিকে। বাদ সাধলেন ভীমগিরিও। ভীমগিরিকে দেখতে পায়নি ও প্রথমে। তিনি ভজন গাইছিলেন অন্যদের ভিড়ে মিশে। রামমন্দিরের মস্ত চাতালে বসে। চারণ গিয়ে পৌঁছল আর তখুনি ভজনও শেষ হল তাঁর। অন্যরা গাইছিলেন তখনও। ভীমগিরি হাত তুলে ডাকলেন চারণকে।

এই চাতাল-সংলগ্ন মন্দিরের বিগ্রহ যে রাম তা চারণ জানত না। জানত যে, কোনও বিগ্রহ আছেন ভিতরে এই পর্যন্ত। মন্দিরের অন্ধকার অভ্যন্তরের কোনও বিগ্রহ সম্বন্ধেই ওর কোনও আগ্রহ তো কোনওদিনই ছিল না। বিগ্রহর নাম জানার পর থেকে ওর অবাক লাগছিল যে, মন্দিরটি যদিও রামের কিন্তু মন্দিরের চাতাল সকলেরই। সেখানে কালিভক্ত, শিবভক্ত, বিষ্ণুভক্ত, গণেশভক্ত, সরস্বতীর ও লক্ষ্মীর পূজারী সকলেরই সমান অধিকার। হিন্দুদের দেবদেবী নাকি তেত্রিশ কোটি। হয়তো হবে। কিন্তু এই রামমন্দির-সংলগ্ন চাতালে সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে দেখে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে যে কোনও বিরোধ বা উচ্চনীচভেদ নেই তা বুঝতে পারছে।

এক একজন তার আরাধ্য দেবতাকে একেকরকম চোখে দেখেন যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু All Roads Lead to Rome এই গন্তব্যের একদেশদর্শিতা যদি সর্বধর্মের মধ্যে ঘটানো যেত, তবে অযোধ্যায় সম্ভবত বাবরি-মসজিদ আর রামমন্দির নিয়ে এত কাণ্ড ঘটত না।

ভীমগিরি বললেন, কোথা থেকে ?

অনেকই জায়গা থেকে।

মানে ?

চন্দ্রভাগাতেও গেছিলাম খাওয়ার পরে, আপনারা শোভাযাত্রা করে যাচ্ছেন দেখলাম শব নিয়ে।

তা এলেন না কেন ? মানে, যোগ দিলেন না কেন ?

আমার কী অধিকার ?

শবযাত্রায় যোগ দিতেও যেদিন অধিকার বিচার করা হবে সেদিন হিন্দুধর্মের মৃত্যুঘণ্টাটা সত্যিই বাজবে। তারপরে কোথায় গেলেন ?

ভিয়াসি।

ভিয়াসি ? হঠাৎ ? ভিয়াসিতে কি আছে ?

www.MurchOna.com

কিছু নেই। তবে থাকতে পারত। আচ্ছা আপনি ভোঁদাই বাবা বা গাড্ডুবাবু বলে কোনও সাধুর খোঁজ রাখেন ? আশ্রমও আছে শুনেছি।

হো হো করে হেসে উঠলেন ভীমগিরি। বললেন, আপনার সামনে যে বাবা বসে আছেন তিনিই যদি ভোঁদাই বাবা না হন তো আর কে হতে পারেন ? আচ্ছা, আপনি ভাবলেন কি করে যে কোনও সন্ত তাঁর নিজের নাম রাখবেন ভোঁদাইবাবা ?

সন্তরা নাম কি নিজেরা রাখেন ? নাম তো রাখেন হয় গুরু, নয় শিষ্যরা।

তা ঠিক। হয় গুরুরা নয় গরুরা।

ছিঃ ছিঃ।

বলে উঠল চারণ।

গুরু-শিষ্যর পরম্পরাতে তার যে এমন ভক্তি জন্মে গেছে তা হৃদয়ঙ্গম করে পুলকিত যেমন হল, তেমন ভয়ার্তও হল। এই রোজ ত্রিবেণীঘাটে আসা আর ভীমগিরির সঙ্গ করাটা বোধ হয় মোটেই ভাল হচ্ছে না।

আজকে আপনার গুরুজির কাছে যাব।

চারণ হঠাৎই অ্যানাউন্স করল।

হাসছিলেন ভীমগিরি। বললেন, মন উচাটন হয়েছে এতদিনে ?

তা বলতে পারি না, তবে খুব ইচ্ছে করছে যে, ওঁর সঙ্গে আলাপিত হই। আমি তো আর এখানে মৌরসী-পাট্টা গেড়ে বসার জন্যে আসিনি। কবে যে চলে যাব এখান থেকে তা কে বলতে পারে।

বাঃ।

বাঃ কেন ?

এই মানসিকতাটাইত সব। এক জায়গাতে থেবড়ে বসে থাকে শুধু গৃহীরাই। যে ঘর ছেড়েছে তার স্বাধীনতার মূল মন্ত্রই হল এই। আজ মন করল তো এখানে, কাল করল না তো সেখানে। অস্থাবর জঙ্গমের মতন হবে তাঁর মানসিকতা। স্থাবর সম্পত্তির মতন ভারী হল গৃহীর মন। তার শিকড় পৌঁছে যায় অনেকই গভীরে। তার নিজের চোখেরই আড়ালে আবডালে। সে যদি পাততাড়ি গুটোতেও চায় তাহলেও সে পারে না সহজে। মাটি টানে, নারী টানে, স্বার্থ টানে, প্রেম টানে, যশ টানে, মান টানে। এতসব টানের মোহ কাটিয়ে নিজেকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে কোথাওই চলে যাওয়া ভারী কষ্ট আর অসুবিধের বলেই তো পারে না গৃহী ঘর ছাড়তে।

ঘরে থেকেও তো সন্ন্যাসী হওয়া যায়।

অবশ্যই যায়। তবে যাঁরা পারেন, তাঁরা অত্যন্তই উচ্চমার্গের মানুষ। সে বড় কঠিন তপস্যা।

সংসারে থেকেও সন্নিসীর কথা শুনেছি বটে কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম ভেবে দেখিনি।

তাঁরা গাছেদের মতন।

গাছেদের মতন ?

হ্যাঁ। যদি কখনও গহন বনে বা পাহাড়ে গিয়ে থাকেন চৈত্র-বোশেখ মাসে অথবা ভরা গ্রীষ্মে তাহলে দেখে থাকবেন পর্ণমোচী গাছেদের পাতা সব ঝরে গেছে। গাছেরা উর্ধ্ববাহু নাগা সন্নিসীদের মতন সার সার গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে, মনে হবে যে, দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা হেঁটে চলেছে অবিরতই, দেশে-দেশান্তরে। না হেঁটেই। গৃহী সন্নিসীরাও ওই পর্ণমোচী গাছেদেরই মতন উর্ধ্ববাহু, বাহুল্যহীন, ঝাড়া হাত-পা, স্থবির অথচ অস্থাবর।

বাঃ।

বলল, চারণ।

ভীমগিরি বললেন, গুরুজির সেই শিষ্যরা ফিরে এসেছেন বদ্রীনাথ থেকে। তাঁদের স্ত্রীরা গেছিলেন মুসৌরী, দেরাদুন হয়ে, তাঁরাও এসেছেন। এঁদের বাড়ি শুনেছি অস্ট্রিয়াতে। জায়গাটা কোথায় চারণবাবু ? আপনি গেছেন কি কখনও ?

www.MurchOna.com

জায়গাটা ইউরোপের একটি দেশ। আপনাকে তো বলেইছিলাম একদিন। ভারী সুন্দর দেশ। সে দেশের মানুষেরাও খুব সুন্দর। নারী-পুরুষ সবাই। আমি যে সময়ে গেছিলাম, দেওয়ালির কিছু আগে, তখন ওদের দেশের গ্রামে গ্রামে একটি উৎসব হয় দেখেছিলাম। খুব মজার উৎসব।

কী উৎসব ?

গরুদের চরতে পাঠায় ওরা গ্রীষ্মের গোড়াতে, পাহাড়ে। সঙ্গে যায় বড় বড় শেফার্ড-ডগ। মানে সেই কুকুরেরাই গরুদের চরায়, পাহারা দেয়। মানুষ সঙ্গে যে যায় না তা নয়, তবে নগণ্য। অনেক সময়ে যায়ও না। আমাদের মতো গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেমেয়ে পয়দা করে না কোনও সভ্য দেশের মানুষেরাই। সে সব দেশে সব কিছুরই প্রাচুর্য। শুধু মানুষের সংখ্যাই কম। গরমের শেষে, সে দেশে তো আমাদের মতো বর্ষা নেই, গরমের পরেই হেমন্ত, ওরা বলে ফল...।

কি বলে ?

Fall। গাছের পাতারা সব লাল, হলুদ খয়েরি, পাটকিলে, কালো এবং আরও যে কত-রঙা হয়ে যায় তা কী বলব ! যখন হেমন্ত আসে, তখন গরুদের নামিয়ে আনে ওরা পাহাড় থেকে সমতলে। গরুদের ঘরে ফেরার পরে অস্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চলের গির্জাতে গির্জাতে উৎসব হয়, তার নাম 'Dorffest'। গরুদের মঙ্গলকামনা করে প্রার্থনা করা হয় গির্জাতে। তারপর রাতে দেদার মদ্যপান, নাচ গান আনন্দ করা হয়।

Fest কথাটা ইংরেজি Festivalএর সংক্ষিপ্ত রূপ নয় ?

ভীমগিরি বললেন।

আপনি তো বেশ ভালই ইংরেজি জানেন দেখছি। অবাক হয়ে বলল, চারণ।

তারপর বলল, অস্ট্রিয়ান আর জার্মানরা দুটি F ব্যবহার করে FFEST।

আপনি ঠিক বলেছেন। Festival কেই ওদের ভাষায় বলে Ffest। ওই উৎসবের নাম Dorffest।

বাঃ। তবে যে অনেকের ধারণা আমরা ভারতীয়রাই গরুদের পুজো করি এবং সে জন্যে তো অনেক কটু-কাটব্যও অনেকের কাছেই শুনতে হয়। সাহেবরাও যে গরুদের এত ভক্তি করে জানা ছিল না তো ! বলব তো সকলকে। কি যেন বললেন নামটা উৎসবের ?

আরেকবার বলুন ?

Dorffest।

হ্যাঁ ডরফফেস্ট। মনে থাকবে এবার।

চারণ বলল, এত দিন আপনার সঙ্গ পাওয়া হল অথচ আপনার দেশের সন্ত তুকারামের সম্বন্ধে কিছুমাত্রও জানা হল না। অনেকদিনই ভেবেছি যে জিজ্ঞেস করব, তা একথা সে কথাতে বেলা গেছে। ধিয়ানগিরি মহারাজের তো ফাঁকা হতে সময় লাগবে ততক্ষণে বলুন না তাঁর কথা, শুনি। উনিও তো আপনারই মতন মারাঠি ?

হ্যাঁ। অবশ্যই মারাঠি।

তারপরই বললেন, আজ কি আপনি হোটেলে ফিরে যাবেন না ?

নাও যেতে পারি। মানে, গেলেও হয়, না গেলেও হয়।

আটটা তো বাজবে একটু পরেই। কী ব্যাপার ?

ব্যাপার আর কী ! আপনাদের হাওয়া লাগছে আর কী গায়ে।

ভাল ভাল। খুব ভাল। আজকে তবে গুরুজির সঙ্গে কথা বলে তবেই যাবেন। রাত বাড়লে চাতাল এবং ঘাটও সুনসান হয়ে যাবে। তখন কথা বলে আরাম হবে। চাই কি গুরুজির মুড ভাল থাকলে আপনাকে গানও শোনাতে পারেন। তবে গান উনি করেন গভীর রাতে।

বলেই বললেন, চা খাওয়া হবে না, কি একটু ? আর গোটাদুয়েক গাঁজার বিড়ি ?

চারণ বলল, হোক।

চাতালের দোকানের ছেলেটা ঘুর ঘুর করে সবসময়েই। তাকে বলে দিল চারণ দুটি চায়ের

www.MurchOna.com

কথা। ভাঁড়ে করে নিয়ে আসবে সে।

ভীমগিরি বললেন, হাওয়াতে হিম লেগেছে। আনতে আনতে ভাঁড়ের চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। চলুন, আমরা দোকানে গিয়েই খাই।

চলুন। বলল, চারণ।

তারপর বলল, এদিকে উপোস আছেন আর খালি পেটে চা আর গাঁজার বিড়ি খাচ্ছেন আপনার অম্বল হবে না, তো কার হবে ?

তো হোক। বেচারা অম্বলেরও তো কোনও আধার চাই। তারও তো ক্রিয়া-কর্ম আছে নিজস্ব। আমার মতন মানুষের পেট না পেলে সেই বা বাঁচে কি করে।

হেসে উঠল চারণ ভীমগিরির কথাতে।

ভাঁড়ের চা খেল ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দোকানের সামনে। তারপর গাঁজা-ভরা বিড়িতে সুখটান লাগিয়ে ফিরে এসে আবার বসল চাতালে।

চারণ বলল, বলুন এবারে তুকারামের কথা।

শুনুন তবে বলি।

ভীমগিরি শুরু করলেন।

তুকারামের উপাস্য দেবতা ছিলেন বিঠঠলজি। একুশ বছর বয়সেই উনি বিঠঠলজির দয়া পান। দারিদ্র্যে, রোগে, শোকে ব্যাতিব্যস্ত তুকারাম বারবার পনঢরপুরের বিঠঠলজির মন্দিরে আসেন। এলেই, বিঠঠলজি যেন তাঁর সর্বদুঃখহরণ করতেন। পনঢরপুরে ভীমা নদীর পারে প্রভুর মন্দির। একদিন উৎসব শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত তুকারাম নদীর পারে পৌঁছে, চান সেরে এক পুরনো বটের ছায়াতে এসে বসে সূর্যাস্ত বেলাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম তো এল না, তন্দ্রা এল। তন্দ্রার ঘোরে তুকারাম হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন যে, এক সুন্দর দিব্যপুরুষ বৈষ্ণব সেই গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি হাসিমুখে তুকারামকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বহুদিন ধরে ভক্ত তুকারাম বিঠঠলজির করুণার জন্যে চাতকের মতন প্রার্থনা করেছিলেন। সেই প্রার্থনা এতদিনে সফল হল।

তুকারাম আনন্দে মুর্চ্ছা গেলেন।

মুর্চ্ছা যখন ভাঙল, তখন তাকিয়ে দেখেন সেই দিব্যপুরুষ অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু তার দেহমনের মধ্যে চৈতন্যমন্ত্রর ঝড় উঠেছে যেন। চৈতন্যদেবের নাম ও প্রেমের প্রচারই সেদিন থেকে তুকারামের জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠল। উনি মারাঠিতে যেসব অভঙ লিখেছিলেন তা আজও লক্ষ লক্ষ মারাঠির মন উদ্বেলিত করে।

সেই অভঙ কেমন ? শোনান না একটা ?

চারণ বলল।

সেই দিব্যপুরুষ দর্শনের পরেই তুকারাম যে অভঙটি লিখেছিলেন সেটি হল :

"রাঘবচৈতন্য কেশবচৈতন্য
সাঙ্গি তালি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাচী আপনে সাঙ্গিতলে নামাঙ্গ
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্লা দশমী পাহুসী গুরুবার
ফেলা অঙ্গীকার তুকা ভনে।"

চারণ বলল বাঃ। মারাঠি ভাষার সঙ্গে তো বাংলা ভাষার অনেক মিল আছে।

মানসিকতারও আছে। এই কথা আমাকে পুনের আশ্রমের জ্যামখিণ্ডিকার বাবাজী বলেছিলেন। তিনি বাংলাও জানতেন।

তাই ?

হ্যাঁ।

www.MurchOna.com

ভীমগিরি মহারাজ বললেন, আসলে সেই যে দিব্যপুরুষ, তিনি কিন্তু অলীক নন। তিনি এক সিদ্ধপুরুষ হিসেবে মহারাষ্ট্রে জন্ম নেন। তাঁর সমাধিও আছে মহারাষ্ট্রের ওতুর গ্রামে। তবে তাঁর পুরো পরিচয় এখনও রহস্যাবৃত। তবে তিনি যে তুকাকে সহজ সরল মারাঠা কথ্য ভাষাতে ওইসব অভঙ লিখতে বলেছিলেন সে জন্যেই তুকারামের পক্ষে অত সহজে নিজের হৃদয়ের সব ভক্তি উজাড় করে অভঙ-এর পর অভঙ লিখে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। ...তবে

এই অবধি বলেই থেমে গেলেন ভীমগিরি।

কী হল ?

বলেই, চারণ তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখল অস্ট্রিয়ান শিষ্যর দল ধিয়ানগিরির সামনে থেকে উঠে চলে যাচ্ছেন। ধিয়ানগিরি আবারও একা। সামনে ঈষৎ ঝুঁকে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের উপর নিজের মনে আঙুল দিয়ে তাল দিয়ে নিরুচ্চারে কোনও গান গাইছেন।

ভীমগিরি বললেন, চলুন এবারে।

বলেই, তুকারাম প্রসঙ্গ বন্ধ করে চারণকে সঙ্গে করে এগোলেন গুরুর দিকে।

চারণের ভাল লাগছিল না। জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কখনও দালালের সাহায্য নেয়নি ও। সমস্ত দালালদেরই সে ঘৃণা করে। তা তারা ঘুষের দালালই হোক, কী মেয়ের দালাল, কী যশের দালাল, ক্ষমতার দালাল কী আত্মিক মুক্তির দালাল।

অথচ এখন ভীমগিরির সঙ্গে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই।

চারণকে দেখেই ধিয়ানগিরির মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেমন হাসির আভাস সে দেখেছিল আজ কুঞ্জাপুরী থেকে ফিরেই তাঁর মুখে। সোজা হয়ে বসলেন তিনি পলিথিনের মলিন, সাদা এবং নিচু, চাঁদোয়ার নিচে। সোজা হয়ে বসলে, সেই চাঁদোয়ার যা উচ্চতা, তাতে তাঁর মাথা থেকে ইঞ্চিদুয়েক ব্যবধান থাকে মাত্র।

মহারাজই বটে। মহারাজার যে কত্তরকম হয়!

ধিয়ানগিরি মহারাজ কোনও কথা বললেন না। আবারও হাসলেন। তারপর ম্যান্ডোলিনটি তুলে নিয়ে তা বাঁধতে লাগলেন।

কিঁউ বেটা ? গানে কি শখ হ্যায় ? না ?

চারণ বলল, শুনতে ভালবাসি।

গাইতেও ভালবাসো।

আমি যা গাই, তাকে গান বলে না।

যাই প্রাণ থেকে ওঠে, এবং সুরে ভরপুর হয়ে প্রকাশিত হয়, তাই গান। তবে যদি কারও গলা সুরে না বলে, তার গান গাওয়া কখনওই উচিত নয়। তা অন্যের আনন্দর কারণ না হয়ে পীড়ারই কারণ হয়। বেসুরো গায়ক বা যার গলাতে সুর কম লাগে বা যার স্বর কর্কশ তার গান শোনার মতো শাস্তি সুরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের আর দ্বিতীয় নেই।

তা ঠিক। বলল, চারণ।

তারপর বলল, একবার আলমোড়াতে বেড়াতে গিয়ে সজ্জনবাবু নামের এক অন্ধ এবং ভক্ত গায়কের ভজন শুনেছিলাম। সেই ভজনে যা ভক্তিরস ছিল, যা ভগবত প্রেম, নিজে নয়নহারা বলেই বোধহয় তাঁর নয়ন দিয়ে ঈশ্বরকে দেখার যে নির্মল, নির্ভেজাল আকুতি ছিল, তা আজও আমাকে আলোড়িত করে। কিন্তু ভজনটার প্রথম কলি দুটি শুধুমাত্র মনে আছে। আর কিছুই মনে নেই। মনে যে পড়ে না, সে জন্যে বড় কষ্ট পাই।

গাও না বেটা। গাকে শুনাওতো সাহী, দেঁখে, কৌনসি গানা ? ম্যায় বয়ানকি ইয়াদ ভি দিলা দেনা শকতা তুমকো উও গানা ম্যায় ভি শুনা হোগা তো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল চারণ। সে তো আর গায়ক নয়।

গাও বেটা গাও। উৎসাহ দিয়ে বললেন ধিয়ানগিরি মহারাজ। ভগয়ানকি ভজন করনেমে শরম কওন চি ক্যা ? গাও।

www.MurchOna.com

চারণ ধরে দিল ভজনের মুখটা, সাহস করে।
"খোঁজে খোঁজে তুমহে কানহাইয়া মুঝে নায়না ধারে"...
আর সঙ্গে সঙ্গে ধিয়ানগিরি মহারাজ জলদগম্ভীর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন,

'মোরে মন্দির অবলো নেহি আয়ে
কওনসী ভুল ভঁয়ি মেয়োঁ আলি
প্রেম পিয়া বিনা আঁখিয়া তরস রহি
উনবিনে জিয়া ভরমায়ে'।
খোঁজে খোঁজে তুমহে কনহাইয়া
মুঝে নায়না ধারে।

এই 'ভরমায়ে' শব্দটির মানে কি ?
চারণ, ধিয়ানগিরির গান শুনে মুগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করল।
ভরমায়ে মানে জানো না ? কী বলব ? মানে, মানে, মনে কর, Worry.
ওঃ।
চারণ বলল।

এই ভজনটি জয়জয়ন্তীতে বাঁধা। আমি অন্তত তাই শিখেছি। জয়জয়ন্তীতে আরোহীতে শুদ্ধ নিখাদ আর শুদ্ধ গান্ধার লাগে আর অবরোহীতে দুইই কোমল। তবে বক্রভাবে লাগে। এখানে মন্দির শব্দটির মানে হচ্ছে মন-মন্দির।

ধিয়ানগিরি মহারাজ সঙ্গে ম্যান্ডোলিনটি বাজাচ্ছিলেন। ঠিক বাজানো যাকে বলে তা নয়। শুধুই একটু ছেড়ছাড়। সুর যদি উপছে পড়ে এদিক ওদিক হয়ে না যায়, তারই ঘেরাটোপ হিসেবে যেন ব্যবহার করছিলেন যন্ত্রটি। ম্যান্ডোলিনের আওয়াজটা চারণের কানে যেন সরোদের মতনই শোনাল। অবাক হয়ে বাজনাটির দিকে চেয়ে রইল ও।

আমার এক আমেরিকান শিষ্য এনে দিয়েছিল বছর দুয়েক আগে। গান গাইলে, খালি গলাতেই গাই। আমি গাই, তিনি শোনেন। মাঝে অন্য কোনও অনুষঙ্গর দরকারই বা কি ?

বলেই বললেন, আচ্ছা বছর কুড়ি আগে প্রয়াগে একবার তোমাদের কলকাতার এক বাঙালি ছোকরার সেতার শুনেছিলাম, ভারী ভাল হাত। সে কি এখনও কলকাতাতেই আছে ?

কি নাম ?
নিখিল ব্যানার্জি।
নিখিল ব্যানার্জি ! তিনি তো বিখ্যাত বাজিয়ে।

আছে কোথায় ? দেখা হলে বলো তো বেটা যে ধিয়ানগিরি মহারাজ তার খোঁজ করছিল। একদিন এই রাম মন্দিরের চাতালে তার পক্ষে গভীর রাতে বাজানো কি সম্ভব হবে ? যা খুশি ওর, তাই বাজাবে। হাম্বির বা দেশ বা জয়জয়ন্তী বা মালকোষ বা ঝিনঝোটি।

চারণ বলল, তিনি তো গত হয়েছেন।
দেহান্ত হো গ্যয়ে ? তাই ? কবে ?
অবাক হয়ে বললেন ধিয়ানগিরি।
বছর কয়েক হয়ে গেল।

ওঃ, তাহলে তো মিটেই গেল। ও মন্দিরের বিগ্রহর সামনে আর কি বাজাবে ? স্বয়ং দেবদেবীদেরই শোনাচ্ছে এখন তার বাজনা স্বর্গের বাগানে বসে, পারিজাতের গন্ধের মধ্যে। ক্ষণজন্মা ছেলে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যার উপরে না থাকে তার পক্ষে অমন কলাকার হওয়া কখনওই সম্ভব নয়। ভাল মানুষদেরই ঈশ্বর তাড়াতাড়ি টেনে নেন নিজের কাছে।

আপনি শুনেছি গান-বাজনা গুলে খেয়েছেন।
চারণ বলল, ধিয়ানগিরি মহারাজকে।

www.MurchOna.com

আমি ? কে বলেছে ?

ভীমগিরি মহারাজ।

গানবাজনা সম্বন্ধে ভীমার যতটুকু জ্ঞান এবং গুলে খাওয়া সম্বন্ধেও, তারই প্রেক্ষিতে বলেছে। গান তো আর সিদ্ধির গুলি নয় ! যে গুলে খাওয়া অত সহজ।

ওঁর নাম কি ভীমা ?

নাম ভীমগিরিই কিন্তু সন্ত তুকারামের আরাধ্য দেবতা বিঠঠলজির পনঢরপুরের মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভীমা নদীর নামেই আমি ডাকি ওকে। নামটা ছোটকে ছোটও হয় আর ওরও ওর দেশের সন্ত এর কথা মনে পড়ে যায় প্রতি ডাকে।

তারপর বললেন, নিউটন না কে বলেছিলেন না ? জ্ঞান সমুদ্রের বালুকাবেলায় উপলখণ্ড কুড়োচ্ছি মাত্র, তেমনই আমিও ওই বালুবেলাতে বালুকণাই কুড়িয়েছি শুধু। হিন্দুস্থানী রাগ-সঙ্গীত এক সমুদ্র বিশেষ। দুঃখ হয়, যখন দেখি যে তোমাদের মতন ছেলেমানুষেরা যা কিছু ভারতীয়, যা কিছু শাশ্বত, সুন্দর তার সব কিছুকেই বর্জন করার মধ্যে একধরনের বাহাদুরি বোধ কর। বাখ, বীটোভেন, মোৎজার্ট, মেন্ডহেলসন বা স্ট্রস এর নাম উচ্চারণ করতে শ্রদ্ধাতে তোমাদের মাথা নুয়ে আসে অথচ সদারঙ্গ, বা তিয়াগারাজন বা শার্ঙ্গদেব বা হালফিলের বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, হাফিজ আলি খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর, বড়ে গোলাম আলি খাঁ, আমীর খাঁ সাহেব, বিসমিল্লা খাঁ সাহেবদের তোমরা ব্রাত্যজন বলে মনে কর। এতে আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাত, পরের অনুকরণ করে আমরা যে নিজেদের বড়াই করি এই কথাই প্রমাণিত হয়।

সবাই করে না।

চারণ বলল।

না, তা করে না। খুব উচ্চবিত্ত মহলের কিছু মানুষে কদর করেন। তবে তাঁদের মধ্যেও কজন যে সত্যিই বোঝেন উচ্চাঙ্গসঙ্গীত মন্মথ ঘোষ বা নাটোরের মহারাজার মতন আর কজন 'বোদ্ধা'র ভেক ধরে মহার্ঘ্য শাল গায়ে জড়িয়ে মেহফিল-এ উপস্থিত হন, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আর বোঝেন, সাধারণ মধ্যবিত্তরা, তোমাদের কলকাতার পাঁচুবাবুর মতন।

পাঁচুবাবু কে ?

আরে পাঁচুবাবুর নামও শোনোনি ? অমিয়নাথ সান্যাল। তাঁর লেখা বইও কি পড়োনি ? বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ যে সে বই ! আজকাল অবশ্য তোমাদের কলকাতার বাঙালিরা সবাই সাহেব হয়ে গেছে। মাথাতে জোরে টোকা মারলে শুকনো গোবর ঝরে পড়ে যাদের, তারাই প্রত্যেকে তেল সাবান বা খবরের কাগজ কোম্পানির কেউকেটা বা দালাল। সেই হস্তীমূর্খরা জিনস পরে, হাতে ঢাউস ইংরেজি পেপারব্যাক নিয়ে এরোপ্লেনের সিটে বসে সবজান্তা মনে করে নিজেদের।

অমিয়নাথ সান্যাল মশায়ের বইটির নাম কি ?

চারণ শুধোল।

'স্মৃতির অতলে'। সে বই যদি কোনও শিক্ষিত বাঙালি না পড়ে থাকেন, তবে তাঁকে আমি শিক্ষিত বলে আদৌ মানতে রাজি নই। অমন সেন্স অফ হিউমার, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের রথী-মহারথীদের নিয়ে, অমন জিন্দা-দিল, মন-মৌজী লেখা আর হয়েছে বলে তো আমি জানি না। নেহাৎ অমন বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা যায় না তাই, নইলে পৃথিবীর সাহিত্যেও ওই বই প্রথম সারিতে স্থান পেত।

কাদের নিয়ে লেখা সে বই ?

কেন ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, মৈজুদ্দিন মিঞা, কালে খাঁ সাহেব, বাঈজি গহরজান, মালকাজান, চুলবুল্লেওয়ালি আর আগ্রাবালি, আরও কত সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের নিয়ে লেখা সে বই। একটি বিশেষ যুগ, একটি বিশেষ সাঙ্গীতিক আবহ তাতে নিখুঁতভাবে ধরা আছে।

তাই ? তা অনুবাদ করা যায় না কেন ? ইংরেজিতে ?

www.MurchOna.com

যায় না, ওই সাঙ্গীতিক আবহ পুরোপুরিই ভারতীয় বলেই। একজন ভারতীয় ইংরেজি ফুটিয়ে কখনওই বাখ বিঠোভেন কপচিয়ে, কাফকা-কাম্যু-মার্কেজ আউড়ে কোনওদিনই একজন 'পশ্চিমী' হয়ে উঠতে পারে না। কখনওই না। তাছাড়া, সাদা চামড়ার মানুষেরা, কেউ তা হয়ে উঠতে গেলেও কোনওদিনও তাকে স্বীকারও করবে না। এই সরল সত্যটা তোমরা বুঝলে না বেটা। তাই তো এমন একটা দেশের আজ এই হাল। যে দেশের মানুষ নিজের ধর্ম, নিজের সংস্কৃতি, নিজের শিল্প-সঙ্গীত, সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অজ্ঞ, স্বেচ্ছায় অজ্ঞ, সেই দেশের ভবিষ্যৎ বলে কি কিছু থাকতে পারে ?

চারণ কথা ঘুরিয়ে বলল, 'স্মৃতির অতলে' বইটি আপনি কোন ভাষাতে পড়েছেন ? কোন কোন ভাষায় ওটি অনূদিত হয়েছে ?

অনূদিত কি কোন ভাষাতেই হয়েছে ? কোনও ভারতীয় ভাষাতেও হয়েছে বলে শুনিনি। তবে হিন্দিতে এবং উর্দুতে হওয়া যদিও অবশ্যই উচিত ছিল কিন্তু স্বাধীনতার পরে বাঙালিরই মতন বাংলাভাষারও তো কোনও মর্যাদা নেই আর। বাংলাদেশ যদি না থাকত তবে ভারতবর্ষ থেকে এতদিনে পশ্চিমবঙ্গের মাড়োয়ারি, গুজরাটি, বিহারি, সিন্ধির চাকর ট্যাশ-গরুর মতন ট্যাশ বাঙালিরা বোধহয় বিলোপই করে দিত এই ভাষাকে। বাংলা ভাষাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবিত্ত বাঙালিরাই।

আপনি এত জানলেন কি করে ? আপনি কি বাঙালি ?

সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত ও উত্তেজিত ধিয়ানগিরি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপরই বললেন, পূর্বাশ্রমকি বারেমে কভভি কুছ পুছনা নেহি চাইয়ে কইভি সাধু-সন্তকো। ম্যায় ভারতীয় হুঁ। ইস মহান দেশ কি এক সাধারণ নাগরিক। ইসসে বাড়কে ঔর কুছভি পরিচয় হামারা হ্যায় নেহি বেটা। মগর ইয়ে বাত ভি সাহী, যো ম্যায় বাংলা ভাষা জানতা হুঁ, বাংলামে লিখা-হুয়া বহুতই কিতাব পড়ভি চুঁকে হুঁ।

চারণের মন বলছিল ধিয়ানগিরি মহারাজ নিশ্চয়ই বাঙালি। হয়তো বহুদিন যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে বাংলার সঙ্গে কিন্তু বাঙালি অবশ্যই।

তারপরই ধিয়ানগিরি কথা ঘুরিয়ে বললেন, দ্যাখো, হচ্ছিল গানের কথা, কোথায় চলে এলাম।

এমন সময় ভীমগিরি বললেন, জানেন তো চারণবাবু, গুরুজি একটি নতুন রাগ এর জন্ম দিয়েছেন।

হেসে উঠলেন, ধিয়ানগিরি জোরে।

বললেন, এমন করে বলছে ভীমা যেন আমি চারপাঅলা শিশুই প্রসব করেছি। নতুন রাগ জন্ম দেওয়া কঠিন আর কী। সব উস্তাদ, সব পণ্ডিতই তো আজকাল মূল রাগ এর এদিক ওদিক করে নতুন রাগ এর নামকরণ করছেন। তবে এই স্বাধীনতা শেষপর্যন্ত আমাদের রাগ-সঙ্গীতকে কোথায় নিয়ে যাবে তা অবশ্য আমি জানি না। খোদার উপর খোদকারী করার যোগ্যতা কি সকলের থাকে ?

আপনি যে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন ? নাম কি ?

আরে 'সৃষ্টি' বলে আমাকে উপহাস কোরো না বেটা। সৃষ্টি করতে একজনই পারেন, যিনি সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

তবু বলুন।

কোনও রাগ আমি আদৌ সৃষ্টি করিনি। আমার ভীমা ভীম-মুর্খ বলে 'ধ্যানতৈধত' রাগকে, আমার নাম যেহেতু ধিয়ানগিরি তাই আমারই সৃষ্ট বলে মনে করে নিয়েছে। ধ্যানধৈবত জয়ত রাগের মতন। ধা বাদী, রা সম্বাদী। উত্তরাঙ্গে দেশ রাগের মতন লাগে কিন্তু স লাগে কোমল। এর জাতি ঔরব মা, না বর্জিত। গাইবার সময় দ্বিতীয় প্রহর।

চারণ জিগ্যেস করল আরোহণটা কেমন ধ্যানধৈবতের ?

আরোহণ, সা, স গা, পা, ধা, র্সা। আর অবরোহণ, র্সা ধা পা গা ঋ সা।

বাঃ।

www.MurchOna.com

চারণ স্বগতোক্তি করল ধিয়ানগিরি মহারাজের সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন ধিয়ানগিরি, সব রাগের সঙ্গেই সব রাগের অল্পবিস্তর মিল আছে, কিছু রাগ ছাড়া। যেমন ধরো বেহাগ রাগে শংকরার ছায়া আছে। ভূপালি রাগে যদি কেউ দ্রুত খেয়াল গান করেন তবে গায়ক-গায়িকা সাবধানী না হলেই তা দেশকার হয়ে যেতে পারে। তারপরই স্বগতোক্তির মতো স্মৃতিচারণ করে বললেন, আমার মা গাইতেন যোগ রাগে দ্রুত খেয়াল, 'সজ্‌ন মোরে ঘর আও।' আহা! গান্ধার দুটি যেন পাশাপাশি দুটি গন্ধরাজ ফুলের মতো ফুটে উঠত। মায়ের গান শুনে কিশোর আমিও 'সজনু মোরে ঘর আও' নিজের গলাতে তোলার চেষ্টা করতাম।

মা হেসে বলতেন, ওরে পাগলা ছেলে! তিলং হয়ে যাচ্ছে যে রে।

বলেই, হেসে উঠলেন। তাঁর মুখ স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠল।

তারপরে একটু থেমে যেন অন্য কোনও দেশে চলে গিয়ে বললেন, কোনও ঘনঘোর শ্রাবণ সন্ধ্যাতে আমার মা গাইতেন সুরদাসী মল্লারে 'গরজত আয়ী বরখা'। কী যে দাপটে 'আ' শব্দটির উপরে সোম দেখাতেন তা আজও ভেবে শিহরিত হই।

মা আছেন?

জানি না। এসব প্রশ্ন কোরো না বাবা। আমার শুধু আমি আছি। প্রেজেন্ট টেন্স এর কারবারি আমি। না অতীত আছে আমার না ভবিষ্যৎ। কিছুদিন পরে যদি আবারও এখানে আসো তো দেখবে আমারও দেহান্ত হয়ে গেছে, আজ যেমন বিনসারের সাধুর হল। দেহান্ত অবশ্যই হবে কিন্তু তোমার স্মৃতিতে এই ভীমগিরি, এই ত্রিবেণী ঘাট এমন কি আমিও থাকব অনন্ত কাল। তুমি এখানে শুধুই বেড়াতে আসনি বেটা, যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষে প্রতি মাসে প্রতি বছরে ভেড়চাল এর মতো এখানে বুড়ি ছুঁয়ে যায়। তুমি ভেড়চাল এর মানুষ নও।

'ভেড়চাল' মানে কি?

'ভেড়চাল' মানে জানো না? গড্ডালিকা মানে জানো তো? হিন্দিতে গড্ডলিকাকেই আমরা 'ভেড়চাল' বলে থাকি।

চারণের বুকের মধ্যে এক ধুকপুকানি শুরু হল। ধিয়ানগিরি মহারাজ তাঁকে যে অসাধারণত্বে ভূষিত করেছেন, তার পেছনে কি তাঁর কোনও উদ্দেশ্যসাধনের মতলব আছে?

ধিয়ানগিরি বললেন, থাকো কদিন। ভীমার ছায়া হয়ে থাকো। তোমার মনের এবং হয়তো শরীরেরও, সব কলুষই ধীরে ধীরে মুছে যাবে। তখন তোমার মন শরতের আকাশের মতো নির্মল হয়ে উঠবে। পরতের পর পরত সন্দেহ, অবিশ্বাস, দ্বিধা যাই জমেছে, তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নির্মেঘ আকাশের মতো হবে তোমার মন। তখন আর কারওকেই মিছিমিছি সন্দেহ করবে না। তোমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হবে। দেখো।

চারণ লজ্জিত এবং অবাক হয়ে বলল, আপনাকে আমি কিন্তু সন্দেহ করিনি।

তোমার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত যে আমি দেখতে পাচ্ছি বেটা। এতে দোষের তো কিছু নেই। কলুষ আর সন্দেহমুক্ত হবার জন্যেই না তুমি তোমার সব প্রাপ্তিকে ধুলো মনে করে এমন করে বেরিয়ে আসতে পেরেছ! নিজেকেও ধুলো মনে করতে হবে। ধুলো, নগণ্য, আত্মগরিমারহিত, ঘামগুশূন্য।

পারব?

চারণের মধ্যে থেকে এক অপরিচিত, অসহায় চারণ যেন বলে উঠল।

অবশ্যই পারবে বেটা। ভীমসেন যোশীজির গলাতে সেই ভজনটি শুনেছ কি কখনও? 'যো ভজে হরিকো সদা'।

গত শীতেও তো শুনেছি মহাজাতি সদনে।

শহরের বদ্ধ হলটল-এ নয়, এখানে শুনবে, এইরকম মুক্ত জায়গাতে। গান-বাজনা সবসময়ই প্রকৃতির মধ্যে এসে শুনবে। যা কিছুই প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত তার সবকিছুই প্রকৃতির কোলেই সবচেয়ে

www.MurchOna.com

বেশি প্রণিধানযোগ্য বলে মনে হয়। এতে কোনওই ভুল নেই।

চারণ চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। কেন জানে না, ওর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও কি একজন ইললিটারেট, সুপারস্টিটাস, ইডিয়ট হয়ে গেল? ওর শিক্ষা-দীক্ষা কি সব গোল্লায় গেল? এঁরা কি গুণ করলেন চারণকে? বাণ মারলেন কি কেউ?

ধিয়ানগিরি বললেন, যা এতদিন শিখেছ, যে শিক্ষা নিয়ে তোমার গুমোর, তা শেখা নয় বেটা। সবকিছুই নতুন করে শিখতে হবে। এ এক অন্য ভাষা, অন্য পাঠ। এই যে ভাষার কথা বলছি, তা শব্দহীন। অগণ্য অক্ষর নেই এ ভাষাতে। বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন নেই। স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, ভাওয়েল, কনসোনেন্ট, এসব কিছুই নেই বেটা। সমস্ত শব্দর যোগফল এখানে শুধুই এক পরম নৈঃশব্দ্য। নৈঃশব্দ্যই সবচেয়ে বেশি শব্দময়, সবচেয়ে বেশি অর্থবাহী। যেদিন এই পর্বতমালার বা নদীর বা গহন অরণ্যের বাঙ্ময় নৈঃশব্দ্যকে বুঝতে পারবে, পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ককে, সেদিন থেকে তুমি এই নতুন পাঠশালার পোড়ো হবে। তুমি পোড়ো, আর প্রকৃতি মাস্টের। আমি কি ভীমা, আমরা সকলেই সেই পাঠশালারই পোড়ো। প্রত্যেকেই পোড়ো। আমরা কেউই তোমার মাস্টের নই হে বাবুসাহেব।

তারপর বললেন, তোমার আধারটি ভাল তা তোমাকে প্রথমবার দেখেই বুঝেছিলাম এবং সে কথা বলেওছিলাম ভীমাকে। যদি ঐকান্তিকভাবে সর্বমনপ্রাণ দিয়ে যা খুঁজতে এসেছ, তা খোঁজ, তবে তাকে পাবে বইকী। ভীমা বা আমিও এখনও পাইনি। কিন্তু এই খোঁজ এক দারুণ খোঁজ। প্রাপ্তি নাই বা যদি ঘটেও এই খোঁজে যে সামিল হতে পেরেছিলে এই কথা বুঝলেই জানবে যে, মানবজনম সার্থক হল।

চারণ অভিভূতের মতো বসে ছিল। তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন কোনও অদৃশ্য বিদ্যুততরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল। সে স্থির হয়ে বসেছিল। ধিয়ানগিরির দিকে চেয়েছিল পলকহীন চোখে।

ভীমগিরি, ধিয়ানগিরিকে গাঁজা সেজে দিলেন। কলকেটা ধরে উঠলে তিনি প্রচণ্ড জোর এক টান দিয়ে ধুঁয়োটা ধরে রাখলেন কিছুক্ষণ।

হিমেল হাওয়াতে মহীরুহর নীচের রামমন্দিরের চাতালে বসে চারণের ঘুম ঘুম পাচ্ছিল যেন। ভীমগিরি গাঁজা-ভরা বিড়ি এগিয়ে দিলেন একটি।

ধিয়ানগিরিকে বলল চারণ, আপনি একটিও গান শোনাবেন না?

আমার গান গাওয়ার সময় এখনও হয়নি বেটা। রাত গভীর যখন হবে, নদীর জলের শব্দ আর হাওয়ার শব্দর obligato-র পটভূমিতে আমি গান শোনাব তাঁকে, যাঁকে আমার জীবন নিবেদিত করেছি।

বলেই, ব্যোমশঙ্কর ধ্বনি তুলে এমনই এক টান লাগালেন কলকেতে যে, চারণের মনে হল কলকেটা ফেটেই যাবে বুঝি।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, না, আমার গান আজ থাক। বরং তুমিই একটি শোনাও।

চারণ বলল, আমি যে গায়ক নই। কিন্তু ভালবাসি গান।

ধিয়ানগিরি হেসে বসলেন, মেলাই মস্ত মস্ত গায়ক বাদক তোমাকে দেখাতে পারি, বিশ্বজোড়া তাঁদের নাম, কিন্তু তাঁরা গান ভালবাসেন না শুধু নিজেদেরই ভালবাসেন, নিজেদের অর্থ, মান, যশকেই ভালবাসেন শুধু। গান-ভালবাসা গায়কদেরই দরকার আমার। গাও, গাও।

চারণ বলল, সেও তো ওই আধখানাই। সব গানই আমি আধখানা করেই জানি। এই গানটিও আলমোড়ার সেই অন্ধ গায়ক সজ্জনবাবুরই মুখে শোনা। এর শুধু এক লাইনই মনে আছে।

গাও না বেটা, গাও। আমার প্রাণ আজ গান শুইতে চাইছে।

চারণ ধরে দিল,

'বসসো মোরে নায়নানোমে নন্দলালা'।

ভজনটির ওইটুকু গেয়েই থেমে গেল। সত্যিই তার আর মনে ছিল না। একটি পংক্তিই ছিল মনে। আস্থাই এরই পুরোটা মনে ছিল না, তার অন্তরা!

www.MurchOna.com

প্রসন্ন কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল ধিয়ানগিরি মহারাজের মুখে। বললেন, লাগতা হ্যায় কি আজ প্রভুজি কি কৃপাসে সবকুছই পুরা হো যায়েগা, কম্মী না পড়েগী কোঈ চিজকি !

বলেই, তিনি ধরে দিলেন,

'বসসো মেরে নায়নানোমে নন্দলাল
সুমরি সুরত মাধুরী মুরত
নয়না বনে বিশাল
বসসো মেরে নায়নানোমে নন্দলাল।'

পাশে-বসা ভীমগিরি বাচ্চা ছেলের মতন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

ভীমগিরির হাততালি থামলে ধিয়ানগিরি বললেন, তুমি কি হিন্দিগান মাত্রই এমন আধা-ছেঁড়া জানো ? তাহলে বাংলা গানই শোনাও না কেন আস্ত একখানা। নিটোল। এখানে হিন্দি গানই তো গাওয়া হয়, বাংলা গান আর শুনতে পাই কোথায় ?

একেবারেই পান না কি ?

একেবারেই পাই না বললে মিথ্যে হবে। কিন্তু তার বেশিই কলকাতা থেকে দলবেঁধে আসা হরি-মটর-ভাজা 'হরে-গড়ে-একদর' ট্যুরিস্টদের গাওয়া কিছু চটুল গান নয়তো আধখানা বা সিকিখানা সুর-লাগা রামপ্রসাদী বা কীর্তন কোনও সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর মুখে। তারপর বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানো বেটা, গানে যদি সুরই না লাগে, প্রতিটি স্বর যদি সুরে ভরপুরই না থাকে তবে আজকাল আমার এ দুটি কান গান আর শুনতে পারে না। এ দুটি কান অনেকই অত্যাচার সয়েছে অদ্যাবধি গানের নামে। এখন অসহ্য বলেই মনে হয়। দেখি, সুর যদি বা লাগেও তবেও পুরো সুর লাগে না অধিকাংশ গায়কেরই গলায়। অথচ শুনতে পাই যে, ক্যাসেটের আর সিডি-র বন্যাতে দেশ ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে নাকি !

আপনি ক্যাসেট এবং সি ডি-র খবর রেখেও বৈরাগ্য বজায় রাখেন কি করে ? আমাদেরই তো পাগল হবার অবস্থা।

খবর সবকিছুরই রাখতে হয়। যত Distraction হয় ততই Concentration বাড়ে।

তা নয়, এসব খবর পান কোথা থেকে আপনি।

আমি নিজে অনড় হতে পারি কিন্তু আমার চারধারে সবকিছুই নড়ে। সারা দেশ তো বটেই, পৃথিবীটাই আসে আমার কাছে, আস্ত পৃথিবী। টিয়াপাখির মতন ঠোঁটে বয়ে সব খবর নিয়ে আসে কত দূত।

বাঃ !

চারণ বলল।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, আমরা আমাদের সময়ে কথাটাকে জানতাম 'গান বাজনা' বলে। এখন দেখি, তা হয়ে গেছে বাজনা-গান। বাজনার দাপটে গান মরে ভূত। আগেকার দিনের প্রত্যেক সঙ্গতীয়াদেরই পরিমিতি বোধ ছিল। তাঁদের কোনওরকম হীনম্মন্যতাতেও ভুগতে দেখিনি। তাঁরা যে গায়কদের চেয়ে কোনও অংশে ছোট এমন কথা তাঁরা আদৌ মনে করতেন না। মনে করার কথাও ছিল না কোনওই। এবং করতেন না বলেই কণ্ঠসংগীত শিল্পীর পুরো মর্যাদা দিয়েই সঙ্গত করতেন তাঁরা প্রত্যেকেই।

পরক্ষণেই স্বগতোক্তির মতন বললেন, আভভি আইস্তা আইস্তা সান্নাটা হো যায়েগা গঙ্গাকি তীর। ঠাণ্ডা বাড় রহি হ্যায় না ! গানা গানেমে আর শুননেমে অব মজা আয়েগা। বহতে-হুয়ে নদীকি আওয়াজ তুমহারা তানপুরাকি কাম করে গা। উস সুরসে গল্পে মিলাকে গাহতে গাহতে তুম-বিলকুল মস্ত হো যায়েগা।

ভীমগিরি, ধিয়ানগিরি মহারাজকে আজ বক্তৃতাতে পেয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন, লিজিয়ে গুরুজি, অব উনোনে শুরু কিজিয়েগা।

www.MurchOna.com

তারপর তার দিকে ফিরে বলল, অব গানা শুরু কিজিয়ে চারণবাবু।

ভীমগিরি এই বেশি কথা বলা গুরুজিকে ভয় পায়। ভীমগিরি ভাবছিলেন, কথা, গুরুজি অত্যন্তই কম বলেন। শিষ্য-শিষ্যাদেরও নির্বাক থাকতে বলেন। অন্যকে নৈঃশব্দ্যর মাহাত্ম্য বোঝান। কিন্তু কালে-ভদ্রে, গঞ্জিকার মাত্রা বেশি হয়ে গেলে তাঁকে কথাতে পায়। কথা অবশ্য গুরুজি বলেন চমৎকার। ভীমগিরির যদি একটি টেপ-রেকর্ডার থাকত, তার ক্যাসেট কেনার পয়সা থাকত, তবে এরকম সময়ে গুরুজির মুখনিঃসৃত ঝরনার মতন স্বচ্ছতোয়া সব কথাকে তিনি ক্যাসেট-বন্দি করে রাখতেন।

কিন্তু ক্যাসেট কিংবা টেপ-রেকর্ডার, সে-সবও তো বন্ধনই।

হাঁ বেটা। তুমি যো শোচ রহা হ্যায় উও বাত সাহী হ্যায়।

চারণের রাগ হয়ে গেল হঠাৎ ধিয়ানগিরি ভীমগিরিদের উপরে।

সবতেই অত মনস্তত্ত্বর কি আছে? সাইকো-অ্যানালিস্টদের কাছে চিকিৎসা করাবার জন্যেও আসেনি এখানে যে কথায় কথায় এরা সে কি ভাবছে না ভাবছে তা বুঝে ফেলে তাকে চমকে দিচ্ছেন। এও কী একরকমের বুজরুগী নাকি? যত্ত সব ফোর-টোয়েন্টির দল!

ধিয়ানগিরি মহারাজ ম্যান্ডোলিনটিকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, কোন স্কেল-এ বাঁধব বল এবারে? পুরো গান শোনাবে তো বাবা?

চারণ বলল, ভারী গায়ক আমি! ফটাস করে ধরে দেব। আমি কোন স্কেল বুঝে নিয়ে সুর দেবেন। শ্রুতিতেও ধরে ফেলতে পারি। তখন দু-স্কেলের মাঝে পড়ে আপনাকে আঁকুপাঁকু করতে হতে পারে।

মৃদু হাসি হাসতে হাসতে ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, দেখেগা। যো হোগা সো হোগা। তুম ডরাও মত মুঝে। অব শুরু তো করো। সি মে বান্ধা হুয়া হ্যায়।

চারণ ছোটমামার কাছে শেখা সেই ব্রহ্ম সঙ্গীতটি ধরে দিল।

ছোটমামা বলতেন, নিমাইচরণ মিত্রর লেখা নাকি ঐ গানটি।

'কেন ভোলো মনে করো তাঁরে
যে সৃজন পালন করেন এ সংসারে।
সর্বত্র আছে গমন অথচ নাহি চরণ
কর নাহি করে গ্রহণ
নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর দ্বিতীয় নাহিকো আর
কে পারে বর্ণিতে তাঁরে।'

আস্তাই এবং অন্তরাটিও দুবার করে গাইল ও, যেমন করে ছোটমামা শিখিয়েছিলেন। গান যখন মাঝামাঝি পৌঁছেছে তখন ধিয়ানগিরি মহারাজ বাজনা থামিয়ে দিলেন। চারণের মনে হল, তাঁর যেন সমাধি হল। অবশ্য তা ওর গানের গুণে নয়, গঞ্জিকারই গুণে হয়েছে বলে মনে হল ওর।

তার নিজের ভাবনার জাল ছিন্ন করে ধিয়ানগিরি মহারাজ যেন অনেক দূর থেকে বললেন, তুম বহুত দূর চলকে আ গ্যায়ে বেটে এক্কেলে এক্কেলে। রাস্তে যো বাকি হ্যায়, উওভি পার হো যায়েগা এক্কেলেই। তুমহারা কোঈ গুরুকি জরুরৎ নহী হ্যায়।

চারণ বুঝল যে, অস্ট্রিয়ান শিষ্যরা গাঁজার কলকেতে ভরে নির্ঘাৎ হাশিস খাইয়ে গেছে আজ ধিয়ানগিরি মহারাজকে। ভীমগিরি মহারাজের দেওয়া গঞ্জিকা বিড়িও সম্ভবত ক্রিয়া করতে শুরু করেছিল চারণেরও ভেতরে ভেতরে। নইলে এমন সব গোলমেলে কাণ্ড ঘটে কি করে!

তারপরেই সভাস্থলে শ্মশানের নীরবতা নেমে এল। ঘাটের শব্দ কমে এসেছে। নদীর শব্দ জোর হয়েছে। তবু ওরা সকলেই নীরব। রামমন্দিরে ভজন পূজন থেমে গেছে। দোকানপাটেও তীর্থযাত্রীরা আর নেই। সামান্য সংখ্যক স্থানীয় মানুষেরাই আছেন শুধু।

www.MurchOna.com

নীরবতা ভেঙে ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, এই গানটি বাংলাতে ভেঙেছেন উনি।

কে ?

চারণ শুধোল।

যাঁর নাম বললে একটু আগে।

ও। নিমাইচরণ মিত্র মশায় ?

হ্যাঁ।

মূল গানটি কি ? চারণ শুধোল।

মূল গান নেই। এটি উপনিষদের একটি শ্লোক।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল চারণ।

হ্যাঁ বেটা।

কোন উপনিষদ ? শুনেছি আমাদের অনেক উপনিষদ আর বেদ আছে। আর শ্লোকটা কি আপনি জানেন ?

জানি বইকি। নইলে বললাম কি করে যে শ্লোকটা ভাঙা হয়েছে।

ভাঙা কি অন্যায় ?

কে বলে অন্যায় ? রবীন্দ্রসংগীতে কত অগণ্য ভাঙা-গান আছে না ?

তা আছে।

শ্লোকটি কি বলবেন ? যদি জানেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে এই শ্লোকটি।

'অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরত্যং পুরুষং মহান্তম।'

তৃতীয়পর্বের উনিশ নম্বর শ্লোক।

এর মানে কি হল ?

মারাঠি ভীমগিরি মহারাজ শুধোলেন।

ধিয়ানগিরি বললেন, 'যিনি হস্তবিহীন হইয়াও গ্রহণ করিতে পারেন, পাদহীন হইয়াও বেগে গমন করিতে পারেন, চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করিতে পারেন, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণ করিতে পারেন, তিনি সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই আদি পুরুষ বলিয়া জানেন।'

বাক্যটা শেষ করার আগেই ধিয়ানগিরি চারণের পেছন দিকে চোখ তুলে কাকে যেন দেখতে পেলেন। স্মিতহাস্যে বললেন, এতদিনে সময় হল তোর ?

চারণ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, হৃষীকেশ পৌঁছনোর পর সেই প্রথম রাতে ত্রিবেণী ঘাটে এসে যে কৃষ্ণা মেয়েটিকে দেখেছিল, ভীমগিরি যার নাম বলেছিলেন, মাদ্রী, সেই মেয়েটি।

আজ তার পরনে একটি ছাইরঙা শাড়ি। চুলে সাদা ফুল। কোনও পাহাড়ি জংলী ফুল। শহরে চর্চিত ফুল নয় কোনও।

মাদ্রী কাছে এসে দাঁড়াল। তার শরীরে যেন ফুল এবং ধূপ-ধুনোর গন্ধ। শরীরে, না পোশাকে বুঝতে পারল না চারণ। চারণ তার পরিচিত যে সব নারীর কাছাকাছি গেছে তাদের শরীর থেকে চড়া ও হাল্কা বিদিশী পারফ্যুমেরই গন্ধ উড়েছে। সেই সব গন্ধ যে বিজাতীয় গন্ধ, তা মাদ্রী তার খুব কাছে এসে না দাঁড়ালে ও জানতেই পারত না।

মাদ্রী বলল, যা গেল না কটা দিন ! উঃ !

কেন ?

www.MurchOna.com

জ্ঞানানন্দজী মহারাজ তো পাড়ি দিয়েছিলেন একটু হলে।

হয়েছিল কি তাঁর।

কী হয়নি তাই বলুন।

আমার তো মনে হয় জ্ঞানানন্দ ভাইয়ার তোর নরম হাতের সেবা খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই অসুখের ভান করে ছিল। নইলে সন্ন্যাসীর আবার মৃত্যুভয় কিসের জন্যে ?

ওঁর মৃত্যুভয় হতে যাবে কিসের জন্যে ? ভয় তো আমাদের।

তোদের কিসের ভয় ?

বাঃ ওঁকে হারানোর। আপনার কাল দেহান্ত হয়ে গেলে কি আমরা সবাই খুশি হব ?

তা তোরাই জানিস।

গুরুজি, আপনি পথের মানুষের মন পড়তে পারেন আর আমার মনের কথা জানেন না। এও কি বিশ্বাস করার ?

ওসব কথা থাক।

তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ওঁর নাম চারণ চ্যাটার্জি। ইসস বেটি। একটু আগে যদি আসতিস তবে এমনই গান শুনতে পেতিস যে তোর চোখ দিয়ে জল ঝরত। ইনিও অবশ্যই একজন সাধক।

চারণ লজ্জা পেয়ে প্রতিবাদ করে উঠল।

ধিয়ানগিরি বললেন, মাদ্রী নিজে সন্ন্যাসিনী। সাধক শব্দটির মানে ও জানে। তোমার বিচলিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বেটা। আমি তো সন্ত বলিনি তোমাকে, সাধকই বলেছি। ভুল বলিনি কোনও। প্রথমত, সাধনা না থাকলে অমন গান তুমি গাইতে পারতে না। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর-বোধ যাঁর মধ্যে নেই তাঁর পক্ষে ঐ ঈশ্বর-ভজনার গানে অমন দরদ থাকতেই পারত না।

ঈশ্বর-বোধ বলতে আপনি কি বোঝেন ?

মাদ্রী চারণকে বলল, আপনিও পালাচ্ছেন না, গুরুজিও পালাচ্ছেন না। দিওয়ালির রাতে সারারাত গুরুজি এবং ভীমগিরি ভাই আমার কাছে আসবেন ও থাকবেন। আপনারও নেমন্তন্ন রইল। সেই রাতে রাতভর এই সব আলোচনা ও গানও হবে। এখন আমাকে একখানি গান শোনাতেই হবে। কোনও কথা শুনছি না।

চারণ বলল, বিশ্বাস করুন। একখানাই মাত্র জানি আমি।

সাহী বাত।

ভীমগিরি বললেন।

ধিয়ানগিরি হেসে বললেন, পুরো গান একখানি নয়, আধা বা সিকি গান অনেক। তাই না ?

মাদ্রীকে বললেন, চারণবাবু এইমাত্র আমাদের এমন ভাল গান শোনালেন আর তুই আমাদের মান রাখতে একটি গানও শুনাবি না ওঁকে।

মাদ্রী বলল, চা খেতে হবে। এই তো নদীতে চান করে, জ্ঞানানন্দজি মহারাজের নামে প্রদীপ ভাসিয়ে এলাম।

চারণ অবাক হয়ে বলল, এই ঠাণ্ডাতে ?

ঠাণ্ডা কোথায় ? আপনি গঙ্গা নাহান না। রোজ ?

নাঃ।

আরে ! এদিকে তীর্থ করতে এসেছেন।

আমি তীর্থ করতে আসিনি।

তবে ? কী করতে এসেছেন আপনি ?

এখনও জানি না।

অজীব আদমি আপনি।

বলেই, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে তার চিবুক ছুঁল মাদ্রী।

Security Page@MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ভীমগিরি বললেন, জ্ঞানানন্দজির আরোগ্য কামনাতে রোজই তাড়-পাতার দোনাতে ফুল আর প্রদীপ ভাসাচ্ছিস। আমার জন্যেও হয়তো ভাসাবি। তবে তা দেহান্ত হয়ে গেলে ভাসাবি এই যা।

মাদ্রী বলল, আপনার শরীরে তো কোনওই অসুখ নেই ভাইয়া। আপনার সব অসুখ তো মনেরই। নদীতে প্রদীপ ভাসালে কি সন্ন্যাসীর মনের অসুখ সারবে ? আপনি বরং পূর্বাশ্রমে ফিরে গিয়ে একটি ডবকা মেয়ে দেখে বিয়ে করুন। ঈশ্বর-সাধনা আপনার জন্যে নয় ভাইয়া।

ধিয়ানগিরি মহারাজ জোরে হেসে উঠে বললেন, কেন ? নয় কেন ? ও তো ঈশ্বরীরই সাধনা করছে।

ছেঃ ! ছেঃ ! করে উঠলেন ভীমগিরি।

চারণের তার এক মক্কেলের মারাঠি অ্যাকাউন্ট্যান্টের কথা মনে পড়ে গেল। বিরক্তি প্রকাশ করতে মারাঠিরা 'ছিঃ'ও বলে না, 'ছোঃ'ও বলে না। বলে 'ছেঃ'। ভীমগিরি আগে যদি নাও বলতেন ওঁকে, তবু এই 'ছেঃ' শুনেই সে বুঝতে পারত যে, তিনি মারাঠি।

মাদ্রী বলল, আর পূর্বাশ্রমে ফিরে যেতে না চাও তো কোনও ভোগবাদী-নিবৃত্তিবাদীদের আশ্রমে চলে যাও। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আগে করো, তারপরেই ঈশ্বর-ভজনা।

ধিয়ানগিরি বিরক্ত হলেন।

বললেন, মাদ্রী তুমি রসিকতা করছ, কর, কিন্তু ভীমাকে আহত করাটা তোমার আদৌ উচিত নয়। তুমি ভাল করেই জানো ওর ভালবাসাটা কত পবিত্র। কোথায় তুমি কৃতজ্ঞ থাকবে, না সদ্য-পরিচিত চারণবাবুর সামনে যা নয় তা বলে দিলে।

ভীমগিরি মুখ-বিকৃতি করে আরেকটা টিপিক্যাল মারাঠি অভিব্যক্তি করলেন নস্যাৎ করার। ভাবখানা, 'পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।'

মাদ্রী ঝিরঝির করে হেসে উঠল।

ভীমগিরি বললেন, তোমার হাসিটা ইউওল নদীর চলার শব্দর মতন।

তাই ? বাবাঃ। আজকাল কবিতাও লিখছ না কি তুমি ভাইয়া ?

তারপরই বলল, তা ভাল। এক গোছা বরং লিখে রাখ। দিওয়ালির রাতে চন্দ্রবদনী আসছে আমার কাছে, কাজে লাগবে।

চমকে উঠল চারণ।

কুঞ্জাপুরীর কুঁবারসিংজির মুখে একটি পর্বতশৃঙ্গর নাম চন্দ্রবদনী শুনেই ভেবেছিল, কখনও পাগলের মতন প্রেমে যদি পড়তেই হয় তবে ওইরকম কোনও নামের মেয়ের সঙ্গে পড়বে। মাদ্রীর মুখে ঐ নামের কোনও রক্তমাংসর মেয়ের কথা শুনেই বুকের রক্ত তোলপাড় করতে লাগল চারণের।

ওর মন বলল, সন্ন্যাসী হওয়া বোধহয় আর হল না এ জন্মে।

তারপরেই ভাবল, চন্দ্রবদনীর নামের সঙ্গে চেহারার এবং ব্যক্তিত্বর যদি কোনও মিল না থাকে সেই মেয়ের ? তবে বড়ই আশাভঙ্গ হবে।

ভীমগিরি শুধোলেন, কোথায় আছে এখন ? চন্দ্রবদনী ?

রুদ্রপ্রয়াগে ওদের বাড়িতে। আবার কোথায় ?

রুদ্রপ্রয়াগ !

সেই নাম শুনেও আরেকবার চমকাল চারণ। কোথায় জিম করবেট-এর মানুষখেকো চিতার রুদ্রপ্রয়াগ আর কোথায় রুদ্রপ্রয়াগের চন্দ্রবদনী !

ধিয়ানগিরি বললেন, এবারে পরিষ্কার বাংলাতে, গাও বেটি। কলকাতার চারণবাবু না হয় তোকে শোনাবেন আরও গান। পরে। তুইও শোনা ওঁকে একটা। চন্দ্রবদনীর কাছ থেকে তো কম রবীন্দ্রসংগীত শিখিস নি !

উনি কি বাঙালি ?

চারণ জিজ্ঞেস করল।

www.MurchOna.com

কে ? আমি ? হুঁ।

মাদ্রী বলল।

আর ঐ উনি ?

কে উনি ?

কুণ্ঠাভরা লজ্জাতে চন্দ্রবদনী নামটা উচ্চারণই করতে পারছিল না চারণ।

নিজেই ওর এই ছেলেমানুষিতে অবাক হল।

চন্দ্রবদনীর কথা বলছেন ? হ্যাঁ ও-ও বাঙালি। তবে পুরো নয়।

সব গোলমাল হয়ে গেল চারণের। রুদ্রপ্রয়াগের মানুষখেকো চিতা, ত্রিবেণী ঘাটের মাদ্রী, বাঙালি ধিয়ানগিরি মহারাজ, বাঙালি চন্দ্রবদনী এবং তার উপরে রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথ মংপু অবধি ঠিকঠাকই ছিলেন। কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগে ? নাঃ। ভাবাই যায় না।

মাদ্রী বলল, এবারে দিওয়ালি তো সিনিবালী।

হুঁ। ভীমগিরি মহারাজ বললেন।

আর কদিন আছে যেন ?

নেইই বলতে গেলে।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন।

ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন, গা মাদ্রী, একটা অন্তত গান শুনিয়ে দে বেটি।

চন্দ্রবদনীই তো আসছে। গানই যদি শুনবেন তাহলে একেবারে ওঁর গলাতেই শুনবেন। আবার আমি কেন ?

অত বাহানা আমার পছন্দের নয়। গুরুর আদেশ। গাও একখানা গান।

ভীমগিরি একটু বিরক্তির গলাতে বললেন।

মাদ্রী চাতালের উপরে উঠে ধিয়ানগিরি মহারাজের পায়ের কাছে আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। বুকের আঁচল টেনে। ভেজা সুগন্ধি চুল ছড়িয়ে, চারণের দিকে পাশ ফিরে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল নদী থেকে।

ঠাণ্ডা এখন রোজই বাড়ছে। দিওয়ালির পর থেকেই পুরোপুরি জাঁকিয়ে পড়বে।

ভীমগিরি বললেন।

ঋজু হয়ে বসে, যেন শবাসনেই বসেছে, এমন করে, নাভি থেকে নাদ বের করে মাদ্রী গান ধরল। গলাটা একটু খসখসে কিন্তু সুরেলা। সুরের একটুও খামতি নেই।

'বহুর বজাও বংশী।
কাহুর রচক হাঁ হাঁ।
তেরী মুরলী মন মোহ লিয়ো হৈ।
মধুর বাজত যমুনা-তট হাঁ হাঁ॥
তান শুনত শুধ বুধ সব গয়ে
মনমে লাগত বড় চমক হাঁ হাঁ।
ভানু অরা সলিল জোর উজান বহে
সারি শুক মৌর ভুল গায়ে গাবন। ঠমক হাঁ। হাঁ।'

গানের রেশ-এ ভরপুর হয়ে রইল ও। তারপরে স্বগতোক্তি করল চারণ।

বাঃ।

আমার গান আপনার ভাল লেগেছে ?

ভালই লাগেনি শুধু, রীতিমতন আবিষ্ট করেছে। এখনও কথা বলার মতন সময় আসেনি। বললে, গানের রেশ কেটে যাবে।

www.MurchOna.com

হায় ! হায় ! আমার গানেই যদি বলেন বাঃ ! তবে তো চন্দ্রবদনীর গান শুনে আপনি বলবেন বাঃ ! বাঃ ! অনবরতই বাঃ !

তাই ?

হ্যাঁ ।

তারপরই চারণ বলল, গানটা যেন ভারী চেনা-চেনা ঠেকল । অথচ কেন যে, তা বুঝে উঠতে পারছি না ।

ধিয়ানগিরি মহারাজ মিটি মিটি হাসছিলেন ।

বললেন, পূরবীতে বাঁধা বলেই কি ?

চারণ বলল, না তা নয় । পূরবীতে বাঁধা গান তো হাজার গায়ক-গায়িকার গলাতে হাজারবার শুনেছি । কোথায় যে মিল সেটা ঠিক ধরতে পারছি না । কিন্তু মিল অবশ্যই আছে ।

ধিয়ানগিরি এবারে হেসে বললেন, এই গানখানিই ভেঙে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য বাণী দিয়ে মুড়ে এই গানকে বাঙালির একেবারে নিজস্ব করে দিয়েছেন ।

কী রকম ?

এখনও ধরতে পারলে না বেটা ? চেষ্টা করো, ঠিকই পারবে ।

মাদ্রীও হাসছিল ।

'আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুর মাধুরী আহা ।'

চিনতে পারছো এবারে ? ধিয়ানগিরি মহারাজ বললেন । চারণকে চমকে দিয়ে ।

চারণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল । এই ত্রিবেণী ঘাটে এতটা আশা করেনি ।

অ্যালুমিনিয়ামের দুধের পাত্রে চাঁটি মারা, লুঙি আর ময়লা হাতওয়ালা গেঞ্জি পরে কুঁজো হয়ে বসে-থাকা গাঁজার কল্‌কেতে দম-দেওয়া, কালো-কোলো ঐ সন্নিসীর মোড়কের আড়ালে একজন এমন নির্ভেজাল রবীন্দ্রভক্ত বাঙালিকে আবিষ্কার করল বলে ।

চারণ শুধোল ধিয়ানগিরি মহরাজকে, গান আপনি শিখেছিলেন কোথায় ?

সে সব কথা ছাড়ো বেটা । সে সব তো আজকের কথা নয় । ভীমা আমার সম্বন্ধে তোমাকে কি বলেছে তা আমি জানি না । তবে আমি ওস্তাদ আদৌ নই ।

চারণ বুঝতে পারল না, জবাবটা এড়িয়ে গেলেন কি না উনি । তবে ওস্তাদ উনি অবশ্যই ।

ধিয়ানগিরি বললেন, শার্ঙ্গদেবের বই পড়েছ ?

চারণ বোকার মতন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রইল ।

শার্ঙ্গদেবের নাম শুনেছে, যেমন শুনেছে আরও অনেকেরই নাম । বই পড়া তো দূরস্থান, তাঁর লেখা কোনও বইয়ের নামও শোনেনি ।

ধিয়ানগিরি বললেন, 'তাল অংক' ম্যাগাজিনটা রাখতে পারো ।

কোথা থেকে বেরোয় ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ ।

কেন ? উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জেলার হাতরাস থেকে ।

হাতরাস ? সেখানে তো ভারতবিখ্যাত সব বড় বড় মণ্ডী আছে ঘি-এর । আমার এক ঘি কোম্পানি মক্কেলের আড়ৎ ছিল সেখানে ।

হবেই তো । ঘি-এর সঙ্গে গানের সহাবস্থান যে আছেই ! ঘি না খেলে গলা সুরে বলবে কেন ?

ঘি কি গলার লুব্রিকেটর ?

www.MurchOna.com

নিশ্চয়ই। হেসে বললেন, উনি।

তারপরই স্বগতোক্তির মতন বললেন ধিয়ানগিরি, স্বর ঈশ্বর, তাল ব্রহ্ম। গান যে কালান্দরের খুবই প্রিয়।

কালান্দর মানে ? কালান্দর কে ?

কালান্দর মানেও জানো না ?

না তো।

বাঁদর নাচানেওয়ালাকে বলে কালান্দর। যিনি এই জগৎকে, এই কালকে বাঁদরের মতনই নাচান তিনিই কালান্দর। ঈশ্বরেরই আরেক নাম কালান্দর।

তাই ?

অবাক হয়ে বলল, চারণ।

একটু বেশি গান-গান হয়ে গেল যেন রাতটা।

উঠে পড়ল ও ধিয়ানগিরি মহারাজকে নমস্কার করে।

ভীমগিরি বললেন, এখন যাবেনটা কোথায় ? হোটেলে ?

চমকে উঠল চারণ। তাই তো। হোটেলে তো আজ ফেরার পথ বন্ধ। ফিরলেও অনেকই রাত করে ফিরতে হবে, যখন মিলিরা নিশ্চিত শুয়ে পড়বে।

যাতে না ফিরতে হয়, সেই জন্যেই তো ভিয়াসিতে গেছিল এবং ভিয়াসি থেকে ফিরে এসে এতক্ষণ এখানে কাটাল !

ভাগ্যিস মিলিরা এদিকে আসেনি।

রাতেও কি সেই দুপুরের হোটেলেই খাবেন ? নিরামিষ ?

ভীমগিরি শুধোলেন।

আপনি খাবেন না কিছু ? রাতে ?

নাঃ। আমি তো খাচ্ছি না। আগামীকালও খাব না। বললাম না সকালেই আপনাকে।

ধিয়ানগিরি ভীমগিরির দিকে চেয়েছিলেন।

এমন করাটা কি খুব জরুরি ?

চারণ শুধোল। যেন, দুজনকেই। ধিয়ানগিরিও উপোস করছেন কি না তা না জেনেই।

ধিয়ানগিরি বললেন, জরুরি। অবশ্যই জরুরি। তবে অন্য কেউই ভীমাকে উপোস থাকতে বলেনি। আমি তো বলিইনি। ও নিজেই নিজের ইচ্ছাতেই উপোস করছে। তবে এই রেজিমেন্টাশনেরও দাম আছে বৈকি।

মাদ্রী বলল, কালিকমলি বাবার আশ্রমে যাবেন নাকি আপনি আমার সঙ্গে ?

কেন ?

না, যদি খেতে চান সেখানে।

নাঃ। চারণ বলল, কিছুই খাব না আমি রাতে।

আসলে, যেখানে বিনি পয়সাতে আগন্তুক মাত্রকেই খেতে দেওয়া হয় তেমন জায়গার সঙ্গে লঙ্গরখানার তফাৎ নেই বলেই মনে হয়। বুঝল চারণ যে, তার মনের কোণে এখনও অনেক এবং অনেকইরকম গুমোর বাসা বেঁধে আছে।

জোনাথান লিভিংস্টোন-এর 'সীগাল' বইটির কথা আবারও মনে হল তার। নিজেকে আলগা করে ভাসিয়ে দেওয়াটা শুনতে সহজ হলেও করা হয়তো সোজা কথা নয়। আদৌ নয়।

ভাবল ও।

কী হল ?

ভীমগিরি বললেন।

একটু চুপ করে থেকে, ভেবে বলল চারণ, কী আবার হবে। আপনিই না বলেছিলেন, 'ভুখখা

www.MurchOna.com

মারো'। পেট শূন্য না থাকলে, মস্তিষ্ক পূর্ণ হয় না।

বলেছিলাম বুঝি ?

বলেননি ?

বললেই বা কি ? আমি সর্বজ্ঞ ? অন্যের কথা শুনবেন কেন আপনি ? নিজের বুদ্ধিতেই চলবেন।

বলেই, ধিয়ানগিরির দিকে ফিরে বললেন, শেঠ শাঁওল বাজাজ আসছেন।

চারণ তাকিয়ে দেখল, একজন কালো, মোটা-সোটা অবাঙালি ভদ্রলোক, দিল্লিওয়ালা অথবা মাড়োয়ারি হবেন হয়তো।

পরনে কালো ট্রাউজার আর সাদা বুশ শার্ট, হাফ-হাতা, খুব মোটা এবং খুব দামি টেরিকট-এর। পায়ে চটি, চোখে অত্যন্ত বেশি পাওয়ারের প্ল্যাস্টিক লেন্সের চশমা, হাতের দশ আঙুলে দশটি আঙটি, বহুত রতির। এক একটি পাথরের দামই হবে লাখ দশেক করে। ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে সিগারেট জ্বলছে। বুক পকেটে ফাইভ ফাইভ ফাইভের প্যাকেট। এবং ঘাটের পথের মোড়ে ঝকঝকে একটি নীল-রঙা মার্সিডিস গাড়ি।

চারণ ভাবল, কোনও কারণে এই ভদ্রলোক আঙুল-হারা যদি হন তবে তৎক্ষণাৎ এক কোটি টাকা খসে যাবে কম করে।

তবে কোটি টাকার দামই বা কি এঁর কাছে ?

ধিয়ানগিরির কাছে এসেই শেঠ শাঁওল বাজাজ তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন।

চারণ বলল, আমি আজ আসছি।

ধিয়ানগিরি কিছুক্ষণ চারণের মুখে চেয়ে থাকলেন।

এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল ওঁর মুখে।

তারপর বললেন, ফিন আনা বেটা। ঠিক হ্যায়। আজ যাও।

মাদ্রীও পায়ে হাত দিয়ে ধিয়ানগিরিকে প্রণাম করে বিদায় নিল।

চারণের একবার মনে হল তারও কি উচিত পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা ধিয়ানগিরিকে ?

পরক্ষণেই মনে মনে বলল, দুসস। নিজের মা, বাবা, দাদু ও মামাদের ছাড়া আর কারওই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেনি সে কখনওই।

প্রণামটা তার কাছে ritual নয়, কোনও বিশেষ জনের প্রতি গভীর এবং নির্ভেজাল শ্রদ্ধার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। কে ধিয়ানগিরি।

ভাল লেগেছে ধিয়ানগিরি মহারাজকে ঠিকই কিন্তু কারওকে ভাল লাগলেই এমনকি শ্রদ্ধা করলেই যে, যতবার দেখা হবে ততবারই টিপ টিপ করে প্রণাম করতেই হবে তার কোনও মানে আছে বলে মানে না ও।

বলল মাদ্রীকে, অন্য একদিন যাব আপনার সঙ্গে, কালিকমলিওয়ালার আশ্রমে খেতে।

যে কোনওদিনই আসতে পারেন। যেদিন ইচ্ছে হয় আসবেন। মন করলেই আসবেন।

বলল, মাদ্রী হেসে।

মাদ্রী খুবই কাছে দাঁড়িয়েছিল চারণের। আবার সেই ফুলের গন্ধটা নাকে এল ওর ধুপের গন্ধের সঙ্গে মেশা।

এই 'মন করবে' কথাটা কানে নুপুরের মতন বাজল চারণের।

সত্যিই হয়ত মনই সব। 'মন করাটাই' আসল। সব ব্যাপারেই।

তারপর চারণকে নমস্কার করে মাদ্রী চলে গেল ঘাটের চাতালের দিকে। যেদিক দিয়ে কালি কমলিবাবার আশ্রমে উঠে যাবার সিঁড়ি আছে।

অন্য পথও আছে।

মাদ্রীর চলে যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে ভাবল, চারণ। এই শেঠ শাঁওল বাজাজ কে ?

চারণ ধিয়ানগিরির কোণটি থেকে দূরে গিয়ে চাতালের অন্য প্রান্তে গিয়ে বসে শুধোল ভীমগিরিকে।

www.MurchOna.com

ভীমগিরি বললেন, চলুন, আরও সরে বসি। এই শেঠ বড় বেশি কথা বলে।

এই শেঠ কে ?

শেঠ, শেঠ।

না, মানে পরিচয় কি ?

কত কোটি টাকা যে আছে মানুষটার ! পরিচয়, টাকা। মুজফফরনগরে আর সাহারানপুরে শেঠের মস্ত মস্ত ফ্যাক্টরি। দিল্লি, বম্বে ম্যাড্রাস, কলকাতা কোথায় অফিস নেই শেঠ-এর ! মানুষটা ভাল। প্রতি বছরই এই সময়েই আসেন। মুনি-কা-রেতির এক আশ্রমে ওঠেন বটে কিন্তু সারাটা দিন আর রাতের অর্ধেক সময়ই পড়ে থাকেন এই ত্রিবেণী ঘাটেই। ফিরে যাবেন দেওয়ালীর ঠিক আগের দিন। দিল্লিতে গিয়ে দেওয়ালি মানাবেন। প্রতি বছরই অনেক দান-ধ্যান করেন মানুষটা।

ভীমগিরি বললেন, আপনি যদি এখানেই খেতে চান তাহলে ঐ হোটেল কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে রাত দশটাতে।

নাঃ। আমিও মিথ্যা বলছি না। সত্যিই খাব না।

বলেই বলল, ভুখখা মারো।

তারপর বলল, গাঁজার বিড়ি আছে ?

ভীমগিরি হেসে একটি বিড়ি ওকে দিয়ে নিজে একটি ধরালেন। তারপর আগুন দিলেন তাতে ফসস শব্দ করে দেশলাই জ্বালিয়ে।

চারণ বলল, আপনাকে একটা লাইটার দেব আমি।

একদম না। আমি নেবই না। কত মানুষে এর আগে দিতে চেয়েছিল।

কেন ? মুহূর্তে মুহূর্তে দেশলাই ধরাচ্ছেন, বিড়ি খাচ্ছেন, বিড়ি নিভে যাচ্ছে, আর লাইটার নেবেন না কেন ?

সঙ্গে দেশলাই থাকলে তবেই ধরাই বিড়ি। নইলে দোকানে দড়িতে আগুন লাগিয়ে রেখে দেয়, সেখানে গিয়েই ধরিয়ে নিই। বন্ধনের কি দরকার ?

বন্ধন মানে ? একটা সিগারেট লাইটারও বন্ধন ? আপনি তো মস্ত সন্ন্যাসী।

ভীমগিরি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, চারণবাবু, সন্ন্যাসী হয়তো হওয়া হবে না এ জীবনে। কিন্তু গৃহত্যাগী তো নিশ্চয়ই হয়েছি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আর বন্ধনের কথাই যদি ওঠালেন, তবে বলব যে, একটি সামান্য সুতোও বন্ধন। যাঁরা ফচকে নন, প্রকৃতই বড় 'সন্ত', আমার গুরুর মতন, তাঁরা শরীরে উপবীতের বন্ধনটুকু পর্যন্ত রাখেন না। বন্ধনের সূত্রপাত হয় উপবীত বা সিগারেট-লাইটার-এর মতন অতি সামান্য সামান্য জিনিস থেকেই। কিন্তু তার পরিণতি, অনড় পর্বতের মতনও হতে পারে। সবই ছেড়ে যখন আসতে পেরেছি, পথে পথে, শ্মশানে, তীর্থস্থানে, নিজস্ব ঘর, নিজস্ব ছাদ, নিজের আপনজনের পরোয়া না করে যখন এতগুলো বছর কাটিয়েই দিতে পেরেছি, তখন একটি সামান্য সিগারেট-লাইটারের বন্ধনে আমাকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য নাই বা করলেন চারণবাবু।

চারণ চুপ করে রইল।

ভীমগিরি বললেন, তাছাড়া দেশলাই-এর মতন জিনিস আছে।

কেন ? লাইটার তো অনেকই ভাল।

দুর।

দেশলাই ঠুকে দোস্তকে পেয়ার জানানো যায়, দুশমনকে জাহান্নমে যেতে বলা যায়, এক একটি ঘন ঘর্ষণে পাহাড়প্রমাণ ক্রোধ, কাম, দ্বেষের বারুদে আগুন লাগিয়ে তা ধ্বংস করা যায়। লাইটার কি তা পারে ?

চারণ চুপ করেই রইল।

চুপ করে যে !

www.MurchOna.com

ভাবছি।

কী ভাবছেন ?

আপনি যদি ওকালতি করতেন তবে আপনার প্রত্যেক মক্কেলই মামলা হারত।

যদি করতেন মানে কি ? ওকালতিই তো করি।

ওকালতি করেন ? কোন কোর্টে ?

ভীমগিরি বিড়িতে এক লম্বা টান লাগিয়ে বললেন, আমার বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন জজসাহেবের এজলাসে সওয়াল করতে হয় না। কোনও বিশেষ কোর্টেও নয়। প্রতিদিনই একই জজসাহেবের ঘরে মামলা পড়ে আমার।

কোন জজ তিনি ?

তাঁর অনেক নাম। কখনও তিনি দিগম্বর, কখনও কৌপিনধারী, কখনও শাড়ি-পরিহিতা, কখনও ক্রুশ-বিদ্ধ, কখনও মুখে সাদা কাপড় আঁটা, কখনও তিনি মৌনী, কখনও বাচাল। তাঁর রূপ অনেক, তাঁর আবাসও অনেক। কিন্তু তিনি একই।

চারণও বিড়িতে এক টান লাগিয়ে চুপ করে রইল। ভীমগিরি যে এমন করে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন তা ও ভাবতেও পারেনি। কিংবা কে জানে ! গাঁজার নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। আকাশটা নেমে আসছে মনে হচ্ছে, নদী যেন ঘাটের বাঁধানো চাতালের ওপর দিয়ে বইছে। ভীমগিরি যাই বলছেন তাই Fool Proof অথবা Full Proof বলে মনে হচ্ছে। কিছু বা কেউ ভর করেছে মনে হচ্ছে তাঁর ওপরে।

ভীমগিরি বললেন, আপনি তো অনেকই জানেন। তা এই গাঁজা ব্যাপারটা কি বলতে পারেন ?

ব্যাপারটা মানে ? আমার সব জ্ঞানই গাঁজা বলছেন ?

মানে, কী বস্তু আছে এর মধ্যে যে দুটানেই জগৎ-সংসার টলমল করে ওঠে ? জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় ?

মানেটা আমি বলতে পারব না। তবে রাসায়নিক অ্যানালিসিসে যা বলে, তা বলতে পারি।

ওসব জেনে কী করব।

তাহলে বলব না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। গঞ্জিকা, প্রভাব বিস্তার করেছে দুজনেরই উপরে সম্ভবত।

হঠাৎই ভীমগিরি বললেন, আচ্ছা তাই বলুন শুনি। অ্যানালিসিস না ফ্যানালিসিস কী বললেন।

চারণ বলল, গাঁজার মূল উপাদান হল T. H. C.।

ভীমগিরি বললেন, T. H. C. মানে কি ?

গাঁজা বা মারিজুয়ানা এসবের মূল উপাদানের রাসায়নিক নাম ট্রান্স-ডেল্টা-নাইন-টেট্রা-হাইড্রো-ক্যানাবিনল। সংক্ষেপে বলে, T. H. C.

এই ছাড়া-ছাড়া শব্দগুলোর মানে কি ?

মানে, আমিও জানি না। আমার এক মামাতো ভাই কেমিস্ট্রির ছাত্র ছিল। তার কাছেই শুনেছিলাম। মানে দিয়ে কি হবে ? গুণাগুণ তো আপনার নখদর্পণে। না, কি ? তাছাড়া, থিওরি দিয়ে হবেটা কি ? আপনি তো প্র্যাকটিসই তো করছেন।

তা তো অবশ্যই ! আপনার নখদর্পণেও আসবে। তবে এই বিড়ি-ফুঁকে কিছু হবে না। আমার গুরুজির মতন কলকেতে করে না খেলে সিদ্ধি লাভ হবে না।

তাই ?

বলে, হাসল চারণ।

তেমনই তো বিশ্বাস করেন অনেকে। যার যেমন নজর। তারা গাঁজা খাওয়াটাই দেখে, আর কিছুই দেখবে যে তেমন চোখই তাদের নেই।

তারপরই বললেন, আজকে আপনি এমন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো ? হোটেলের ঘরে কি সাপ বিছে ঢুকে রয়েছে ? নাকি বাঘই ?

www.MurchOna.com

হাসল চারণ।

বলল, তার চেয়েও অনেক বেশি খতরনাক জানোয়ার। তবে ভাগ্য ভাল। ঘরে ঢুকতে পারেনি।

কোন লিঙ্গর ?

খতরনাকের আবার লিঙ্গভেদ হয় নাকি ! অ্যাডজেকটিভ এরও কি লিঙ্গবিচার হয় ? তাদের সর্বলিঙ্গর গুণাগুণ একই। খতরনাক মানে, খতরনাক। হোটেলে ফিরলেই বিপদ।

ফিরলে কি এই খেয়ালখুশি জীবনে বাধা পড়বে ?

তা হয়তো পড়বে না কিন্তু মনটার দড়াদড়ি যে ক্রমাগত খুলে ফেলে তাকে হালকা করার চেষ্টা করছি এ কদিন হল, সেই চেষ্টাটা ব্যাহত হবে অবশ্যই। আপনি বহু বছর হল ঘর ছেড়ে এসেছেন, ঘর ছাড়া মাত্রই এমন দূরে চলে গেছেন যে, পরিচিত কেউই নাগাল পায়নি আপনার। আজ আপনি ঘরে ফিরতে চাইলে, আপনিই বলেছিলেন, ঘর হয়তো আপনাকে নেবে না। আর আমাকে ঘর ছাড়তেই চাইছে না।

ভীমগিরি কথা না বলে চারণের দুচোখের দিকে চেয়ে রইলেন চুপ করে।

চারণ বলল, মুশকিলটা কি জানেন ? এত বছর ধরে মাকড়শারই মতন জালটাকে এতই ছড়িয়ে দিয়েছি যে নিজেই একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি নিজেরই বিছানো জালে। কলকাতা জায়গাটা যে এত বড়, তার আঙুল যে ভারত কেন, পৃথিবীর বহু জায়গাতেই পৌঁছয় এই কথাটা ক্রমশই বুঝতে পারছি। এই যে আপনাদের শেঠ শাঁওল বাজাজ, ওঁকেও একটু জেরা করলেই হয়তো বেরিয়ে পড়বে যে ইনিও হয়তো আমার চেনা। নিজের পরিচয় যখন মুছে ফেলে আপনাদের এই ভারহীন, অবস্তুবাদী, নির্মোহ, অর্থ, মান, যশ সবকিছুর লোভহীন জগতের চৌকাঠ মাড়িয়ে ঢোকবার চেষ্টা করছি, তখন পদে পদে এ কী বিপত্তি বলুন দেখি !

বিপত্তি নিয়েই তো আমাদের ঘর করা চারণবাবু। গৃহীর সম্পত্তি। আর আমাদের বিপত্তি।

হাসল চারণ।

বলল, ভালই বলেছেন।

আপনি তাহলে বরং এক কাজ করুন। দেবপ্রয়াগে চলে যান।

সেখানে কি ?

সেখানে ভাগীরথী আর অলকানন্দার সঙ্গম। গভীর গিরিখাত দিয়ে বয়ে এসেছে ভাগীরথী বাঁদিক থেকে আর সমকোণ থেকে এসেছে অলকানন্দা। এই অলকানন্দাতে এসে মন্দাকিনী মিশেছে দেবপ্রয়াগের অনেক উপরে। রুদ্রপ্রয়াগে। মিশে যাওয়ার পর রুদ্রপ্রয়াগে মন্দাকিনীর এবং দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার আর কোনও অস্তিত্বই থাকেনি।

এ কথার মানে ?

মানে এই যে, আপনিও রুদ্রপ্রয়াগের মন্দাকিনী বা দেবপ্রয়াগের অলকানন্দা হয়ে যান। সেই যে গানটি গাইলেন না, সেই যে, গুরুজি বললেন উপনিষদের শ্লোক-নির্ভর যে গানটি, ঈশ্বর-বন্দনার গান ? সেই যিনি পা না থাকা সত্ত্বেও সব জায়গাতে যেতে পারেন, চোখ না থাকা সত্ত্বেও সব কিছু দেখতে পারেন, হাত না থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাত দিয়েই এই সংসারের সৃজন পালন করতে পারেন, তাঁরই মধ্যে নিজেকে লীন করে দিন। আপনার পূর্ব জীবন, আপনার আমিত্ব, আপনার অহং সব নিয়ে এমন করে এই নিরবধিকাল বহমানা অদৃশ্য নদীতে ঝাঁপ দিন চারণবাবু, যাতে আপনি আপনার আগের সব অস্তিত্বই মন্দাকিনী আর অলকানন্দারই মতন মুছে ফেলতে পারেন, নিশ্চিহ্ন হয়ে।

চারণ চুপ করে রইল।

ভীমগিরি বললেন, কি ? পারবেন না ?

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, নিজের সব কিছু নিজস্বতা বিসর্জন না দিলে, নিজের সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন না করলে, নতুন দলের নিশান হাতে নিয়ে দৌড়বেন কেমন করে ? রিলে রেস-এ দৌড়াননি স্কুলে পড়বার সময়ে ?

www.MurchOna.com

হুঁ।

তবে ? আমাদের গৃহী-জীবনের পুরোটাই তো একটা রিলে রেস। ছেলে বাবার নিশান নিয়ে দৌড়চ্ছে, নাতি ছেলের। ছাত্র মাস্টারমশাইয়ের। জুনিয়র উকিল তার সিনিয়রের, সারাটা জীবনই দৌড় ! দৌড় ! দৌড় ! রিলে রেস নয়তো কি ?

তা ঠিক।

ভাবিত চারণ বলল, স্বগতোক্তির মতন।

ভীমগিরি বললেন, অত ভাবার কি আছে ? আপনিও তাঁর অদৃশ্য হাতে আপনার সব নিশান তুলে দিয়ে তাঁর মধ্যে হারিয়ে যান। দেখবেন, তখন একটা প্লাস্টিকের সিগারেট-লাইটারের ভারকেও ঐরাবতের মতন ভারী বলে মনে হচ্ছে।

দেবপ্রয়াগ জায়গাটা বুঝি খুব সুন্দর ? নানা বইয়েতে পড়েছি। আমাদের বাংলা ভাষার সাহিত্যিকেরা এই পথ এবং এইসব তীর্থস্থান নিয়ে যে কত সুন্দর সুন্দর বইই লিখেছেন। কত সিনেমাও হয়েছে। যখন স্কুলে পড়ি তখন, দেখেছিলাম 'মহাপ্রস্থানের পথে'। এখন সেই বইয়ের লেখক, ছবির পরিচালক, নায়ক নায়িকাদের মধ্যে অনেকেই মরে ভূত বা ভগবান হয়ে গেছেন। এতদিনের আগের ছবি। কিন্তু ছবির কথাটা মনে আছে ঠিকই। তাই নাম শুনলেই মনে হয়, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ যেন কতবার দেখেছি !

বইয়ে-পড়া দেখা আর নিজ চোখে দেখাতে আকাশ-পাতাল তফাত। দেবপ্রয়াগে একবার গিয়ে পৌঁছলে আপনার বাকি জীবনটা সেখানেই কাটিয়ে দিতে চাইবেন। তবে এই পাড়ে, মানে, নদীর বাঁ পাড়ে কিছু নেই। এগিয়ে গিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে আবার ডানদিকে ঘুরে ওপারে যেতে হবে। ছোট ছোট হ্যাঙ্গিং-ব্রিজও আছে অবশ্য। ওপারেই প্রাচীন দেবপ্রয়াগ। বদ্রীনাথের যাঁরা পূজারী যাঁদের 'রাওয়াল' বলে, তাঁদের বাস ওখানেই।

হ্যাঁ। শুনেছি। কুমার ট্র্যাভেলস-এর ড্রাইভার বলছিল বটে।

ভীমগিরি হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, আমি একটু ঘুরে আসি। শেঠ চলে গেলে গুরুজির পদসেবা করব, তারপরে ওঁকে একটু দুধ খাইয়ে দিয়ে দিনান্তে নিজের কাজ করব।

নিজের কাজ মানে ?

মানে, ধ্যান। নিজস্ব ভাবনা।

ভীমগিরি চলে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, গুরুজির কাছে শুনেছি যে, আমাদের উপনিষদে একটি শ্লোক আছে—

'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনম্ সামান্যমেতাৎ কাঃ পশুভিনরানাঃ
ধর্মহি তেষাম অধিকোবিশেষোঃ ধর্মোণাহীনা পশুভিসমানাঃ'।

চারণ বলল, মানে কি হল এর ?

মানে হল, পশু আর মানুষ দুইয়েরই আহার আছে, নিদ্রা আছে, ভয় আছে আর আছে মৈথুন। কিন্তু মানুষকে সৃষ্টিকর্তা ধর্ম দিয়েছেন কিন্তু পশুকে তা দেননি। পশুমাত্রই ধর্মহীন। এই ধর্ম কিন্তু হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নয়। এই ধর্ম মানুষের ধর্ম। ভাবনা-চিন্তার ধর্ম, গান গাইবার ধর্ম, ছবি আঁকবার ধর্ম, কবিতা লেখার ধর্ম, ঈশ্বর-ভজনার ধর্ম, যে সব গুণ বিধাতা জন্তু-জানোয়ারকে দেননি।

এই পর্যন্ত বলেই ভীমগিরি পা বাড়ালেন। মুখে বললেন, চললাম আমি।

www.MurchOna.com

ভীমগিরি চলে যেতেই চারণ বড় অসহায় বোধ করতে লাগল। এই কদিনে এই মানুষটা তার উপরে এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছেন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'SPELL'। এই প্রভাব ভাল কী মন্দ সে প্রশ্নে না গিয়েই ও ঠিক করল যে ওকে এই প্রভাবের হাত থেকে মুক্ত হতেই হবে। ও কেন এই গেরুয়াধারীর খপ্পরে পড়ে জীবনটাকে নষ্ট করবে ?

একবার ভাবল, ফিরেই যাবে হোটেলে।

তারপর ভাবল, নাঃ। ভীমগিরি ছাড়া কি অন্য সাধু-সন্ত নেই এখানে ? তাদের অভাব কি ? এই ভীমগিরিকেই এড়িয়ে চলতে হবে শুধু আগামীকাল থেকে।

পরক্ষণেই ওর মনে পড়ল চন্দ্রবদনীর কথা। কবে যেন আসবে সে ? দেওয়ালীর দিনে। দেওয়ালী পর্যন্ত তাকে হৃষীকেশ-এ থাকতেই হবে। ভীমগিরিকে সহ্য করতেই হবে। চারণ জানে যে, সাধু হওয়া ওর হবে না। অনেকই চাওয়ার কামড়, অতৃপ্ত ভোগ-বাসনা তাকে ঘিরে রয়েছে। বড় অসহায় বোধ করে ও। বড় রাগ হয় নিজের উপরে। ঘৃণাও।

নিজেকে যদি বুঝতে পারত পুরোপুরি।

ভীমগিরি চলে গেলেন।

চারণেরই আজ কোথাওই যাবার নেই। গাঁজার বিড়ির প্রভাবে আর ভীমগিরির বুকনিতে মাথাটা ভোঁ-ভোঁ করছিল। ভাবল, গঙ্গা মাঈর মস্ত বাঁধানো ঘাটের চাতালে একটু পায়চারী করবে। ঠাণ্ডা হাওয়াতে মগজ সাফ হয়ে যাবে। সারাটা দিনই আজ হাঁটা-চলা তেমন হয়নি।

ঘাটে এখন লোকজন কমে গেছে। যে সব নারী ও শিশুরা ফুল, প্রদীপ আর তাড়পাতার দোনা সাজিয়ে বসেছিল এতক্ষণ তারাও গায়ের কাঁথা-চাদর টেনেটুনে নিয়ে উঠে পড়ে তাদের সামগ্রী সব উঠিয়ে নিয়ে আজকের মতন বিকিকিনি সেরে যার যার বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে একে একে।

জলের পাশে দাঁড়িয়ে, নদী রেখা ধরে যতদুর চোখ যায়, চেয়েছিল চারণ। যেখানে নদীর ওপরের বারাজের ওপরে আলো জ্বলছে, সেদিকে চোখ পৌঁছুল। কী যেন এক কারখানা হয়েছে ওইদিকে। উজ্জ্বল আলো জ্বলে। চিমনি দিয়ে ধুঁয়ো উঠে। কারখানা কি অন্যত্র করা যেত না ? কুঞ্জাপুরীর উচ্চতা থেকে নীচে তাকিয়ে হৃষীকেশের উপত্যকাকে সত্যিই দেবভূমি বলেই মনে হয়।

চারণের ভাবনার জাল ছিঁড়ে হঠাৎই কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'ব্যোম শংকর'।

'ব্যোম' শব্দটার উপরে এমন করে অ্যাকসেন্ট পড়ল যেন মনে হল তানাজানিয়ার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস-এ সিংহই ডাকল।

চমকে উঠে, মুখ ঘুরোতেই দেখল ঘাটের মাঝ-সিঁড়িতে একজন ছিপছিপে লোক বসে। তার মাথাতে বাঁদুরে টুপি। গায়ে একটি সুজনি গোছের চৌখুপি পাতলা তুলোর চাদর। তুলোটিও নয়। পরনে জিনস-এর প্যান্ট। মোজাহীন দুটি পায়ে, রাবারের হাওয়াইয়ান চটি। বলতে গেলে, চরণযুগল প্রায় খালিই। এই অচেনা মানুষটির পোশাকের স্বল্পতা ওর নিজের পোশাকের আধিক্যজনিত কারণে চারণকে সত্যিই লজ্জিত করল।

'ব্যোম শংকর', শংকর দেবতার স্তুতিসূচক একটি উচ্চারণই মাত্র। 'ব্যোম শংকর'তো কোনও সম্ভাষণ নয় ! এই নির্জনে এই অপরিচিত বাঁদুরে-টুপি পরিহিত ব্যক্তিটি স্বগতোক্তিরই মতন যেন উচ্চারণ করল শব্দটি। আনন্দে হতে পারে, দুঃখে হতে পারে, ভক্তিতেও হতে পারে। ভাবল, চারণ।

www.MurchOna.com

ব্যোম শংকর-এর প্রত্যাভিবাদন হয় না। হয় বলে, অন্তত জানা নেই চারণের।

হঠাৎই সেই কিম্ভূত ব্যক্তি বললেন, কী বুঝলেন স্যার ? চ্যাটার্জি সাহেব ? 'দম মারো দম' 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম শোনেননি ?

চারণ সেই শ্রীমুখে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনে আরও চমকে চেয়ে দেখল যে, পাটন।

অবাক হল চারণ পাটনকে দেখে এখানে। তার দুটি হাতই ছিলিমের উপরে। পুরো টান লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই উদগীরণ !

উষা উত্থুপের গলাতে এই গানটি শোনেননি ? মিস করেছেন স্যার কিছু। 'দম মারো দম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম।'

তারপরেই বলল, বেচারি জ্যাকিদা। ভাল মানুষ, আদ্দির পাঞ্জাবির হাতা-গোটানো, চুরুট-খাওয়া, মদ্য সম্বন্ধে বিদ্বেষহীন, স্পোর্টসম্যান জ্যাকিদাকে এই 'দম মারো দম'-এর গায়িকা কী ল্যাংটাই না মারলেন বলুন ? প্রবল-বিক্রম জ্যাকিদাকে একেবারে আলুর দম করে ছেড়ে দিলে গা। সাধে কি আমার বড় পিসিমা বলতেন 'খপদ্দার। কক্কনও কোনও মেইয়েছেলের সঙ্গে টকরাতে যাসনি পাটু। ভেনে দেবে এক্কেবারে। আমরা হচ্ছি গিয়ে মা কালীর জাত !'

বলেই পাটন বলল, কী হল ! আপনাকে যে ব্যোম শংকর বলে উইশ করলাম, আপনি তো আমাকে উইশ-ব্যাক করলেন না। ম্যানার্স জানেন না এতটুকু ! এত বড় একজন উকিল !

ব্যোমশংকর যে কোনও সম্ভাষণ, তা দিয়ে কারওকে আদৌ উইশ করা যে যায়, সে কথাই আদৌ জানা ছিল না আমার আগে। পাটন বলল।

জানুন তবে। ধ্বনি উঠলেই প্রতিধ্বনি ওঠা স্বাভাবিক। ধ্বনি যে ওঠাল তার অন্তত খুবই ইচ্ছে করে যে, তার সাঙাত জুটুক এক-দুজন অন্তত। অনেকসময় তো একাধিক সাঙাতও জোটে। শোনেননি ? মানে এক ধ্বনির একাধিক প্রতিধ্বনি হয়।

তা শুনেছি। কিন্তু...তুমি এখানে কি করছ ? এলে কোথা দিয়ে ? আমি তো চাতালেই বসেছিলাম তোমাকে তো আসতে দেখলাম না !

ঘাটা-অঘাটাতে আসার পথ কি একটা না কি ? কত্ত পথ আছে।

তারপর যেন দয়া করেই বলল, কপিলমুনির আশ্রমে খেয়ে এসে এখানে গাঁজায় দম দিচ্ছি। আজ খাওয়াটা গাণ্ডে-পিণ্ডে হয়েছে।

রাতে থাকবে কোথায় আজ ? মানে শোবে কোথায় ?

শোব ? শোব কোন দুঃখে ?

মানে ? রাতে শোবে না ?

না ঃ।

ভাবল চারণ, এ এক আজব রাজ্যে এসে পড়ল সে। এখানে কেউ বলে, খাব না। কেউ বলে শোব না রাতে। মাথাটাই খারাপ করে দেবে এরা।

তারপর, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের গলাতে পাটন বলল, গাঁজা কি আপনার হুইস্কি নাকি যে পটাপট চার পেগ চড়িয়ে, পেট-মাদিয়ে খেয়ে, বউ অথবা কোলবালিশ জাপটে শুয়ে পড়বেন। না স্যার। গাঁজা তেমন নেশা নয়। গাঁজা খেয়ে এখানেই বসে কাটাব সারা রাত। অহিফেন, গাঁজা এসবের তরিকাই আলাদা।

কী করবে ? মানে ঘুমোবে তো না, কিন্তু করবেটা কি ?

চিন্তা করব।

চিন্তা ?

হ্যাঁ।

চিন্তাটা কিসের তোমার ? তোমার বাবা যা রেখে যাবেন তা তো পাঁচপুরুষের পক্ষে রাজার হালে থাকলেও যথেষ্ট।

এই তো ! চ্যাটার্জি সাহেব, আপনারা যে টাকার চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তার কথা ভাবতে

www.MurchOna.com

পর্যন্ত পারেন না। যেমন আপনি, তেমনই আপনার মক্কেলরা। আপনি কি করতে এসেছেন এখানে ? রাঁঢ়ের পাছা বাজাতে ?

ছিঃ। ইসস ! ল্যাঙ্গোয়েজ ! ল্যাঙ্গোয়েজ। কী যা তা ভাষাতে কথা বলছ তুমি।

আমি তো বলিনি। আমি Quote করলাম মাত্র। 'দেশ' পত্রিকাতে কুমারপ্রসাদ মুকুজ্জ্যে লিখেছেন।

কে কুমারপ্রসাদ ?

ধুর্জটি মুকুজ্জ্যের ছেলে। তা বলে বাচ্চা ছেলে আদৌ নন। সুপারঅ্যানুয়েটেড ভার্সেটাইল বুড়ো। অনেকে ডাকে ওঁকে "আমিময়" মুকুজ্যে। উনি Quote করেছেন। মানে, উনি এক কোট মেরেছেন। আমি দুকোট মারলাম। এই আর কী !

এত গাঁজা খেলে হ্যালুসিনেশান হয় না ?

হয় বইকি। হওয়ার জন্যেই তো খাওয়া।

তারপর বলল, ভালভাবে গঞ্জিকা সেবন করার পরে মাঝরাতে হয়তো দেখব মাকালি এসে দাঁড়িয়েছেন জিভ বার করে। দেখব, কারা যেন তাঁত বুনছে বহুবর্ণ সুতো দিয়ে। অন্ধকার আকাশ সেই সব রঙিন রেশমি সুতোর সাইকেডিলিক রঙের ছটাতে রামধনুর মতন কর্বুর হয়ে উঠেছে।

কর্বুর শব্দের মানে কি ?

লেহ লট্‌কা !

সেটা কি ?

মানে ?

মানে আবার কি ? অভিব্যক্তি। এতটুকু ইংরেজিও জানেন না তো বিলেতে এতগুলো বছর কি করলেন যৌবনে ? লেহ্ লট্‌কা্। একটা এক্সপ্রেশান।

কিসের ? এক্সপ্রেশানটা কিসের ?

মিশ্র অভিব্যক্তি। বিস্ময়ের, আনন্দের, আপনার মতন হস্তীমূর্খ সন্দর্শনের।

তারপরই বলল, কর্বুর মানে জানেন না অথচ আপনি না কবিতা লিখতেন প্রথম যৌবনে ? লিটল-ম্যাগ করতেন ?

তাতে কি ? ওটা একটা রোগ ?

কোনটা ?

ওই লিটল-ম্যাগ করাটা। বাঙালি মাত্ররই যৌবনে ওই রোগ হয় আবার তিরিশে পৌঁছলেই আপসে ছেড়ে যায়। স্বপ্নদোষ রোগেরই মতন আর কী !

তাঁর সঙ্গে কর্পূরের কি ?

চারণ বলল।

আঃ। কর্পুর নয়, কর্বুর। আপনি না নিজের পয়সা খরচ করে একটি কবিতার বইও বার করেছিলেন ? অবশ্যই পরার্থে।

কার স্বার্থে ? চারণ শুধোল।

একদল ফোর টোয়েন্টি প্রকাশক আছেন। তাঁরা, মেয়ের দালালেরা যেমন গরীব ঘর থেকে খুঁজে খুঁজে হাফ-গেরস্থ মেয়ে-বৌ প্রকিওর করে আনে তেমনই কবিযশপ্রার্থীদের প্রকিওর করে এনে বৃষ্টির পরে পরেই শালিক যেমন কপাকপ ফড়িং ধরে খায় তেমন করেই গিলে খান কচি-কবিদের। বা কপিদের। এঁরা টিপিক্যাল বাঙালি সংস্কৃতিসম্পন্ন এক ধরনের কাব্যিক গাঁটকাটা। প্রতি মাসে কলকাতায় ও নানা মফস্বল শহরে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যশপ্রার্থী কবিদের কত হাজার কবিতার বই যে এমন করে প্রকাশিত হয় ব্যাঙের ছাতারই মতন আর কিছুদিনের মধ্যেই কাগজ বিক্রিওয়ালাদের মাধ্যমে তেলেভাজার দোকানের উনুনে চলে যায়, তার হিসেব কে রাখে !

এসব আজেবাজে কথা থাক এখন। তুমি এখন তোমার সেই ভোঁদাইবাবা না গাড্ডুবাবার আশ্রমে যাবে না ?

www.MurchOna.com

ফিচিক্ শব্দ করে হাসল পাটন।

বলল, কেন ? খুঁজতে গেছিলেন নাকি আমাকে ?

চারণ চুপ করে রইল।

পাটন বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে যে কী করে এত বড় উকিল হয়েছিলেন তা আপনিই জানেন। আপনি একটি গাড়ল-শ্রেষ্ঠ।

চারণ অপমানিত বোধ করল অবশ্যই কিন্তু জবাবে কিছুই বলল না।

পাটন বলল, খবর পেয়েছি ভিয়াসি থেকে যে, আপনি ভোঁদাইবাবা বা গাড্ডুবাবার খোঁজে গিয়েছিলেন ভিয়াসিতে।

বলেই, হাঃ হাঃ করে হেসে উঠিল।

তুমি হাসছ ?

চারণ অসহায় এবং বোকার মতন বলল।

হাঃ। হাঃ। হাসচি-ই-ই !

বলল, পাটন।

চারণ হাতঘড়িতে দেখল দশটা বাজে। এখনও হোটেলে ফিরে যাওয়াটা বিপজ্জনক। মিলির খপ্পরে পড়লে কি ঘটে বলা যায় না। মিলির রুচি খারাপ, শিক্ষা অসম্পূর্ণ কিন্তু ওর একটি উদগ্র কামনা-জরজর নারী-শরীর আছে। দেহসর্বস্বী সে।

চারণ, তার পুরুষসুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে চিরদিনই বুঝে এসেছে যে, সে ভগবান নয়। ভূতও নয়। ভগবানের ভূত হতে আর ভূতের ভগবান হতে সময় বেশি লাগে না। পুরুষকে বিধাতা বড়ই ভঙ্গুর করে করেছেন। তথাকথিত দুর্বল নারীরা অনেকে জানেনই না যে, যা পুরুষের দুর্বলতা তাই তাঁদের বল। মদমত্তা মিলির শারীরিক সান্নিধ্যর ঝুঁকি চারণ নিতে রাজি নয়। এখানে আসার পর থেকে, যদিও সম্পূর্ণই অপরিচিত, কিন্তু এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের স্বাদ পেতে আরম্ভ করেছে ও। এক নতুন নেশার ঘোর ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। ধীরে। সেই নেশাটা, গাঁজার বিড়ির যতখানি, তার চেয়েও অনেকই বেশি এই অনুষঙ্গর। পাটন যদি স্টেটস-এর সহজ সুখের জীবন ছেড়ে এসে এই ঘাটের সিঁড়িতে গাঁজাতে দম দিয়ে রাত কাটিয়ে দিতে পারে তা হলে চারণেরই বা এই জীবনকে একটু চেখে দেখতে দোষ কি ?

এই কদিন রোজই থ্রি-স্টার হোটেলে রাত কাটিয়ে সকালের ব্রেক-ফাস্ট খাওয়ার পরপরই হাফ-সন্ন্যাসী হওয়ার চেষ্টাটা ওর নিজের কাছেও হাফ-গেরস্থ জনপদবধূদের মতনই না-ঘরকা না-ঘাটকার প্রয়াস বলে মনে হচ্ছিল। জোনাথন লিভিংস্টোনের সী-গাল বইটার কথা আবারও মনে পড়ে গেল ওর। নিজেকে নিজের সব শিকড়বাকড় আলগা করে নতুন স্রোতে ভাসিয়ে না দিতে পারলে কিছুই হবে না। তেমন না করতে পারলে, যা জানতে এসেছে, বুঝতে এসেছে, তার কিছুই জানা বোঝা হবে না যে, সে কথা ও অনুভব করেছে, করছে।

কী ভেবে, চারণ চাটুজ্যে হৃষীকেশে আসার পরে যেন এই প্রথম তার কলকাতাইয়া পরিচয়টা প্রদীপেরই মতন অদৃশ্য দোনাতে করে ভাসিয়ে দিল দ্রুত-ধাবমান কুলুকুল ধ্বনি-তোলা গঙ্গার বুকে, অদৃশ্য হাতে। শুধু ও নিজে জানল, আর নদী জানল এই অদৃশ্য নিবেদনের কথা। আর জানল অন্ধকার রাতের অগণ্য তারারা।

বসে পড়ল চারণ ঝুপ করে নদীর ঘাটের লক্ষ-পদ-চর্চিত নোংরা সিঁড়িতে, পাটন নামক ওর দুর্বিনীত, উদ্ধত, অশিক্ষিত ধনী মক্কেল-তনয়ের পাশে।

পাটন কিন্তু কিছুই বলল না। মুখ ঘুরিয়ে দেখল না পর্যন্ত একবার।

বাহাদুরী-প্রবণ, হাততালি-প্রত্যাশী চারণও কিছু বলল না।

দুজনেই নিশ্চুপ থাকাতে নদীর শব্দ কানে জোর হল।

ঘাটের চাতাল থেকে অনেকই পায়ে-হাঁটা পাকদণ্ডী পথ উপরে চড়াইয়ে উঠে গেছে নানা মন্দির আর আশ্রমের দিকে। উপরের কোনও আশ্রম থেকে কোনও সাধু, শিষ্যদের সঙ্গে কথা

www.MurchOna.com

বলছিলেন। শুধু তাঁরই গলার স্বর ভেসে আসছিল। নইলে, শীতের রাতের দশটাতে এখন আর বিশেষ সাড়াশব্দ নেই এখানে।

কে যেন জোরে হাই তুললেন। তারপরই অন্য কেউ অথবা হাই-তোলা মানুষটিই বললেন, সিয়ারাম ! সিয়ারাম !

নদীর জল সশব্দে বয়ে যেতে লাগল। চারণ সেদিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে রইল। কিন্তু পাটনের মুখে কথা নেই। সে ছোকরা কিছুক্ষণ বাদে বাদে কলকেতে টান মারছে আর ঝিম মেরে থাকছে কিছুক্ষণ। চারণ নিজে অবশ্য বুঁদ হয়ে ছিল নিজেরই চিন্তাতে। মাঝে মাঝে ওর নিজেকে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছিল। ওর মধ্যে যে এত বিরক্তি, ক্লান্তি, এবং একঘেয়েমির গভীর অবসাদ এমন মারাত্মকরকম ঘনীভূত হয়েছিল এ সত্য সে নিজেও জানত না। একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য ! এখানে এক-একটা ঘণ্টা কেটেছে আর জেট-ইঞ্জিনের থ্রাস্ট-এর মতন ও অতীতকে পদাঘাত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। উৎক্ষিপ্ত, উৎসারিত হাউয়েরই মতন খোলসকে পিছনে ফেলে রেখে আকাশপানে উর্ধ্বমুখী হয়ে ছুটেছে। সেই এগিয়ে যাওয়ার গতিজাড্যটা ওর মনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তেই তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। একটা UTTERLY INNOCENT BEGINING থেকে এমন এক বিপজ্জনক ও অপরিচিত এবং অনিশ্চিত জীবনে সে প্রবেশ করে যাবে, এবং শুধু যাওয়াই নয়, ক্রমশ তার মধ্যে এমন সেঁধিয়ে যেতে থাকবে, তা ও যেদিন এখানে এসে পৌঁছেছিল সেদিন ঘুণাক্ষরেও জানেনি।

হঠাৎই নিস্তব্ধতা ভেঙে পাটন বলে উঠল, "ব্যোম শংকর"। সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট উচ্চারণে।

চারণ কিছু না বুঝেই, না ভেবেই উত্তর দিল, "ব্যোম শংকর"।

এই তো ! এই তো !

পাটন ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে বলল, চারণকে।

তারপর বলল, গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক। ব্যোম শংকর। চারণ আবারও যন্ত্রচালিতর মতন বলল, ব্যোম শংকর।

বলেই, নিজের মূর্খামি, ও অপরিণামদর্শিতাতে আঁতকে উঠল। ওর মনে হল ধিয়ানগিরি মহারাজের ভক্ত শাঁওল বাজাজ তখুনি দৌড়ে এসে বলবে, আমার সাড়ুভাই-এর কাছে আপনার কথা শুনেছি স্যার। চলুন, চলুন, আমার সঙ্গে। এখানে এই গন্দী জায়গাতে বসে কি করছেন আপনি ?

শাঁওল বাজাজ চলে গেছে অনেকক্ষণ যে, তা দেখেছে চারণ। সে অনুপস্থিত শাঁওলকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বলল, তোমরা ওই দুগ্ধফেননিভ মহামূল্যবান ইস্ত্রি করা পোশাক পরে আস বলেই, এই ধুলোতে নিজেকে অন্যদের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারো না বলেই হয়তো, যা খুঁজতে আসো তা পাওনা !

যেন, চারণের মনের ভাবনার খেই ধরেই পাটন বলল, শান্ত লাগছে কি ? মন ? একটু ?

জানি না।

লাগবে। সার-গোবর পড়ছে, জল পড়ছে, আরও অনেকই পড়বে। ফুল তখন ফুটবেই।

এমন সময়ে নদীর দিক থেকে কে একজন ভিজে কাপড়ে উঠে এল কাদা মাড়িয়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে। এই ঠাণ্ডাতে রাত দশটাতে চান করল কে ? উন্মাদদের আড্ডা এই জায়গা !

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চারণ সেদিকে।

সাধু-সন্তদের চেহারা ও ফিগার দূর থেকে যেন একইরকম দেখায় বলে মনে হয়। মুখ চেনা যায় না। চেনা যায় না, না তাঁরাই চিনতে দেন না, কে জানে !

মানুষটি জল ঝরাতে ঝরাতে পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়ে চোস্ত ইংরেজি অ্যাকসেন্টে পাটনকে বলল, গোয়িং ব্যাক ?

নোপ্।

পাটন বলল।

চারণ দেখল, ব্যক্তি এক বিদেশি। রোদে জলে ধুলো ময়লায় রঙ জ্বলে গেছে। সম্ভবত

www.MurchOna.com

আমেরিকান।

আই অ্যাম গোয়িং টু ডুচাহরী ব্যাব্যা টুমরো।

ফাইন।

পাটন বলল।

হাউ বাউট ড্য ?

অ্যাম গোয়িং ব্যাক।

ওক্কে।

সী ড্য ইন থ্রী ডেইজ।

ওক্কে।

পাটন বলল, স্বগতোক্তির মতন।

চারণ উৎসুক হয়ে শুধোল, তোমার গুরুভাই ?

গরুভাই।

তারপর বলল, আমার গুরুটুরু নেই। একজনের কাছাকাছি থাকি, এই যা। মানুষটি প্রগাঢ় পণ্ডিত। ভীষণই ইন্টারেস্টিং।

কার কথা বলছ ?

যার কাছে থাকি, তিনি।

কেন ? ইন্টারেস্টিং কেন ?

একজন ওরিজিনাল মানুষ। বিন্দুমাত্র ভান-ভড়ং নেই। তাঁকে পছন্দ করি খুবই। কিন্তু পছন্দ করলেই কি কারওকে গুরু বলে মানা যায় ? তা ছাড়া উনি দৈত্যকুলে পেল্লাদ।

কী রকম ?

উনি গুরু-কান্ট-এ বিশ্বাসই করেন না। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতন।

যাঁরা ইংরেজি জানেন না কৃষ্ণমূর্তির মতন, তাঁরা কি সম্মানের যোগ্য নন ? যেমন ধিয়ানগিরি মহারাজ।

কে ধিয়ানগিরি মহারাজ ?

এই ত্রিবেণী ঘাটের।

ওরকম কত মহারাজ পাবেন হরিদ্বার হৃষীকেশ-এর আনাচেকানাচেতে। অগণ্য মহারাজ, জাঁহাবাজ, ধোঁকাবাজ, ধান্দাবাজে ছেয়ে আছে এই সব জায়গা। All that glitters are not gold. আমি চিনি না। তবে, আমি তাঁকে না জেনেই তিনি সম্মানের অযোগ্য এমন বলব কেন ?

আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলে না পাটন তুমি।

ইংরেজিতে বা ইউরোপের কোনও ভাষাতে নিজেকে সহজে প্রকাশ করতে পারলে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায় তো। ভাষাটা চিরদিনই একটি মস্ত বাধা। দেখেন না! INSTRUMENTAL MUSIC কত সহজে সাতসমুদ্রে পেরিয়ে চলে গেল। পৃথিবী, রবিশংকর, আলি আকবর, আমজাদ আলি খাঁ, নিখিল ব্যানার্জি বা বুধাদিত্য মুখার্জিকে শিরোপা দিল আর বাবা আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ, গহরজান, বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব কি হাল-ফিলের রশিদ খাঁও অপরিচিতই রয়ে গেল। দোষ তো তাঁদের নয়, দোষ তো ভাষারই বাধার।

তবে আমি বলব, যিনি প্রকৃত সন্ত তার পশ্চিমের হাততালিতে দরকারই বা কি ? তিনি নিজেই তো নিজের আনন্দে বুঁদ থাকবেন।

তা ঠিক। কিন্তু জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির মতন মানুষেরা তো শুধু সন্তই নন, রাষ্ট্রদূতও বটেন। স্বামী বিবেকানন্দ বস্টনে না গেলে কি অ্যামেরিকার মাধ্যমে সারা পৃথিবী হিন্দুধর্মকে জানত ?

তা ঠিক অবশ্য।

জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির দর্শন ছিল, "জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচবে। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে। এদিক দিয়ে ক্রুডভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, অবশ্য সেক্সুয়াল আউটপোরিং অ্যাপার্ট, জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির জীবন

Chaprash by Buddhadeb Guha

[Part.1]

For More Books & Music Visit www.Murchona.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com